মাক্বামাতে মাযহারী

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

১

মাক্বামাতে মাযহারী

হাকিমাবাদ
খানকায়ে
মোজাদ্দেদিয়া
প্রকাশন

মাক্বামাতে মাযহারী

শহীদ মির্জা মাযহার র. এর জীবন ও কর্ম

১ম খণ্ড

শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.

অনুবাদ

মাওলানা মুমিনুল হক

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

মাক্বামাতে মাযহারী
প্রথম খণ্ড
শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী র.
অনুবাদ
মাওলানা মুমিনুল হক
সম্পাদনা
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন- ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ
আব্দুর রোউফ সরকার

বিনিময়
১৫০ টাকা

MAQAMATE MAZHARI (Volume-1**)** A Life Sketch of Shaheed Mirja Mazhar Jane Janan by Shah Golam Ali (Rh.) translated in Bengali by Maolana Mominul Haque/Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk.150 US $ 10

ISBN 984-70240-0060-6

মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ র.

জানে জানাঁ মাযহার দেহলভী দীয়া
তোমার প্রখর দ্যুতি হৃদয়ে হৃদয়ে
জ্বালে বুকে বুলবুলি কোকিল পাপিয়া
উথাল পাথাল করে সময়ে সময়ে।
প্রেমের প্রকৃত সীমা কোথায় কে জানে
আশেকান অফুরান জীবনের খোঁজে
তোমার মাজারে আসে কলিজার টানে
অজানা আবেশে মজে, আপন গরজে।

তোমার শায়েরী হাল শহীদি স্বপন
'শহীদ তো হ্যায় মগর, গোনাহ্গার হ্যায়'
'জান কোরবান' প্রেম ক'রেছে বপন
যার চারা কিশলয় সুবাস ছড়ায়।

'মর্সিয়া গায় আজো শত শত বুক
সারারাত সারাদিন 'মাশুক' 'মাশুক'।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নুরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার আলোচনা/১১
নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলার বর্ণনা/১৪
অন্যান্য নেসবত/১৪
কাদেরিয়া সিলসিলার আলোচনা/১৫
গাওছুছ্‌ ছাকালাইন হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর পৈত্রিক সিলসিলা/১৬
চিশ্‌তিয়া সিলসিলার বর্ণনা/১৬
হজরত সাইয়্যেদ নুর মোহাম্মদ বদায়ুনী/১৮
হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল/২১
হাফেজ সাদুল্লাহ্‌/২২
শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামী/২৪
হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর খলীফাবৃন্দ/২৭
খাজা মুসা খান মখদুম আজমী/২৭
মির্জা মুযাফ্‌ফর/২৭
মোহাম্মদ মীর/২৮
হজরত মির্জা মাযহারের নসবনামা ও জন্ম/৩১
হজরত মির্জা মাযহারের পিতা/৩১
হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী থেকে ফায়দা গ্রহণ/৪৩
হাজী মোহাম্মদ আফজল থেকে ফায়দা গ্রহণ/৪৯
হজরত হাফেজ সাদুল্লাহ্‌ থেকে ফায়দা গ্রহণ/৫৩
হজরত শায়েখ আবেদ সুনামী থেকে ফায়দা গ্রহণ/৫৬
সমকালীন বুজুর্গগণের নিকট মির্জা মাযহারের উচ্চ মর্যাদার বিষয়/৬০
হজরত মির্জা মাযহারের সোহবতের তাছীর এবং তাঁর উন্নত তাওয়াজ্জোহের বর্ণনা/৬৪
মির্জা মাযহারের নির্লিপ্ততা এবং অন্যান্য গুণাবলীর আলোচনা/৬৯
হজরত মির্জা মাযহারের মলফুজাত (বাণীসমূহ)/৭৫
মির্জা মাযহারের নসিহতসমূহ যা তিনি তাঁর সাথী(মুরীদ)গণকে প্রদান করেছিলেন/৮৭
মির্জা মাযহারের স্বপ্ন এবং তাঁর বর্ণনায় আউলিয়া কেরামের হালসমূহ/৯০
মির্জা মাযহারের কাশ্‌ফ ও কারামতসমূহ/১১০
মির্জা মাযহারের নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে যাত্রা/১১৮
মির্জা মাযহারের আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী খলীফাবৃন্দ/১২৫
হজরত মীর মুসলমান (র:)/১২৫
কাজী মৌলভী ছানাউল্লাহ্‌ পানিপথি (র:)/১২৭
মৌলভী ফজলুল্লাহ্‌/১৩০
মৌলভী আহমদুল্লাহ্‌/১৩০
শায়েখ মোহাম্মদ মুরাদ/১৩২
শায়েখ আবদুর রহমান/১৩৩
মীর আলীমুল্লাহ গঙ্গুহী/১৩৩
শায়েখ মুরাদুল্লাহ্‌ ওরফে গোলাম কাকী/১৩৫

শায়েখ মোহাম্মদ এহসান/১৩৬
শায়েখ গোলাম হাসান/১৩৮
শায়েখ মোহাম্মদ মুনীর/১৩৮
মৌলভী কলন্দর বক্স/১৩৯
মীর নাঈমুল্লাহ/১৪০
মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলী/১৪০
মীর আব্দুল বাকী/১৪২
খলীফা মোহাম্মদ জামীল/১৪২
শাহ্ ভেক/ মৌলভী আব্দুল হক/১৪৩
শাহ্ মোহাম্মদ সালেম/১৪৩
শাহ্ রহমত উল্লাহ্/১৪৪
মোহাম্মদ শাহ্/১৪৫
মীর মুবীন খান/১৪৫
মীর মোহাম্মদ মুঈন খান/১৪৬
মীর আলী আসগর ওরফে মীর মাক্ষু/১৪৭
মোহাম্মদ হাসান আরব/১৪৭
মোহাম্মদ কায়েম কাশমিরী/১৪৮
হাফেজ মোহাম্মদ/১৪৯
মৌলভী কুতুবুদ্দীন/১৫০
মৌলভী গোলাম ইয়াহ্ইয়া/১৫০
মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীন/১৫৩
মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী/১৫৪
মৌলভী কলীমুল্লাহ বাঙ্গালী/১৫৫
মীর রুহুল আমীন/১৫৬
শাহ্ মোহাম্মদ শফী/১৫৭
মোহাম্মদ ওয়াসেল/১৫৭
মোহাম্মদ হোসাইন/১৫৮
শায়েখ গোলাম হোসাইন থানেশ্বরী/১৫৮
মৌলভী আব্দুল করীম/১৫৯
মৌলভী আব্দুল হাকীম/১৫৯
নওয়াব এরশাদ খান/১৬০
গোলাম মোস্তফা খান/১৬০
আখন্দ নূর মোহাম্মদ কান্দাহারী/১৬১
মোল্লা নাসিম/১৬২
মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক/১৬৩
মোল্লা জলীল/১৬৩
মোল্লা আব্দুল্লাহ/১৬৩
মোল্লা তাইমুর/১৬৩

মাক্বামাতে মাযহারী

بسم الله الرحمن الرحيم

নিসর্গে, মহানিসর্গে যাঁর নাম প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তাঁর প্রতি সারাক্ষণ মনোনিবদ্ধ করে থাকেন যাঁরা, তাঁর স্মরণে-প্রেমে মগ্ন হয়ে, উতাল-মাতাল হয়ে আপন সত্তায় প্রজ্জ্বলিত করেন অনির্বাণ বিশ্বাসের বাতি– তাঁদের কাছেই রয়েছে আমাদের সকলের, বিশ্বের সকল মানব-মানবীর মহাসফলতার বিশুদ্ধ পথ-নির্দেশনা ও পরিত্রাণ। তাঁদের প্রদর্শিত পথই সরল পথ- সিরাত্বল মুস্তাক্বীম। মহামহিম আল্লাহ্‌তায়ালার মহাবাণীতে একথাই বিবৃত হয়েছে এভাবে– ইহ্‌দিনাস্ সিরাত্বল মুস্তাক্বীম, সিরাত্বল্ লাজীনা আনআ'মতা আলাইহীম (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো, তাঁদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো)।

এটাই আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার চিরন্তন নীতি ও রীতি– তিনি মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন মানুষের মাধ্যমে– নবী-রসুলগণের মাধ্যমে, তারপর সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং পীর আউলিয়াগণের মাধ্যমে।

পরিত্রাণার্থীগণ এই নিয়মই মেনে চলেন। অনুসন্ধান করে ফেরেন আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণের, নবী-রসুলগণের জামানায় নবী-রসুলগণকে। তারপরে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণকে। পীর-মোর্শেদদেরকে।

শহীদ মির্জা মাযহার জানে জানান র. ছিলেন আধ্যাত্মিক পথের একজন কালজয়ী ও মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান ও প্রেমের পথের সকল মঞ্জিল অতিক্রম করে কীভাবে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে হয়, তা তিনি পৃথিবীবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহপ্রেমিকগণ তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য। আর আমরা যারা তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী, তারা তো তাঁর প্রেমবন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দি র. যাকে 'সোনার শিকল' বলেছেন, তিনি সেই সুমহান শৃঙ্খলভূত আটাশতম রূহানী পুরুষ।

তাঁর জ্যোতির্ময় জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে তো জানতেই হবে। ভাবতে হবে তাঁর অনন্য বাণীসম্ভার নিয়ে। নিশ্চয় মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে এই মহান তরিকার জয়যাত্রা। বিশ্বব্যাপী এর প্রচার-প্রসার-প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা নিয়োজিত। কতোইনা সৌভাগ্য আমাদের। মহান আল্লাহ্তায়ালা সকাশে আমরা এজন্য প্রকাশ করছি আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেশুমার শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ্! আলহামদুলিল্লাহি আলা জালিক।

এই মহান গ্রন্থখানির শ্রদ্ধার্হ রচয়িতা হজরত শাহ্ গোলাম আলী আহমদী র. ছিলেন মির্জা মাযহার শহীদের সুযোগ্য খলীফা। ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দী হিজরীর মোজাদ্দেদ। তাই গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে রূহানী নূরের অবিনশ্বর ধারা। এই নূরের ধারায় আমাদেরকে অবগাহন করতে হবে। অপথ, বিপথ ও কুপথের পথযাত্রীদেরকেও জানাতে হবে প্রেমময় আমন্ত্রণ। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুই সামর্থ্যদাতা। তাঁর কাছেই আমরা সামর্থ্যপ্রত্যাশী। আল্লাহুম্মা আমিন।

অজস্র-অসংখ্য, সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রেমাস্পদশ্রেষ্ঠ মহানবী মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তাঁর প্রেমিক ও প্রেমাস্পদগণের প্রতি। তাঁর সমগ্র উম্মতের প্রতি। আমিন। গ্রন্থখানির রচয়িতা, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা সকলেই আমরা সোনার সিলসিলাভূত। আমাদের সকলের শ্রম ও সাধনা কবুল হোক। এটাই আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রার্থনা। হে আমাদের প্রাণপ্রিয় উপাস্য! সকল প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি কেবলই তোমার। আমরা তোমারই ইবাদত করি। আর সামর্থ্য যাচনা করি কেবল তোমারই সকাশে।

সূচনায় ও সমাপনীতে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

প্রথম অধ্যায়
প্রথম অনুচ্ছেদ

নকশ্বন্দিয়া তরিকার আলোচনা

এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, আলিয়া নকশ্বন্দিয়া তরিকার কর্মসূচী হচ্ছে স্থায়ী আত্মিক মনোযোগ, ফয়েজের উৎস ধারণ, নফল ইবাদতে ভারসমতা ও আকর্ষণীয় বস্তু বর্জনের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। নিজের ক্ষমতা অনুসারে এমন ওজীফাসমূহ আদায় করা, যা সহীহ্ হাদিসসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত। এই তরিকায় তওবা থেকে রেজার মাকাম পর্যন্ত সকল মাকাম সুলুকের (আত্মিক ভ্রমণের) মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয়। এই সুলুকের ফল হচ্ছে যাতে এলাহীর দায়েমী উপস্থিতি, দৈহিক ও আত্মিক আকর্ষণ, যওক-শওক এবং কলবের স্থিতি অর্জন করা। হাদিস– 'আল ইহসানু আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু' (এহসান হচ্ছে– তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এমনভাবে করবে, যেনো তাঁকে দেখতে পাচ্ছো) এর প্রতিপাদ্য বিষয় এই তরিকার সালেকের সামনে উদ্ভাসিত হয় এবং এর মধ্যে সে নিজ সত্তাকে নিমজ্জিত রাখতে পারে। কোনো কোনো সালেক মত্ততায় আক্রান্ত এবং কলবের জযবায় পরাস্ত হয়ে থাকে। আবার কারও কারও নিকট তওহীদের রহস্য উন্মোচিত হয়। এই তরিকার প্রিয় ব্যক্তিগণের কারামত নিরবচ্ছিন্ন জিকির, কলবের প্রশান্তি, এক হাল থেকে অপর হালে পৌঁছানো, দোয়ার মাধ্যমে মুশকিলসমূহ দূর করা ইত্যাদি বিষয়ে হিম্মতের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খ্যাত। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. কে উপরোক্ত মাকাম ও মর্যাদা ছাড়াও আরও বিশেষ বিশেষ মাকাম দান করেছিলেন। এক মাকাম থেকে অন্য মাকামের হাল ও এলেম পৃথক পৃথক ভাবে তিনি জানতেন। তাঁর তরিকার সিলসিলাভুক্ত ব্যক্তিগণও বর্ণিত হাল ও কাইফিয়াতের দ্বারা বিশেষিত। তবে এ তরিকার আকীদা পোষণকারী সকলের পক্ষে উক্ত মাকাম পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব হয় না, যেমন সম্ভব হয়েছিলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর পক্ষে। তবে যিনি উক্ত হাল ও মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন তিনি ধন্য হয়েছেন। এভাবে এই তরিকার খান্দানদের মধ্যে হাল ও তাছীরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য হয়ে থাকে। হাল ও তাছীরের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য হলেও নকশ্বন্দিয়া সিলসিলার জিকির ও শোগলের প্রাচীন পদ্ধতিসমূহ এখনও কার্যকর রয়েছে। কলবের মাকামে বিভোরতা, আত্মবিস্মৃতি, মত্ততা এবং মহব্বতে এলাহীর আকর্ষণ হয়ে থাকে। মোজাদ্দেদে

আলফে সানি র. এই মাকামগুলোকে বেলায়েতের মাকাম বলেছেন। এরপর এই তরিকার অনুসারীগণ বিভিন্ন প্রকারের বাতেনী কাইফিয়ত দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন। মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. উক্ত বেলায়েত লাভের পর তাঁর কামালাত ও হাকীকতকে এমন সূক্ষ্ম বলে চিহ্নিত করেছেন, যা বর্ণ ও বর্ণনা এবং অনুভূতির গণ্ডি বহির্ভূত। তবে এক্ষেত্রে নিরাপদ বিভোরতা এবং অবিরত দৃষ্টিপাত বিদ্যমান থাকে। বরং মকসুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে অনুভূতিহীনতা আসে, যা মত্ততার অবস্থা ছাড়াই এই মাকামের সালেকগণের অর্জিত হয়ে থাকে। যার জন্য বাতেন জগতের পরিচ্ছন্নতা এবং প্রশান্তি অপরিহার্য।

যে সালেকের এলেম ও কাশফ্ অর্জিত হয়, সে সালেক মাকামসমূহে সায়ের করার কালে সর্বদাই তাজাল্লিয়ে এলাহীসমূহ প্রত্যক্ষ করে থাকে। তবে তওহীদের রহস্য[২] নকশ্বন্দিয়া তরিকার সালেকদের মধ্যে কম প্রকাশিত হয়। তার কারণ হচ্ছে, হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. এর তরিকার নেসবত হয়েছিলো দু'দিক থেকে।[৩] তিনি একটি নেসবত পেয়েছিলেন তাঁর পিতা-পিতামহগণ থেকে। তাঁদের নেসবতের চাহিদা অনুসারে তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিলো তওহীদে ওজুদীর রহস্য। তাঁর অপর নেসবত হাসিল হয়েছিলো নকশ্বন্দিয়া খান্দান থেকে, যা পরিপূর্ণ তাকওয়া ও শরীয়ত দ্বারা আলোকিত। হজরত বাকী বিল্লাহ র. ছিলেন বর্ণিত দুই নেসবতের মাজমাউল বাহরাইন (সন্ধিস্থল)।[৪] হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. ওই দুই নেসবত হাসিল করার পর নকশ্বন্দিয়া তরিকার সুলুক গ্রহণ করেন।

তরিকতের নেসবতে কদম রাখার পর ওই সালেকের পদস্খলনের আশংকা থাকে, যে সালেক কলবের মাকামে স্থায়ীত্ব ও দৃঢ়তা অর্জন এবং উন্নতিসাধন করতে ব্যর্থ হয়। তওহীদের এলেম এবং মত্ততার প্রাবল্যের কারণে তার দৃষ্টিপাতে প্রতিক্রিয়া এবং যওক শওক সৃষ্টি হয়। কিন্তু তওহীদের মর্মকথা হচ্ছে– অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ্কে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, যা নকশ্ বন্দিয়া খান্দানের আকাবেরগণ অর্জন করেছিলেন। কারামত প্রকাশের জন্য কঠোর সাধনা অপরিহার্য। কঠিন রেয়াজত ব্যতীত দুনিয়াতে কারামত প্রকাশ পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে– অবিরাম কলবী জিকির, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ, চরিত্র সুসজ্জিতকরণ এবং মোস্তফা সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের অনুসরণ– এর চেয়ে অগ্রগামী কোনো কারামত নেই।[৫] আলহামদু লিল্লাহ! এই তরিকার সিলসিলাভুক্ত ব্যক্তিগণের এমতো সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে। এই পুস্তকের যে কোনো স্থানে যদি একথা লেখা হয়– ওমুক ব্যক্তি এই তরিকার উচ্চ মাকামসমূহ এবং সুলুকের চূড়ান্ত অর্জন করেছেন, তাহলে একথার অর্থ হবে, তিনি এই তরিকার মাকামসমূহের কাইফিয়ত, হাল ও নেয়ামত প্রাপ্তিতে ধন্য হয়েছেন। আল্লাহ্ সম্পর্কে এলেম সবসময় তার মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং সে নবী করীম স. এর সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী।

মহাল আস্ত সা'দীকে রাহে সাফা
তুআঁ রফত জুয দরপে মুস্তফা

(হে সাদী! হজরত মোস্তফা স. এর নিশানে কদমের উপর চলা ব্যতীত পরিচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়)।

আমাদের হজরত মাযহার জানে জানান শহীদ র. কামালিয়াত অর্জন করেছেন নকশ্‌বন্দিয়া খান্দানের আকাবেরগণ থেকে। তিনি এই তরিকার জিকিরের ওজীফা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকেই। তিনি তালেবগণকে এই তরিকার আকাবেরগণের আদব ও উচ্চস্তরের নেসবত অনুসারে তরবিয়াত দিতেন। আমাদের হজরতের কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকারও এজাযত ছিলো। ওই সকল তরিকার ফয়েজও তিনি পেতেন। কোনো কোনো আকাবেরকে কাদেরিয়া ও চিশতিয়া সিলসিলায় বায়াত করে সেজরা শরীফও প্রদান করতেন। তবে এই বিষয়টি জানা যায়নি যে, তিনি সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকায় কাউকে এজাযত দিয়েছিলেন কিনা। কেনোনা এই তরিকার তালেব এতদঞ্চলে খুব কম পাওয়া যায়।

এখন আমি উপরে বর্ণিত তিন সিলসিলার বুজুর্গগণের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

তথ্যপঞ্জি

১. ফতহুলবারী, শরহে বোখারী। ইবনে হাজার আসকালানীকৃত ১/১১৪ অধ্যায় ৩৭, দারুল মাআরেফ, বৈরুত। মাক্বামাতে মাযহারীর মতন "তাবুদাল্লাহা" অন্যান্য মতনে তা'বুদা রব্বাকা। সহী মুসলিম, ইমান ৫৭, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে হাদিসখানি এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

২. আসরারে তওহীদ দ্বারা ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদের রহস্যকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরারের পিতামহগণের মধ্য হতে কেউ কেউ সোহরাওয়ার্দিয়া সিলসিলার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর পিতামহগণের অবস্থা জানতে হলে পাঠ করতে হবে 'বালা কাশেফী রাশহাত', পৃষ্ঠা ২০৭-২২০।

৪. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর কাছে প্রথমে তওহীদে ওজুদী এবং শেষ জীবনে তওহীদে শুহুদীর কাশফ হয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর এ প্রসঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে, যা উদ্ধৃত হয়েছে হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর যবানীতে। মকতুবাতে ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ ৯/৪৩।

৫. তরিকায়ে নকশ্‌বন্দিয়ার ইতিহাস, মূলনীতি এবং তার শাখাসমূহ বিস্তারিত জানতে হলে পাঠ করতে হবে 'জামী রেসালা দর তরিকায়ে খাজেগান' কৃত আব্দুল হাই হাবীবী কাবুল, কাশেফী রাশহাত লারী, তাকমেলা- নফহাতুল উনস, ওয়াসায়া–খাজা আব্দুল খালেক গজদেওয়ানী, রেসালায়ে কুদ্দুসিয়া, ফসলুল খেতাব, 'তাহ্‌কীকাত'– খাজা মোহাম্মদ পারসা র. আরবায়ে আনহাব-কৃত শাহ আহমদ সাঈদ। হেদায়াতুত্‌ত্বলেবীন, কৃত শাহ আবু সাঈদ। আল কাওলুলজামীল, শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী। হাশত শারায়েতে নকশ্‌বন্দিয়া- মোল্লা হুসাইন খাব্বাজ। কুতবুল এরশাদ– শাহ ফকীরুল্লাহ শিকারপুরী এবং ইযাহুত্তরিকত– শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলার বর্ণনা

হজরত মাযহার জানে জানান র. নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার ফয়েজ লাভ করেছিলেন হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী র. থেকে। তিনি হজরত শায়েখ সাইফুদ্দীন র. থেকে। তাছাড়া হজরত মাযহার র. হজরত হাফেয মোহাম্মদ মোহসেন থেকেও ফায়দা হাসিল করেছিলেন। তিনি উরওয়াতুল উছকা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. থেকে। আর তিনি এ তরিকার ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী র. থেকে। তিনি খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ র. থেকে। তিনি হজরত মাওলানা খাজেগী আমকাংগী র. থেকে। তিনি হজরত মাওলানা দরবেশ মোহাম্মদ র. থেকে। তিনি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ যাহেদ র. থেকে। তিনি হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার র. থেকে। তিনি মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. থেকে। তিনি খাজায়ে খাজেগান খাজা বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দ বোখারী র. থেকে। তিনি হজরত সাইয়্যেদ আমীর কুলাল র. থেকে। তিনি হজরত খাজা বাবা সাম্‌মাসী র. থেকে। তিনি হজরত খাজা আযীযানে আলি রামেতিনি র. থেকে। তিনি হজরত খাজা মাহমুদ আনজীর ফাগনবী র. থেকে। তিনি হজরত মাওলানা মোহাম্মদ আরেফ রেওগাড়ী র. থেকে। তিনি খাজায়ে জাহান হজরত আব্দুল খালেক গজদাওয়ানী র. থেকে। তিনি খাজা আবু ইউসুফ হামাদানী র. থেকে। তিনি খাজা আবু আলী ফারমেদী র. থেকে। তিনি খাজা আবুল হাসান খেরকানী র. থেকে। তিনি খাজা বায়েযীদ বোস্তামী র. থেকে। তিনি হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. থেকে। তিনি ইমাম কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর র. থেকে। তিনি সাহাবীয়ে রসুলুল্লাহ স. সালমান ফারসী রা. থেকে। তিনি হজরত আমীরুল মুমিনীন আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে। আর তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন শাফিউল মুজনিবীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফয়েজ হাসিল করেছিলেন।

অন্যান্য নেসবত

হজরত ইমাম জাফর সাদেক, হজরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের, ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমামুল হুমাম সাইয়্যেদুশ্‌ শুহাদা ইমাম হুসাইন, হজরত ইমাম হাসান মোজতবা, হজরত আমীরুল মুমিনীন আলী রা.–হজরত রসুলে করীম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই নেসবত আহলে বাইতের বুজুর্গীর কারণে 'সিলসিলাতুয

যাহাব’ নামে খ্যাত। হজরত খাজা আবু আলী ফারমেদীর নেসবত খাজা আবুল কাসেম গোরগানীর সাথে। তাঁর পীর ছিলেন খাজা আবু ওছমান মাগরেবী।[১] তাঁর নেসবত ছিলো সাইয়্যেদুত্তায়েফা খাজা জুনায়েদ বাগদাদীর সাথে। তাঁর পীর ছিলেন খাজা সেররী সেকতী। তাঁর পীর ছিলেন খাজা মারুফ কারখী। তাঁর পীর ছিলেন ইমাম আলী রেজা। তাঁর সিলসিলা ইমাম জাফর সাদেক হয়ে সনদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন)। খাজা মারুফ কারখী খাজা দাউদ তায়ী থেকেও ফায়দা হাসিল করেছিলেন। তিনি ফায়দা হাসিল করেছিলেন খাজা হাবীব আজমী থেকে। তিনি খাজা হাসান বসরী থেকে। তিনি আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী মুর্তযা রা. থেকে। তিনি রসুলেপাক স. থেকে।

কাদেরিয়া সিলসিলার আলোচনা

হজরত মাযহার কাদেরিয়া তরিকার এজাযত পেয়েছিলেন হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ থেকে। তিনি শায়েখ আব্দুল আহাদ সেরহিন্দী থেকে। তিনি হজরত খাযেনে রহমত মোহাম্মদ সাঈদ থেকে। তিনি তরিকার ইমাম মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী থেকে। তিনি তাঁর পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ থেকে। তিনি শাহ্ কামাল কায়থলী থেকে। তিনি শাহ্ ফোযায়েল থেকে। তিনি হজরত গোদায়ী রহমান সানি থেকে। তিনি সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন আরেফ থেকে। তিনি সাইয়্যেদ গোদায়ী রহমান আউয়াল থেকে। তিনি সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন সাহরায়ী থেকে। তিনি সাইয়্যেদ আকীল থেকে। তিনি সাইয়্যেদ আব্দুল ওয়াহ্হাব থেকে। তিনি সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন থেকে। তিনি সাইয়্যেদুস সা’দাত আব্দুর রাজ্জাক থেকে। তিনি গাওছুছ্ ছাকালাইন মাহবুবে সুবহানী সাইয়্যেদ আব্দুল কাদের জিলানী থেকে। তিনি খাজা আবু সাঈদ মাখযুমী থেকে। তিনি খাজা আবু হাসান কুরাইশী থেকে। তিনি খাজা আবুল ফারাহ তরতভী থেকে। তিনি খাজা আব্দুল ওয়াহেদ তামিমী থেকে। তিনি খাজা আবু বকর শিবলী থেকে। তিনি সাইয়্যেদুত্তায়েফা জুনায়েদ বাগদাদী থেকে। তিনি খাজা সেররি সেকতী থেকে। তিনি খাজা মারুফ কারখী থেকে। তিনি হজরত ইমাম আলী রেজা থেকে। তিনি হজরত ইমাম মুসা কাযেম থেকে। তিনি হজরত ইমাম জাফর সাদেক থেকে। তিনি হজরত ইমাম মোহাম্মদ বাকের থেকে। তিনি হজরত ইমাম যয়নুল আবেদীন থেকে (রহমাতুল্লাহি আ’লায়হিম আজমায়ীন)। তিনি আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. থেকে। তিনি রসুলে করীম মোহাম্মদ মোস্তফা স. থেকে ফয়েজ লাভ করেন।

গাওছুছ্ ছাকালাইন হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর পৈত্রিক সিলসিলা

সাইয়্যেদ আব্দুল কাদের জিলানীর বংশ পরম্পরা– তাঁর পিতা সাইয়্যেদ আবু সালেহ, সাইয়্যেদ মুসা জঙ্গী দোস্ত, সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ। সাইয়্যেদ ইয়াহ্ইয়া যাহেদ। সাইয়্যেদ মুসা মুরেছ, সাইয়্যেদ দাউদ মুরেছ, সাইয়্যেদ মুসা আলজন, সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ মহয, সাইয়্যেদ হাসান মুছান্না (রহ. আজমায়ীন) আমীরুল মুমিনীন ইমাম হাসান মুজতবা রা. আমীরুল মুমিনীন আলী মুর্তযা রা.[২] শাফিউল মুজনিবীন রহমাতুল্লিল আলামীন মোহাম্মদ মুস্তফা স.।

চিশতিয়া সিলসিলার বর্ণনা

হজরত মাযহার চিশতিয়া তরিকারও এজাযত লাভ করেছিলেন। তিনি এই তরিকার এজাযত পেয়েছিলেন হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ থেকে। তিনি শায়েখ মোহাম্মদ সাঈদ থেকে। তিনি মোজাদ্দেদে আলফে সানি হজরত শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী থেকে। তিনি তাঁর পিতা শায়েখ আব্দুল আহাদ থেকে। তিনি শায়েখ রুকনুদ্দীন থেকে। তিনি হজরত শায়েখ আব্দুল কুদ্দুছ থেকে। তিনি শায়েখ মোহম্মদ আরেফ থেকে[৩] তিনি শায়েখ আহমদ আব্দুল হক থেকে। তিনি শায়েখ জালালউদ্দিন পানিপথি থেকে। তিনি শামসুদ্দীন তুর্ক থেকে। তিনি হজরত শায়েখ আলাউদ্দিন মখদুম আলী সাবের থেকে। তিনি শায়েখুল ইসলাম শায়েখ ফরীদ গঞ্জেশকর থেকে। তিনি হজরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী থেকে। তিনি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী সনজিরি থেকে। তিনি খাজা ওছমান হারুনী থেকে। তিনি হাজী মোহাম্মদ শরীফ জিন্দানী থেকে। তিনি খাজা মওদুদ চিশতী থেকে। তিনি খাজা আবু ইউসুফ চিশতী থেকে। তিনি খাজা আবু আহমদ চিশতী থেকে।[৪] তিনি খাজা আবু মোহাম্মদ চিশতী থেকে। তিনি খাজা আবু ইসহাক শামী থেকে। তিনি খাজা মোমশাদ থেকে। তিনি খাজা হুবায়রা বসরী থেকে। তিনি খাজা হাদীকা মারআশী থেকে। তিনি সুলতান ইব্রাহীম আদহাম থেকে। তিনি খাজা ফুযায়েল আয়ায থেকে। তিনি খাজা আব্দুল ওয়াহেদ থেকে। তিনি খাজা হাসান বসরী থেকে (রহ.আজমায়ীন)। তিনি আমীরুল মুমিনীন আলী মুর্তযা রা. থেকে। তিনি জনাব রসুলুল্লাহ স. থেকে।

তথ্যপঞ্জি

১. এখানে মাক্বামাতে মাযহারীতে দু'টি মাধ্যম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ খাজা আবু ওছমান মাগরেবী খাজা আলী কাতেব থেকে। তিনি খাজা আবু আলী রোদবারী থেকে ফায়দা হাসিল করেছিলেন। মামুলাতে মাযহারী পৃষ্ঠা ১৯। আহমদ তাহেরী ইরাকী কুদ্দুসিয়া (মোকাদ্দামা ও সেজরানামা) ছাপা - তেহরান ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

২. হজরত শায়েখ মাযহার র. এর জীবনাবস্থা সম্পর্কে লিখিত নির্ভরযোগ্য কিতাব বাহজাতুল আসরারে আছে– হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের, পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী দোস্ত ইবনে আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর পিতা ইয়াহ্ইয়া যাহেদ। তাঁর পিতা মোহাম্মদ। তাঁর পিতা দাউদ। তাঁর পিতা মুসা। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ। তাঁর পিতা মুসা আলজন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মহয। তাঁর পিতা আলহাসানুল মুযান্না (রহ.আজমায়ীন) তাঁর পিতা হজরত ইমাম হাসান রা.। তাঁর পিতা হজরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. ছাপা, মিশর ১৩০৫ হিজরী পৃষ্ঠা ৮৮।

৩. তরিকতের এই সেজরাটি সংকলিত হয়েছে যুবদাতুল মাকামাত থেকে। পৃষ্ঠা ৯৪। সাবেরিয়া সিলসিলার আলোচনায় ভিন্ন আরও দু'টি নাম আছে। শায়েখ আরেফ রদুলভী এবং শায়েখ মোহম্মদ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী। তিনি হচ্ছেন শায়েখ মোহাম্মদের খলীফা। তারিখে মাশায়েখে চিশত্ কৃত খলীল আহমদ নেজামী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭, ছাপা দিল্লী-১৯৮০ ইং।

৪. যুবদাতুল মাক্বামাত পৃষ্ঠা ৯৪ এ খাজা আবু আহমদের নাম ছাপা থেকে বাদ পড়েছে। এখানে মাক্বামাতে মাযহারী (১২৬৯ হিজরী ছাপা) কিতাবে ভুলবশতঃ খাজা আবু আহমদের নাম আবু মোহাম্মদের পূর্বে লেখা হয়েছে। অথচ শায়েখ আবু ইউসুফের সম্পর্ক ছিলো খাজা আবু মোহাম্মদের সঙ্গে। তারিখে মাশায়েখে চিশত্-পৃষ্ঠা ১৯৩।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হজরত মাযহার র. এর নকশ্‌বন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার চার জন শায়েখের আলোচনা।

১. হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী

তিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেমের আলেম, ফকীহ্ এবং একজন কামেল মোকাম্মেল আরেফ ছিলেন। তিনি মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুকের মাকামসমূহ অতিক্রম করেছিলেন হজরত শায়েখ সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে।[১] তিনি ছিলেন মোজাদ্দেদে আলফে সানির ফরজন্দ ও খলীফা, উরওয়াতুল উছকা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের সাহেবজাদা ও খলীফা। তাছাড়া হজরত হাফেজ মোহাম্মদ মহসিনের কাছ থেকেও[২] সুলুকের মাকামসমূহ অতিক্রম করেন। যিনি হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর নাতি ছিলেন।[৩] তিনি খাজা মোহাম্মদ মাসুমের খলীফা ছিলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত উক্ত বুজুর্গগণের সোহবত গ্রহণ করে ফয়েজ হাসিল করেন এবং উচ্চ মাকাম ও হাল অর্জন করে ধন্য হন। তিনি হালের মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত থাকতেন যে, পনেরো দিন পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে থাকতেন। শুধু নামাজের সময় চৈতন্য ফিরে পেতেন। নামাজের পর পুনরায় হাল প্রবল হয়ে যেতো। অবশেষে তিনি কোনো একসময় হুঁশ ফিরে পেতেন। পরহেজগারী, আল্লাহ্‌ভীতি এবং সুন্নতে নববীর অনুসরণের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। নবী করীম স. এর সীরাত ও আখলাক সম্পর্কিত কিতাবসমূহ সব সময় তাঁর সামনে রাখতেন এবং সেই মোতাবেক আমল করতেন।

একবার সুন্নতের খেলাফ ডান পা দিয়ে শৌচাগারে প্রবেশ করার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তাঁর কবজের (সংকোচনের) হাল বিরাজ করেছিলো। পরে অত্যন্ত বিনয় ও রোনাজারী করার পর আবার বসতের (প্রসারণের) হাল ফিরে এসেছিলো। খাদ্যগ্রহণে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কয়েকদিনের খাবার স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিজের কাছে রেখে দিতেন। খুব বেশী ক্ষুধা পেলে তা থেকে সামান্য কিছু আহার করতেন। তারপর আবার মোরাকাবায় মশগুল হয়ে যেতেন। অধিক মোরাকাবার কারণে তাঁর পবিত্র পৃষ্ঠ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। সাইয়্যেদ বদায়ুনী বলতেন, ত্রিশ বছর যাবত আমি খাদ্যের স্বাদ অনুভব করতে

পারিনি। প্রয়োজনের সময় যা মিলে তাই আহার করে নেই। তিনি এক সময় দু'প্রকারের খাবার গ্রহণ করা বেদাত মনে করতেন। পরিপূর্ণ তাকওয়ার কারণে তিনি তাঁর এক ফরজন্দকে খাওয়ার জন্য ঘি অপরজনকে চিনি প্রদান করতেন।

সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী কখনও আমীর ওমরাগণের খাবার গ্রহণ করতেন না। কেনোনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের খাবার সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে। একবার কোনো এক দুনিয়াদার ব্যক্তির ঘর থেকে খাবার এলো। তিনি বললেন, এর মধ্যে তমসা অনুভূত হচ্ছে। তিনি বিনয়ার্থে মির্জা মাযহারকে বললেন, আপনিও এর প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিয়ে দেখতে পারেন। তিনি তখন সে খাবারের প্রতি মনোনিবদ্ধ করার পর বললেন, খাবার তো হালালই মনে হয়, তবে এর মধ্যে রিয়ার গন্ধ রয়েছে। তিনি কোনো দুনিয়াদার লোকের ঘর থেকে কিতাব ধার করে আনলে তিন দিন পর্যন্ত তা অধ্যয়ন করতেন না। বলতেন, বড় লোকের সোহবতের তমসা এর উপর গিলাফের মতো আস্তরণ হয়ে রয়েছে। তাঁর সোহবতের তাছিরে যখন তমসা দূর হয়ে যেতো, তখন তিনি তা পাঠ করতেন। নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর প্রতি মির্জা মাযহারের অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা ছিলো। তাঁর নাম নেয়া মাত্রই মির্জা মাযহারের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। তিনি বলতেন, আফসোস! বন্ধুগণ সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদের দর্শন লাভ করতে পারলো না। যদি তাঁর দর্শন লাভে তারা সক্ষম হতো, তাহলে আল্লাহতায়ালার কুদরতে কামেলা দেখে তাদের ইমানকে সতেজ করতে পারতো। বুঝতে পারতো, আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় ব্যক্তিগণকে কী রকম শক্তি দান করে থাকেন।

হজরত মির্জা মাযহার র. বলতেন, হজরত বদায়ুনীর কাশফসমূহ খুব বিশুদ্ধ এবং বাস্তবসম্মত। বরং আমি বলতে পারি, আমরা আমাদের বাহ্যিক চক্ষু দ্বারাও এতো পরিষ্কার দেখতে পেতাম না, যা তিনি বাতেনের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করতেন। তিনি অত্যন্ত শক্ত কারামতের অধিকারী ছিলেন। মোখলেছ ব্যক্তিগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অত্যন্ত হিম্মতের সাথে পদক্ষেপ নিতেন। তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ ও দোয়ার বরকতে কারও মকসুদ পূর্ণ হয়নি– এমন খুব কমই হয়েছে।

একবার এক রমণী তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আমার মেয়েকে জ্বিনে নিয়ে গিয়েছে। তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আমি অনেক আমল ও তাবীযাত করেছি। কিন্তু কোনো ফায়দা হয়নি। আপনি দয়া করে তার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন। তিনি দীর্ঘক্ষণ মোরাকাবা করার পর বললেন, তোমার কন্যা ওমুক সময় ফিরে আসবে। তাঁর তাওয়াজ্জোহের ফলে বাস্তবে তাই হলো। ফিরে আসার পর মেয়েটির কাছে যখন ঘটনা জিজ্ঞেস করা হলো তখন সে বললো, আমি এক মরুভূমিতে বিচরণ করছিলাম। এমন সময় কোনো এক বুজুর্গ ব্যক্তি

আমার হাত ধরে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন। তখন এক ব্যক্তি হজরতের চুপ থাকা এবং মোরাকাবা করার কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললো, সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে মোরাকাবা করার পর জবাব দিলেন তার কারণ কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহতায়ালার দরবারে আশ্রয় চেয়েছিলাম। আমার তাওয়াজ্জোহ ও দোয়া যদি কার্যকর হবে বলে বুঝতে পারি, তাহলেই হিম্মত করবো বলে চিন্তা করেছিলাম। এলহামের মাধ্যমে যখন জানতে পারলাম, আমার হিম্মত কার্যকর হবে, তখনই বলেছিলাম, তোমার মেয়ে ফিরে আসবে। মির্জা মাযহার বলেছেন, শায়েখ বদায়ুনীর সমস্ত আমলই হতো আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

একবার দু'জন রাফেযী নারী তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তরিকা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তিনি তাঁর ফেরাসতের আলোকে তাদের হৃদয়ের অবস্থা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা প্রথমে আকীদা বিশুদ্ধ করো। তারপর তরিকা গ্রহণ করো। তাদের মধ্যে একজন তাঁর কামালিয়াত স্বীকার করে তওবা করে তরিকা গ্রহণ করলো। কিন্তু অপর জনের তওবা নসীব হয়নি।

একবার তাঁর এক ভক্তের মধ্যে নফসানী খাহেশ প্রবল হয়ে গেলো। কিন্তু সেখানে তাঁর সুরত এসে হাজির হলো এবং নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে দিলো। মেয়েটি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফরিয়াদ করলো এবং এক স্থানে আশ্রয় নিলো। আর সেই ভক্ত বেচারা তওবা করে নিষ্কৃতি পেলো। পরবর্তীতে লজ্জায় সে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হজরতের খেদমতে হাজির হয়নি।

একবার এক ভাং বিক্রেতা তার দোকান হজরতের বাড়ির নিকট নিয়ে এসেছিলো। তিনি বললেন, ভাং এর তমসা বাতেন জাগতের নেসবতকে পংকিল করে দেয়। তাঁর ভক্তবৃন্দ ভাং এর দোকান ভেঙে দিলো। তিনি বললেন, এখন তো বাতেন জগত আরও বেশী পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। কেনোনা কাজটি শরীয়তবিরোধী। এক্ষেত্রে আমার উচিত ছিলো প্রথমে তাকে নম্রতার সাথে তওবা করার দিকে অনুপ্রাণিত করা। তওবা না করলে পরে কঠোরতা প্রদর্শন করা সঙ্গত হতো। যা হোক, পরে ওই ভাং বিক্রেতাকে অতি কষ্টে হজরতের দরবারে হাজির করা হলো। তিনি তার কাছে ভক্তগণের পক্ষ থেকে ওজরখাহী পেশ করলেন এবং নম্রতার সাথে তাকে বললেন, শরীয়তবিরোধী পেশা গ্রহণ করা ভালো নয়। শরীয়তসম্মত কোনো পেশা গ্রহণ করা উচিত। তাকে কিছু নগদ অর্থ দিয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন তিনি। সেও তওবা করে তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে শামিল হয়ে গেলো।

হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী বলেছেন, একদিন আমি আমার পীর হজরত হাফেজ মহসিনের মাজার জিয়ারতে গেলাম। সেখানে পৌঁছে মোরাকাবা করলাম। এক পর্যায়ে আত্মহারা অবস্থায় দেখতে পেলাম, তাঁর শরীর এবং

কাফনের কাপড় সব ঠিক আছে। তবে পায়ের তালু এবং সেখানকার কাফনে মাটির দাগ লেগে আছে। আমি তাঁর কাছে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তোমার জানা আছে যে, ওজু করার জায়গায় আমি একটি পাথর রেখেছিলাম। সেটি তার মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে এখানে রেখে দেয়া হয়েছিলো। মনে করা হয়েছিলো, তার মালিককে যখন পাওয়া যাবে, তখন তাকে তা দিয়ে দেয়া হবে। একবার আমি সে পাথরের উপর পা রেখেছিলাম। সে কারণেই আমার পায়ের তালুতে মাটির দাগ লেগে আছে।

একথা সত্য যে, যিনি যতো পরহেজগার হবেন আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও বেলায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর মাকাম ততো উচ্চ হবে। হজরত খাজা নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর ওফাত হয়েছিলো **১১**ই যিলকদ **১১৩৫** হিজরীতে।

২. হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল

হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল র. তাঁর সমসাময়িক আলেমগণের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ আলেম এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। বাতেনী এলেমের রহস্যরাজি সম্পর্কে ছিলেন অধিক জ্ঞানী। তিনি দশ বছর পর্যন্ত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের ফরজন্দ এবং খলীফা হুজ্জাতুল্লাহ মোহাম্মদ নকশ্বন্দ[৪] থেকে বাতেনী ফয়েজ লাভ করেছিলেন। তারপর বারো বছর পর্যন্ত খাজা মোহাম্মদ সাঈদের ফরজন্দ এবং খলীফা হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের[৫] সোহবত লাভে ধন্য হন এবং উচ্চ মাকামসমূহ হাসিল করেন। তাছাড়া শায়েখ আব্দুল আহাদের কাছ থেকে জবানী এলেম ও এলমে হাদিসের সনদ লাভ করেন। পরে তিনি শায়েখ সালেম বসরী মক্কীর কাছ থেকেও এলমে হাদিসের সনদ লাভ করেন। হজরত খাজা হুজ্জাতুল্লাহ নকশ্বন্দ হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের নিকট হাজী মোহাম্মদ আফজল সম্পর্কে বলেছিলেন, যে ফয়েজ ও বরকতসমূহ আমি আমার পীরানে কেরামের কাছ থেকে লাভ করেছি তার সবটুকুই হাজী সাহেবের বাতেন জগতে ঢেলে দিয়েছি।

তাঁর নিমজ্জন ছিলো অতি গভীর। নিস্তি বা অস্তিত্বহীনতার হাল এতো প্রবল ছিলো যে, তিনি তাঁর নিজেকে একজন তরিকতপন্থী বলেই গণ্য করতেন না। আমাদের হজরত মির্জা মাযহারের নিকটে তিনি বারবার বলেছিলেন, আপনাকে আল্লাহতায়ালা কাশ্ফের দৃষ্টি এবং আল্লাহপ্রদত্ত মাকাম (মর্যাদাপূর্ণ স্থান) দান করেছেন। আমাদের অবস্থার প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন। আমি তো আমলের খারাবীর কারণে নিজের মধ্যে কিছুই পাই না।

লেখক হজরত শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী বলেন, ইমামুত তরিকত হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি এরশাদ করেছেন, সালেকের উপর যখন তাজাল্লিয়ে

জাতি (সত্তাগত আবির্ভাব) এর প্রকাশ ঘটে, তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির হাল জারী হয়। আর একথার অকাট্য দলিল হচ্ছে আল্লাহতায়ালার বাণী– 'লা তুদরিক্হুল আবসারু'[৭] (কোনো চক্ষু তাঁকে ধারণ করতে পারে না, তবে তিনি চক্ষুসমূহকে ধারণ করেন)।

হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করে আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে রসুলে করীম স. এর বিজয়ের স্থানসমূহ দর্শন করার পর দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং তালেবে হকদের প্রত্যাবর্তনস্থল হন।[৮] হজরত শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী হাদিসের সনদ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে।[৯] তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিলো– তাঁকে কেউ হাদিয়া প্রদান করলে তিনি তা দিয়ে কিতাব ক্রয় করে ওয়াকফ করে দিতেন।[১০] একবার পনেরো হাজার রুপিয়া হাদিয়া এসেছিলো। তিনি সমুদয় অর্থ দিয়ে এলমে দীনের জন্য উপকারী কিতাব ক্রয় করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। কিতাবগুলোর দ্বারা এলমে দীনের প্রচার প্রসার ঘটেছিলো। আল্লাহতায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তিনি বলতেন, ওই বন্ধুগণের জন্য বিস্ময়, যারা জীবনে একবারও হজরত রেসালত পানা স. এর পবিত্র মাজার জিয়ারত করার সৌভাগ্য হাসিল করেননি। অথচ তারা জানেন যে, রসুলেপাক স. এর ওসিলায়ই দুনিয়া ও আখেরাতের মকসুদ হাসিল হয়ে থাকে। তিনি আরও বলতেন, বিস্ময়ের ব্যাপার– জরুরী তাজবীদ অনুসারে কালামুল্লাহ শরীফ বিশুদ্ধ করা কয়েকদিনেই সম্ভব হয়। কিন্তু অনেকেই তা করে না। অথচ নামাজের বিশুদ্ধতা সহী ক্বেরাতের উপর নির্ভর করে। তিনি আরও বলতেন, আশ্চর্যের বিষয়, লোকেরা লতীফাসমূহের জিকির কেনো নকশ্বন্দিয়া বুজুর্গ থেকে গ্রহণ করে না। অথচ এই তরিকায় ওই দৌলত নিহিত আছে, যা মহব্বতে এলাহীর ভিত্তি এবং ইমান বিদ্যমান থাকার মূল কারণ। যা অধিক মেহনত ছাড়া অল্প সময়ে হাসিল করা সম্ভব।

তাঁর বড় বড় খলীফাগণের অন্যতম ছিলেন মোহাম্মদ আজম।[১১] তিনি বিশুদ্ধ কাশফ্ এবং দৃঢ় নেসবতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সোহবতের ওসিলায় অনেক তালেব এই সম্মানিত তরিকার হাল লাভ করেছিলেন।

৩. হাফেজ সাদুল্লাহ্

হাফেজ সাদুল্লাহ র. ছিলেন হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের ফরজন্দ এবং খলীফা মোহাম্মদ সিদ্দীক[১২] এর কামেল খলীফাগণের অন্যতম। তিরিশ বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর মোর্শেদের সোহবত গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চ মাকাম ও

মোজাদ্দেদে আলফে সানির চূড়ান্ত নেসবত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। খানকার ফকীর দরবেশগণ তাঁকে সাইয়্যেদুস সুফিয়া উপাধি দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, আমি আমার পীরের খানকার পানি মাথায় বহন করে আনতাম। সেজন্য আমার মাথার চুল ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। বরং আল্লাহর রাস্তায় আমার চোখের জ্যোতিও কোরবান হয়ে গিয়েছে। আমার পীর আমাকে প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে আহমদাবাদ পাঠিয়েছিলেন। সূর্যের প্রচণ্ড গরমে আমার চোখ তখন ঝলসে গিয়েছিলো। খানকায়ে মোয়াল্লার খেদমত করার বরকতে আমার নিকটে এতো অধিক সংখ্যক খাদেমের আগমন ঘটেছিলো যে, তাদের সকলকে আমি খেদমত করার সুযোগও দিতে পারতাম না। আমার অন্তরের চক্ষু মারেফতের নূর দ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছে। আর আমার মাথার চক্ষু গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে। আমার দায়েমী মোরাকাবা হাসিল হয়েছে। গায়রুল্লাহর কল্পনা যা বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে তা আমার বাতেনী আয়নাতে প্রতিভাত হতে পারে না। আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে এ নেয়ামত দান করেছেন।

তিনি যখন নকশ্‌বন্দিয়া তরিকায় দাখিল হলেন, তখন স্বপ্নে দেখলেন একটি বিশাল শহর– যা বেলায়েতের নূর ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ। উক্ত শহরের প্রতিটি মহল্লায় ওলীগণের জামাত অবস্থান করছে। একবার সেই শহরে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গের আগমনের সংবাদ প্রচারিত হলো। তখন শহরের বাসিন্দাগণ পূর্ণ শান-শওকতের সাথে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বেরিয়ে এলেন, যেনো তারা সকলেই তাঁদের নূরের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা? একজন উত্তর করলো, এ সময় আল্লাহতায়ালা নতুন পূর্ণতাসমূহ প্রকাশ করার জন্য তাঁদেরকে নির্বাচিত করেছেন। আর তাঁরা হলেন মোজাদ্দেদে আলফেসানি শায়েখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী সিলসিলার হালকাভুক্ত বুজুর্গানে দ্বীন। এই স্বপ্নের মাধ্যমে ওই বুজুর্গগণের বরকত দর্শনে তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছিলো এবং এই তরিকার কামালিয়াত অর্জনের জন্য রেয়াজত ও মোজাহাদা করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তগণের মধ্যে অগ্রণী হয়েছিলেন।

আমাদের হজরত মির্জা মাযহার র. বলেছেন, তাঁর মধ্যে বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশের সিফত গালেব ছিলো। বন্ধুগণের মধ্যে কেউ কখনও কাউকে কষ্ট দিলে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলতেন, ত্রুটি এ ফকীরের পক্ষ থেকেই হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

নওয়াব খান ফিরোজ জঙ্গ[১৩] নামক তাঁর জনৈক মুরিদ একদিন তাঁর খেদমতে নিবেদন করলেন, সাইয়্যেদ হাসান ইবনে আবুল হাসান হুসাইনী দেহলভী[১৪]

কাউকে ইচ্ছা করলে হজরত মোস্তফা স. এর জিয়ারত করিয়ে দিতে পারেন। একথা শুনে তিনি বললেন, আমি যাকে ইচ্ছা করি দু'বার রসুল স. এর জিয়ারত করিয়ে দিতে পারি। তুমি আজ রাতে ফাতেহা পড়ার পর রসুলুল্লাহ স. এর পবিত্র রূহের প্রতি মনোযোগ দিয়ে শয়ন করবে। তিনি তাই করলেন এবং রসুলেপাক স. এর জিয়ারত লাভ করলেন। তিনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, রসুলেপাক স. এর জিয়ারত লাভ হলে তাঁকে একশ' রুপিয়া হাদিয়া দিবেন। তিনি পুনরায় ফাতেহা পাঠ করে শয়ন করলেন। তারপর আবার রসুলেপাক স. এর দীদার লাভ করলেন। আবার একশ' রুপিয়া হাদিয়া দেয়ার নিয়ত করলেন। পরদিন সকাল বেলা তিনি হজরত হাফেজ সাদুল্লাহ সকাশে উপস্থিত হয়ে একশ' রুপিয়া হাদিয়া পেশ করলেন। তিনি তাঁর ফেরাসতের নূর দ্বারা অবস্থা জেনে নিলেন এবং তাঁকে বললেন, আর একশ' রুপিয়া কোথায়? তিনি লজ্জিত ও ভীত হয়ে অপর একশ' রুপিয়া বের করে দিলেন।

হজরত মির্জা মাযহার জানে জানান বলেছেন, তিনি জাহেরী এলেমে খুব বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন না এবং তাঁর সাহচর্যে কাশফের ঘটনাবলীর আলোচনা হতো না। কেবল তাঁর পীরের খানকার খেদমতের কারণে সকলের নিকট তিনি মকবুল হয়েছিলেন। তবে তাঁর বাতেনী নেসবত খুবই মজবুত ছিলো।

তাঁর খানকায় একটি বড় বিড়াল ছিলো। তাঁর সোহবতের তাছিরে বিড়ালটির স্বভাব এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, চড়ুই পাখিদের উপরও সে সদয় থাকতো। বিড়ালটি যখন তার মুখ খুলতো, তখন তার মুখের মধ্যে গমের দানা ঢেলে দেয়া হতো। চড়ুই পাখিরা তখন চতুর্দিক থেকে উড়ে আসতো। তারা বিড়ালের মুখ থেকে গমের দানাসমূহ তাদের ঠোঁট দিয়ে উঠিয়ে নিতো এবং বিড়ালের সঙ্গে খেলা করতো।

তাঁর ফয়েজে অনেক লোক নৈকট্যের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিলো ১১ই শওয়াল ১১৫২ হিজরীতে।[১৫] তাঁর খলীফাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিবগাতুল্লাহ নূরানী পীর। এই কিতাবের লেখক শাহ্ গোলাম আলী তাঁর জিয়ারত লাভ করেছেন।

৪. শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামী

শায়েখ আবেদ সুনামী র.[১৬] হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের অন্যতম বড় খলীফা ছিলেন। শায়েখ আব্দুল আহাদ সেরহিন্দ শরীফের শ্রেষ্ঠ খলীফাগণের অন্যতম দিলেন। এলেম, আমল ও পরহেজগারীতে একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর নেসবত ছিলো হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে। তিনি খুব বেশী ইবাদতগোজার এবং অধিক জিকিরকারী

ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাজে সুরা ইয়াসীন ষাটবার করে পাঠ করতেন। প্রতি দু'রাকাত আদায় করার পর জিকির ও মোরাকাবা করতেন। অর্ধেক রাত থেকে সেহেরীর সময় পর্যন্ত পুরো সময় আল্লাহর জিকিরে অতিবাহিত করতেন। এসহাল (অতিসার) রোগে তাঁর ওফাত হয়েছিলো। তাঁর ওই রোগ দুই মাস স্থায়ী ছিলো। রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তাহাজ্জুদ নামাজে পঁয়ত্রিশবার সুরা ইয়াসীন পাঠ করতেন। বিশহাজার বার কলেমা তাইয়্যেবা, হাজার বার নফী ইসবাত, হাবসে দম, কালামুল্লাহ শরীফ তেলাওয়াত ও দরূদ শরীফের ওজিফা আদায় করতেন।

একবার সেরহিন্দ এলাকার শাসক অবৈধভাবে গবাদী পশু নিধন করেছিলো। তিনি ওই সময় থেকে বিশ বছর পর্যন্ত গোশত খাওয়া বর্জন করেছিলেন।

তিনি যখন দিল্লীতে আগমন করতেন, তখন হালাল পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আটা ছাড়া রাস্তায় অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করতেন না। আযীমতের অনুসরণে সমস্ত আমল করতেন। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর মকবুল বান্দা হয়ে আম ও খাস সকল মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থল হয়েছিলেন। তাঁর আস্তানা ও খানকা আল্লাহওয়ালাদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলো। প্রায় দু'শ আলেম ও সালেহ বান্দা সব সময় তাঁর হালকায় উপস্থিত থাকতেন। তালেবে মাওলাগণের অনেকে তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার চূড়ান্ত মাকামে পৌঁছেছিলেন। অসংখ্য ফানা ও বাকাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁর সোহবতে থেকে নিমজ্জন, আত্মবিস্মৃতি, বেলায়েত লাভ ও চরিত্র পরিমার্জনে কামিয়াব হয়েছিলেন। তিনি হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রের পাঠদান শেষে কেবলামুখি হয়ে মোরাকাবায় বসে যেতেন। যে কোনো ব্যক্তি তাঁর সাহচর্যে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর অন্তরের খাতিরজমার নূর তার বাতেন জগতে নিক্ষেপ করতেন। জুমার দিন তাঁর খানকায় তালেবগণের সমাগম বেশী হতো। যে কোনো ব্যক্তি তাঁর সামনে এলে তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে তার অন্তকরণ জিকিরে লিপ্ত হয়ে যেতো। একদিন কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, সাধারণ লোক কলবী জিকির কী করে বুঝবে? তারা হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক স্পন্দন আর জিকিরের হরকতের মধ্যে তো কোনোরূপ পার্থক্য করতে পারে না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এর মোআমেলা আল্লাহতায়ালার সাথে। বুঝতে পারা বড় কোনো বিষয় নয়। জিকিরকারী তার কবরের মধ্যে জিকিরের প্রতিক্রিয়া এবং মূল্য নিজেই জানতে পারবে। আরও বুঝতে পারবে কলবী জিকিরের নূরের বরকতে ইমান কী পরিমাণ নিরাপদ থাকে। তাঁর ফয়েজের মাধ্যমে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নূর চমকে উঠেছিলো এবং এতদঞ্চলে এই খান্দানের নেসবতের প্রচলন ঘটেছিলো।

একদিনের ঘটনা। তিনি মসজিদে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক ব্যক্তি তাঁর মুরিদগণের সমাবেশে বসে অন্য লোকদের মুরিদ করছে। কিন্তু তার বাতেন জগত আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে নেসবতের নূর থেকে খালি, যে নূর উচ্চস্তরের

সুফীগণের বৈশিষ্ট্য। মাশায়েখগণের মতে কলবের ফানা, বেলায়েত লাভ এবং চরিত্র সংশোধন ব্যতীত মুরিদ করা (পীরালির গদী বসানো) হারাম। তিনি তখন ওই ব্যক্তির বাতেনী হালের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার প্রতি দয়ার্দ্র হলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তার হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিলেন এবং তাকে কলবী বেলায়েতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমাদের হজরত মির্জা মাযহার তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামী তাঁর কাছে এর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হজরত মির্জা মাযহার বললেন, আপনার তাওয়াজ্জোহে তার দিল জিকির কারী হয়ে গিয়েছে। তার লতীফাসমূহে নূরানিয়াত হাসিল হয়েছে। যার ফলে তার লতীফাসমূহ এখন উত্তপ্ত হয়ে হকের অন্বেষণে উড্ডয়মান। সে কলবের মধ্যে অবসন্নতা অনুভব করছে এবং আলমে আমরের পরিভ্রমণের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাজাল্লিয়ে আফয়াল পর্যন্ত পৌঁছে ফানা হাসিল করেছে এবং তরিকার ফয়েজপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেছে। শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামী বললেন, তোমার মোশাহাদা (আত্মিক দর্শন) বিশুদ্ধ। আমার নিকটেও তার এমন হালই প্রতীয়মান হয়েছে।

একদিন তিনি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একস্থানে দাঁড়ালেন। মোরাকাবা করে মৃতদের হালের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তারপর বললেন, কবরবাসীরা ফয়েজের জন্য আবেদন জানাচ্ছে। তিনি আবার তাদের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। এই ফকীর অর্থাৎ এই কিতাবের লেখক তাঁর মোর্শেদের কাছে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, ওই সময় আমি হজরতের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। মুহূর্তটি ছিলো হাকীকতে মোহাম্মদীর। তখন পুরো কবরস্থান তাঁর তাওয়াজ্জোহের নূর ও বরকতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।

তিনি পদব্রজে হারামাইন শরীফাইন জিয়ারতে গিয়েছিলেন এবং সরওয়ারে কায়েনাত স. এর অনুগ্রহে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমার বুকের জ্বালা, উত্তাপ ও বেদনা রোজে আজল থেকে শুরু হয়েছিলো। অবশেষে নবী করীম স. এর অনুগ্রহের মাধ্যমে তা প্রশান্তি লাভ করেছে। যা মকসুদ ছিলো, তা হাসিল হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থানকালে অনেক তালেবে মাওলা তাঁর সোহবতের ফয়েজ লাভ করেছিলেন। এক লোক মদীনা তাইয়্যেবায় কঠোর রেয়াজত, মোজাহাদা ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে সাধনা করছিলো। জনাব সরওয়ারে আলম স. তাকে নির্দেশ দিলেন, মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ফয়েজ হাসিল করো। লোকটি তাঁর নিকট হাজির হলে তিনি তাকে কঠোর মোজাহাদা করা থেকে বারণ করে দিয়ে ইবাদতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বললেন। লোকটি কঠোর সাধনা করতে অভ্যস্ত ছিলো। তাই সে তাঁর কথা মতো আমল করলো না। তখন স্বয়ং রসুলে করীম স. তাকে হুকুম দিলেন, তাঁর অনুসরণ করো এবং তাঁর সোহবত গ্রহণকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। লোকটি তাঁর

খেদমতে পুনরায় হাজির হলো। তাঁর সুন্দর আত্মিক প্রতিপালনে (রূহানী তরবিয়তে) লোকটি উচ্চ মাকামধারী ওলী হয়ে গেলো।

শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর ওফাত হয়েছিলো ১৮ রমজানুল মোবারক ১১৬০ হিজরীতে।

হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর খলীফাবৃন্দ

১. খাজা মুসা খান মখদুম আজমী

তাঁর খলীফাগণের সংখ্যা ছিলো অনেক। তন্মধ্যে অন্যতম খলীফা ছিলেন খাজা মুসা খান মখদুম আজমী (১) ওয়াযিদী।[১৮] তিনি একজন আল্লাহ্‌ভীরু, কাশ্‌ফ, কারামত ও উচ্চ মাকামধারী ওলী ছিলেন। মাওরাউন্নাহার (তুরান দেশ) এর তালেবে মাওলাগণের হেদায়েতের জন্য তিনি ছিলেন অনন্য বুজুর্গ।[১৯] তাঁর বারোজন খলীফা ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন তোমার বাতেন জগত অপরিচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। কারণ কী? তুমি কি কোনো সন্দেহযুক্ত আহার্য গ্রহণ করেছো? তিনি বললেন, না, খানকার খাবার ব্যতীত অন্য কোনো খাবার গ্রহণ করিনি। অবশেষে তিনি স্বীকার করলেন, এক আমীর ব্যক্তির বাসভবনে বড় পীর সাহেবের নামে প্রস্তুতকৃত নেয়াযের খাবার খেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে সাবধান করে বললেন, আমি তোমাকে কি বলে রাখিনি, যেখানে সেখানে খাদ্য গ্রহণ করবে না?

২. মির্জা মুযাফ্‌ফর

সময়ের সদ্ব্যবহার, বাতেনী নেসবতের দৃঢ়তা, পরিপূর্ণ হাল ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অনন্য বুজুর্গ ছিলেন মির্জা মুযাফফর র.। এই কিতাবের লেখক শাহ গোলাম আলী দেহলভী বলছেন, তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছেন এমন বুজুর্গগণের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এই তরিকার সাথী হওয়ার জন্য যে সকল উপকরণ ও গুণাবলীর দরকার, তার সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। তাঁর ওফাতের পর তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্য থেকে একজনের প্রচণ্ড কবজের হাল হয়েছিলো। দুই বছর পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সেই কবজের হাল বিরাজ করছিলো। অবশেষে তিনি একদিন তাঁর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে গেলেন। মাজার শরীফের উপর দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই তাঁর হাল পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে নেসবত ঠিক হয়ে গেলো।

৩. মোহাম্মদ মীর

বাতেনী নেসবতের উচ্চতা, প্রচারবিমুখতা, নির্জনতা অবলম্বন এবং তালেবগণের হেদায়েতের জন্য তিনি অনন্য বুজুর্গ ছিলেন। আমি গ্রন্থকার একজন সালেহ ব্যক্তির জবানে শুনেছি, তিনি বলেছেন– বিশজন ব্যক্তি তাঁর সোহবতে থেকে বেলায়েতের স্তরে ফানা ও বাকার মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। আমি (লেখক) তাঁকে একদিন বলেছিলাম, আপনার যে পরিমাণ খরচ হয় বান্দা তা বহন করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কোনো নাজায়েয মাল নিয়ে আসা হয় কি না এই আশংকায় তিনি আমার এ আবেদন কুবল করেননি।

তাছাড়া শাহ আব্দুল হাকিম,[২০] সুফী আব্দুর রহমান, মীর বাহাদুর দরবেশ মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ হাসান প্রমুখ বুজুর্গান তাঁর তাওয়াজ্জোহের ওসিলায় নৈকট্যের মাকামসমূহে পৌঁছেছিলেন। তাঁরা সকলেই তালেবগণের হক হেদায়েতে আপন আপন দায়িত্ব আদায় করতেন। এই ফকীর (লেখক) তাঁদের কারও কারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। শায়েখ মোহাম্মদ মীর র. এর এক কন্যা ওই জমানার ওলী ছিলেন। তাঁর রসুলেপাক স. এর কোরবতের (নৈকট্যের) বৈশিষ্ট্য ছিলো। তাঁর থেকে অনেক বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। কেউ তাঁর কাছে কোনো হালের বিষয়ে জানতে চাইলে জিজ্ঞাসা ছাড়াই সে তার জবাব পেয়ে যেতো। এই পুস্তকপ্রণেতা বলছেন, জনৈক বুজুর্গ, যার বেলায়েত ও নবুওয়াতের নূর ও বিশুদ্ধ কাশফ ছিলো, এমন একজন আমাকে বলেছেন, উক্ত ওলী মহীয়সীর ঘর আনওয়ারে মোস্তফা স. দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর প্রতি মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে দারিদ্র তাঁর জীবনসঙ্গী হয়েছিলো। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে– 'স্রোত যতো দ্রুত গতিতে প্রান্তসীমায় পৌঁছে, দারিদ্র তার চেয়েও দ্রুতগতিতে আমার প্রেমাস্পদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'[২১]

এক পর্যায়ে দারিদ্রের যাতনা যখন তাঁর সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিলো তখন তিনি আফগান মুলুকে চলে যাওয়ার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু রসুলে করীম স. তাঁকে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেনোনা সবর আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও সঙ্গ লাভের ওসিলা। আল্লাহতায়ালা পবিত্র। তিনি সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।

তথ্যপঞ্জী

১. হজরত খাজা সাইফুদ্দীন সেরহিন্দী মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার একজন জলীলুল কদর বুজুর্গ ছিলেন। আওরঙ্গজেব আলমগীরের আহ্বানে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম তাঁকে তাঁর সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের শরীয়ত অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁর খেতাব ছিলো মোহতাসিবুলউম্মাহ। ডঃ গোলাম মোস্তফা খান তাঁর মকতুবসমূহ প্রকাশ করেছেন।

২. জাহেরী এলেমেও তিনি সে সময়ের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর ওফাত হয়েছিলো ১১৪৭ হিজরীতে (খাযীনাতুল আসফিয়া ৬৬৪-৬৬৫)। তাঁকে দাফন করা হয়েছিলো শায়েখ আব্দুল হকের মাজারের পাশে। অভ্যন্তরীণ বেষ্টনীর ভিতরে চারটি কবর আছে। তন্মধ্যে একটি কবর তাঁর (মোহাম্মদ আলমগীর কৃত মাজারাতে আওলিয়া দেহলী পৃষ্ঠা ৯৪)।

৩. কন্যার বংশধর ছিলেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি শায়েখ আব্দুল হকের নাতি ছিলেন (মামুলাত পৃষ্ঠা ১৮)।

৪. হজরত হুজ্জাতুল্লাহ নকশ্‌বন্দ সানি নকশ্‌বন্দি সিলসিলার বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মকতুবসমূহ 'ওসিলাতুল কবুল ইলাল্লহ ওয়ার রসুল' নাম দিয়ে ডঃ গোলাম মোস্তফা খান ১৯৬৩ সালে প্রকাশ করেছেন। তাযকেরাহ উলামায়ে হিন্দ এর লেখক ৪১৮ পৃষ্ঠায়, হাদায়েকুল হানাফিয়া এর লেখক ৪৪০ পৃষ্ঠায় হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজলের জীবনবৃত্তান্ত খাযিনাতুল আসফিয়া কিতাব থেকে সংকলিত করে বলেছেন, হাজী মোহাম্মদ আফজল খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর ফরজন্দ হুজ্জাতুল্লাহ নকশ্‌বন্দের খলীফা ছিলেন। লেখকগণ 'ফরজন্দ' এবং "হুজ্জাতুল্লাহ" উপাধিটির প্রতি লক্ষ্য করেননি। কেনোনা খাজা মোহাম্মদ মাসুমের উপাধি ছিলো হুজ্জাতুল্লাহ। লেখকগণ হাজী মোহাম্মদ আফজলকে খাজা মোহাম্মদ মাসুমের ফরজন্দ লিখেছেন। তথ্যটি ভুল।

৫। হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ (ওফাত ১১২৬ হিজরী) নকশ্‌বন্দিয়া সিলসিলার নামকরা শায়েখ ছিলেন। বিখ্যাত আলেম ছিলেন তিনি। অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। নামকরা কবিও ছিলেন। তাঁর মকতুবসমূহ 'গোলশানে ওয়াহ্‌দাত' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর রচিত 'লাতায়েফুল মদীনা' এবং আরও প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

৬। শায়েখ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ছিলেন সালেম ইবনে মোহাম্মদ বদরী বসরীর পুত্র। (ওফাত ১১৬০ হিজরী)। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'আল এমদাদ ফী উলুবিল আসনাদ'। শাহ্ ওলিউল্লাহ ছিলেন তাঁর পিতা শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেমের ছাত্র (আনফাসুল আরেফীন পৃষ্ঠা ১৯৭)। শায়েখ সালেমের পিতা আব্দুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তারিখে মোহাম্মদী গ্রন্থে।

৭। আল কোরআন সুরা আনআম ৬/১০৩।

৮। হারামাইন শরীফাইন থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর হাজী মোহাম্মদ আফজল দিল্লীতে নওয়াব গাজীউদ্দীন খান মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। (খাযীনাতুল খাওয়াতের ৬/২৮১)। আল্লামা কাত্তানী হাজী মোহাম্মদ আফজলের হারামাইনে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন (ফেহরেছুল ফাহারেছ ১/৩৩৫)/হাজী মোহাম্মদ আফজলের মাজার দিল্লীতে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহর মাজার শরীফের পাশে অবস্থিত (মাজারাতে আওলিয়ায়ে দেহলী, পৃষ্ঠা ১০৩)।

৯। হজরত শাহ ওলিউল্লাহ লিখেছেন, হাজী মোহাম্মদ আফজল মাসাবিহ্ বোখারী ইত্যাদি সিহাহ্ সেত্তা পুস্তক সমূহের সনদ লাভ করেছেন শায়েখ আব্দুল আহাদ থেকে। তিনি তাঁর পিতা শায়েখ মোহাম্মদ সাঈদ থেকে। তিনি তাঁর দাদা শায়েখুত্‌তরিকত শায়েখ আহমদ সেরহিন্দী থেকে। সনদের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (কওলুল জামীল, উর্দু তরজমা, প্রকাশক, মাতবায়ে আহমদী, পৃষ্ঠা ১২৬)।

১০। হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল একটি বিশাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেই লাইব্রেরী থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লোকদেরকে ধর্মীয় পুস্তক প্রদান করতেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী মীর সাইয়্যেদ নাঈমুল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি হজরত হাজী সাহেবের লাইব্রেরীর মোতাওয়াল্লী ছিলেন।

১১। মৌলভী মোহাম্মদ আজম হাজী সাহেবের অন্যতম খলীফা ছিলেন। হজরত মাযহারের খলীফাগণের মধ্য থেকে কোনো একজন তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। হজরত হাজী মোহাম্মদ আজমের ইনতেকাল হয়েছিলো ১১৪৬ হিজরীতে।

১২। হজরত মোহাম্মদ সিদ্দীক হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের ৬ষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তিনি শাহজাহানাবাদে বসবাস করতেন। ১১৩১ হিজরীতে তাঁর ইনতেকাল হয়।

১৩। আমীরুল উমরা গাজীউদ্দীন খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ প্রথম নওয়াব আসিফজাহ্ মোহাম্মদ শাহ্ বাদশাহ্র নিকট প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। খান ফিরোজ জঙ্গ হজরত সাদুল্লাহর নিকট বায়াত ছিলেন। ফয়েজ লাভের জন্য তিনি প্রতিদিন তাঁর হালকায় হাজির হতেন। হাফেজ সাদুল্লাহর ওফাতের পর তিনি হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর খেদমতে হাজির হওয়ার বাসনা করেছিলেন। ফিরোজ জঙ্গ হজরত মাযহারের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র এমাদুল মুলক গাজীউদ্দীন খান ভারতের ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৪। শায়েখ হাসান ইবনে আবুল হাসান হুসাইনী দেহলভী (ওফাত ১১০৩ হিজরী) দিল্লীর একজন বিখ্যাত মাশায়েখ ছিলেন। তিনি মালামাতিয়া তরিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন 'মুন্তাখাবুল লুবব' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২।

১৫। হজরত হাফেজ সাদুল্লাহকে দাফন করা হয়েছে শাহজাহানাবাদ আজমিরী গেইটের বাইরে মাদ্রাসায়ে গাজীউদ্দীন খানের উত্তর পশ্চিম পাশে। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন 'মাজারাতে আউলিয়া' দিল্লী, ১২২ পৃষ্ঠা।

১৬। হজরত শায়েখ সুনামীর জন্মস্থান সুনাম এলাকায়, যা সেরহিন্দ শরীফের নিকটে। শায়েখ সুনামী সম্বন্ধে জানতে হলে পাঠ করুন (১) রেসালা দর হালাতে শায়েখ মোহাম্মদ সুনামী, (২) নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী কৃত মামুলাতে মাযহারিয়া এবং বাশারাতে মাযহারিয়া, (৩) 'জাওয়াহেরে উলুব্বিয়া' পৃষ্ঠা ১০৮। (৪) গোলাম সরওয়ার লাহোরী কৃত 'হাদীকাতুল আউলিয়া' পৃষ্ঠা ১৩০, (৫) গোলাম আলী দেহলভী, 'মলফুজাত শরীফ'।

১৭। খাজা মুসা খান শায়েখ আহমদ ইবনে জালালুদ্দীন মখদুম আজম খাজেগীর (ওফাত ৯৪৯ হিজরী) আওলাদ ছিলেন। মখদুম আজম খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরারের খলীফা ছিলেন।

১৮। ওবায়দ সমরখন্দ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম।

১৯। মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী লিখেছেন, খাজা মুসা তাঁর দাদা মখদুম আজমের ওবায়দ অঞ্চলে অবস্থিত মাজারের সাজ্জাদানশীন ছিলেন। হাজার হাজার লোক তাঁর থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন। হজরত মাযহারের কোনো কোনো খলীফা পূর্বে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

২০। হজরত শাহ আব্দুল হাকীম তাঁর মোর্শেদের ওফাতের পর হজরত মাযহারের কাছ থেকে ফায়দা ও তাওয়াজ্জোহ্ গ্রহণ করেন।

২১। সুনানে তিরমিযী, বাবে যোহদ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

হজরত মির্জা মাযহারের নসবনামা ও জন্ম

হজরত মির্জা মাযহার জানে জানান র. ছিলেন আনওয়ারে এলাহীর প্রকাশস্থল, হুজুর ও চৈতন্যের নমুনা, মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার সংস্থাপক, সুন্নতে নববীর জীবন দানকারী, যুগের অন্যতম বুজুর্গ ও আল্লাহতায়ালার প্রিয়পাত্র। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদ বংশের হজরত আলী রা. এর বংশধর।[১] তাঁর নসবনামা আটাশ পুরুষে মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে।[২] তাঁর পূর্বপুরুষগণ আমীর ওমরা ছিলেন। তৈমুর শাসকদের সঙ্গে তাঁদের নৈকট্য ছিলো। তিনি প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং পছন্দনীয় স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। ব্যক্তিত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, বীরত্ব, দানশীলতা ও দ্বীনদারীর পূর্ণতায় বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পিতামহগণের মধ্যে জনৈক আমীর আব্দুস্ সুবহান দুই পুরুষের মাধ্যমে বাদশাহ্ আকবরের নাতি ছিলেন। তিনি ধন ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও চিশতিয়া তরিকার একজন একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। এই তরিকায় তাঁর হাল খুব ভালো ছিলো। মহব্বতে এলাহীর কারণে তাঁর চক্ষু সবসময় সিক্ত থাকতো। লোকদেরকে মুরিদ করতেন। তাঁর সঙ্গে সিলসিলাভুক্ত সকল মুরিদ জিকিরকারীও তাহাজ্জুদগোজার ছিলেন। তাঁর দাদী সাহেবা ছিলেন আসাদ খান উজীরের কন্যা।[৩] পরিপূর্ণ গুণাবলীতে যিনি ছিলেন একজন অনন্যা রমণী। তিনি মির্জা মাযহারের দাদার সোহবতে এসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন। আলৌকিকতায় তাঁর এতো বেশী অধিকার ছিলো যে, তিনি জড় পদার্থের তসবীহ্ পড়া শুনতে পেতেন। আল্লাহ্প্রেম ও যওক শওকে তিনি তাঁর স্বামীর মতোই ছিলেন। জাহেরী এলেমেও যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিলো তাঁর। তিনি মাওলানা রুমীর মসনবী শরীফের পাঠ দান করতেন।

হজরত মির্জা মাযহারের পিতা

তাঁর পিতার নাম ছিলো মির্জা জান র.। দৌলত ও শাহী পদ ছেড়ে দিয়ে[৪] তিনি দারিদ্র ও অল্পেতুষ্টির সুলতানাত গ্রহণ করেছিলেন। স্বীয় ধনসম্পদ আল্লাহর পথের ফকীরদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। শুধু পঁচিশহাজার রুপি নিজের কন্যার শাদীর জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু পরে কোনো এক সময় শুনতে পান, তাঁর জনৈক বন্ধুর প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দিয়েছে, তখন সমুদয় অর্থ তিনি তাঁকে দান

করেন। তিনি মানবীয় পূর্ণতা এবং আল্লাহপ্রদত্ত আখলাকে অনন্য ছিলেন। প্রতিজ্ঞাপূরণ, লজ্জাশীলতা, শোকরগুজারী, ধৈর্যশীলতা তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী ছিলো।

একবার তিনি তাঁর বাড়িতে একটি লাউ গাছের চারা লাগালেন। তাঁর বাড়ির এক পরিচারিকা বললো, আপনিতো তাওয়াক্কুলের দাবি করেন। আবার বাড়িতে লাউ গাছের চারাও লাগান। মনের মধ্যে এমন বাসনা তো নেই যে, কখনও অভাবের সময় এই গাছের শাক পাতা তুলে আহার করবেন? এমনটি যদি হয়, তাহলে তো আপনার আসবাবের উপর ভরসা প্রমাণিত হবে। পরিচারিকার কথাটিকে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত শিক্ষা মনে করে লাউ গাছটি উপড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নির্জনতা অবলম্বন করলেন এবং আল্লাহর স্মরণকে দুইজাহানের সম্মান মনে করে হজরত শাহ্ আব্দুর রহমান কাদেরীর[৫] নিকট কাদেরিয়া তরিকা গ্রহণ করলেন। তিনি শক্ত জযবা এবং প্রকাশ্য আলৌকিকতার দিক দিয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর সোহবতের বরকতে বিভিন্ন হালের উপর কামিয়াব হয়েছিলেন। জীবনের সময়কে তিনি জিকির, ইবাদত ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে সক্রিয় রাখতেন। একবার তাঁর পীর সাহেব একটি আম খেলেন। আমটি ছিলো অত্যন্ত টক। মুখে দেয়ার একটু পরেই আমটি মাটিতে ফেলে দিলেন তিনি। সমস্ত ঘৃণাভাব দূর করে মাটিতে ফেলে দেয়া আমের রস মুখে তুলে নিলেন মির্জা জান। এহেন আচরণের কারণে তাঁর হাল খুবই ভালো হয়ে গেলো।[৬] হজরত মির্জা মাযহারের জন্ম হয়েছিলো ১১ই রমজান ১১১১ অথবা ১১১৩ হিজরী তারিখে শুক্রবার[৭] ফজরের সময়, সূর্য যখন পৃথিবীতে উদ্ভাসিত হচ্ছিলো। সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁর পেশানী থেকে হেদায়েতের আভা বিচ্ছুরিত হতে দেখা যেতো। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার নূর তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দীপ্তিমান ছিলো। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাঁর মধ্যে উচ্চস্তরের স্বভাব প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করতেন, এককালে তিনি কামেলগণের সরদার হবেন এবং হবেন জ্ঞানীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তাঁর পিতা তাঁর তরবিয়তের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[৮] অল্প বয়সের কারণে তাঁর পিতা তাঁকে সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য সময় ভাগ করে দিতেন এবং তাঁকে বলতেন, মূল্যবান সময় এবং সম্মানিত হায়াতের কোনো বিকল্প নেই। কাজেই তা অযথা নষ্ট করা উচিত নয়। তাঁকে শাহী সৌজন্য, সমরবিদ্যা এবং বিভিন্ন পেশাগত বিদ্যাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।[৯] তাঁর পিতা মির্জা জান বলতেন, তুমি যদি আমীর হও, তাহলে বিদ্বানদের সম্মান কোরো। আর আমি যা পছন্দ করি– ফকীরি জীবন যদি গ্রহণ করো, তাহলে বিদ্বানদের তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি

নিজে সব ধরনের বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সব পেশার বিদ্যায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে এলে সে তার নিজের বিষয়ের ওস্তাদ হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দিতো।

আমি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে জানতে পেরেছি, তিনি শত্রুর আঘাত প্রতিহত করার পঞ্চাশ প্রকারের কৌশল জানতেন। তিনি বলতেন, আমি অস্ত্র বিদ্যাকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি। বিশজন লোকও যদি তরবারী দ্বারা আমাকে হামলা করে, আর আমার হাতে যদি শুধু একটি কাঠের লাঠিও থাকে, তবু একজনও আমাকে জখম করতে পারবে না। মির্জা মাযহার স্বয়ং বলছেন, একদিন মাগরিবের নামাজ শেষ করার পর বৃষ্টির অন্ধকারে এক ব্যক্তি আমাকে খঞ্জর দিয়ে হামলা করলো। যখন বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলোতে লোকটিকে দেখে নিয়ে তার হাত থেকে খঞ্জর ছিনিয়ে নিলাম। পরে তা আবার তার হাতেই দিয়ে দিলাম। সে পুনরায় আমার উপর হামলা করলো। আমি তার হাত থেকে পুনরায় খঞ্জর ছিনিয়ে নিলাম এবং আবার তার হাতেই ফেরত দিলাম। এভাবে সে সাতবার আমার উপর হামলা করলো। অবশেষে সে ব্যর্থ হয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। তিনি আরও বলেছেন, একবার এক পাগলা হাতি আমার গতি রোধ করে দাঁড়ালো। আমি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অপর দিক থেকে আসছিলাম। হাতির মাহুত আমাকে হাতি থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করলো। কিন্তু আমার মন হাতির কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার গ্লানি মেনে নিলো না। হাতিটি রাগান্বিত হয়ে অকস্মাৎ তার শুঁড় দিয়ে আমাকে পেঁচিয়ে ফেললো। আমি তখন আমার কোষ থেকে খঞ্জর বের করে তার শুঁড়ে আঘাত করলাম। হাতিটি বিকট চিৎকার করে আমাকে দূরে নিক্ষেপ করলো। আল্লাহর ফজলে আমি নিরাপদ হয়ে গেলাম।

একবার ইসলামের বিধান মতে এক জেহাদ সংঘটিত হলো। আমাদের সরদার হাতির উপর আরোহণ করে নিকটেই অবস্থান গ্রহণ করলেন (১০)। ভাবলেন সম্ভবতঃ আমি ভয় পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি গজল গাইতে শুরু করলাম। আমার ভাব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন।

আমার বয়স তখন সবে মাত্র নয় বছর। তখন আমি হজরত ইব্রাহীমকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার হালের উপর মেহেরবানি করলেন। ওই বয়সেই যখন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের কোনো আলোচনা হতো, তখন তাঁর পবিত্র চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। আমি আমার জাহেরী চোখ দ্বারা তাঁকে কয়েকবার দেখেছি। তিনি আমার অবস্থার উপর দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকটে এসে একদিন বললো, আগেকার যুগের সুফিয়ানে কেরাম 'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ' এর প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু মোজাদ্দেদে আলফেসানি তার খেলাফ 'ওয়াহ্‌দাতুশ শুহুদ'কে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই আলোচনার সময় আমি

দেখতে পেলাম, সূর্যের মতো একটি নূর প্রকাশিত হলো এবং সেই নূর থেকে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বেরিয়ে এলেন। বললেন, এই আলোচনা পরিত্যাগ করো। আমি এই ঘটনা আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম। বর্ণনা শুনে তিনি আমাকে বললেন, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির তরিকা থেকে তোমার ফায়দা হতে পারে। মির্জা মাযহার বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে চূড়ান্ত পর্যায়ের স্বাভাবিকতা দান করেছেন। সুন্নতের অনুসরণ আমার জন্মগত স্বভাবের মধ্যে আমানত রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, আমার বয়স তখন কম ছিলো। একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে তাঁর পীর হজরত শাহ আব্দুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পেতো। কিন্তু তাঁর নামাজের মধ্যে গুরুত্বহীনতা পরিলক্ষিত হতো। তাই তাঁর সম্পর্কে আমার মনে অপছন্দের ভাব তৈরী হলো। কেনোনা রসুলেপাক স. এর সুন্নত তরককারী কখনও অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমার পিতা আমাকে তাঁর কাছে বায়াত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বসেন কিনা। একদিন আমি আমার পিতাকে বললাম, হজরত শাহ আব্দুর রহমান নামাজের গুরুত্ব কম দেন কেনো? তিনি বললেন, তাঁর উপর মত্ততা প্রবল– তাই তিনি এ বিষয়ে মাযুর। আমি বললাম, নামাজ আদায়ের সময় মত্ততা প্রবল হয়ে যায়, আর অন্য সময় চৈতন্য গালেব থাকে? তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আল্লাহতায়ালা তোমাকে এলেম ও প্রতিভা কি এইজন্য দান করেছেন যে, তুমি আমার পীরের প্রতি কটাক্ষ করবে? যা হোক, এই আলোচনার ফল এই হলো যে, তাঁর কাছে বায়াত হওয়ার জন্য চাপের আশংকা দূর হয়ে গেলো।

তিনি বলতেন, এশক মহব্বতের জন্য চিৎকার আমার দেহের সার পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত। জীবনের প্রারম্ভলগ্ন থেকে সুন্দরের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিলো। আমার স্মরণ আছে, আমি তখন দুই মাসের শিশু। আয়ার কোল থেকে এক সুন্দরী রমণী আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যের ঝলকে সে দিন আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং তাঁর কোলে নিজকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। তাঁর দর্শন ব্যতীত আমি অস্থির হয়ে যেতাম। তাঁকে না পেলে কান্নাকাটি করতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকেই আমার মধ্যে আশেকানা স্বভাব পরিলক্ষিত হতো।[১১] সাধারণের মধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েছিলো যে, শিশুটি আশেকী মেজায পেয়েছে। তিনি বলতেন, ভালোবাসার জযবা আমার মধ্যে এতো প্রবল ছিলো যে, আমি যাকে ভালোবাসতাম, তার শারীরিক অসুস্থতা আমার শরীরেও প্রকাশ পেতো। একবার এক যুবক, আমি যাকে ভালোবাসতাম, সে জ্বরে আক্রান্ত

হলো। সেই জ্বর আমার শরীরেও বিস্তার লাভ করলো। সে ঔষধ সেবন করলো। আর ঔষধের ক্রিয়া আমার শরীরেও প্রকাশ পেলো। একবারের ঘটনা– তখন ছিলো অর্ধচন্দ্র রজনী। আমার ঘরের দরোজা বন্ধ ছিলো। আমি দেখলাম (স্বপ্নে) অকস্মাৎ সেই যুবক ইয়াসমীন ফুল তুলে নিয়ে আমার ঘরে এসে আমার শিয়রের কাছে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলো। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সকাল বেলা দেখি আমার শয্যায় ফুলগুলো ছড়িয়ে আছে।

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি ভালোবাসার কারণে আপন চক্ষুদ্বয় মাটির মধ্যে ঘর্ষণ করেনি, সে সেজদার স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত। কেনোনা হাদিস শরীফের বর্ণনা অনুসারে সেজদাকারীর সেজদা পড়ে আল্লাহতায়ালার কুদরতী কদমের উপর। কারও কারও মধ্যে তাজাল্লিয়ে জাতির প্রকাশ ঘটে ভালোবাসার চোখে। তাজাল্লিসমূহের স্বাদপ্রাপ্তি ও প্রতিক্রিয়া উদ্ভাসিত হওয়া ইত্যাদি মহব্বতের মান অনুসারে হয়ে থাকে। খাজা হাফেজ শিরাজী, শায়েখ ফখরুদ্দীন ইরাকী ও শায়েখ আওহাদ কেরমানী তাঁদের আপন আপন কবিতায় তাজাল্লিসমূহের ইঙ্গিত দিয়েছেন। একথা সত্য যে, কেউ যখন কোনো সুন্দরের প্রতি মুগ্ধ হয়, প্রকৃতপক্ষে তা যে মাশুকে হাকিকীর (আল্লাহতায়ালার) সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব সেকথা তাকে মনে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে হাফেজ শিরাজীর কবিতায় আছে–

জালওয়া মুফত অস্ত আগার দীদাহ বিনায়ী হাস্ত
ইঁ জাহাঁ আয়না আয়না সীমায়ীস্ত
মহর ও মাহ আরদ্ব ও সামা আয়না শোকেল আন্দহামা
মীতু ইয়াঁ ইয়াফত কে দর পর্দা খুদ আরায়ী হাস্ত

'তোমার যদি দর্শনকারী চক্ষু থাকে তাহলে জালওয়া দর্শন ব্যর্থ হবে। এ জগতে সব কিছুর মস্তক হলো দর্পণ। যেমন মহর, মাস, পৃথিবী, আকাশ সব কিছু দর্পণ সদৃশ। এ সবের পর্দায় তাদের নিজেদের দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়।'

এ সম্পর্কে আরেফ জামী র. বলেছেন–

বরোঁযদ খীমা যে ইকলীমে তাক্কাদ্দুস
তাজাল্লী কার্দ বর আফাক ও আনফুস
আযানে লময়ী ফরুগী বর গোলে আফতাদ
যে গোলশুরি বদাঁ বুলবুল আফতাদ
রোখে খুদ শামাযান আতশ্রা ফরুখত
বাহার কাশানা সদ পরওয়ানা রা সুখত

(তিনি (আল্লাহ্‌তায়ালা) তাকাদ্দুসের অঞ্চলের বাইরে তাঁবু খাটিয়েছেন এবং দুনিয়াতে আপন জালওয়া প্রকাশ করেছেন। তারই চমকে ফুল উজ্জ্বল হয়েছে। ফুল থেকে বুলবুলের মধ্যে সুর সৃষ্টি হয়েছে। পতঙ্গ সে আগুন থেকে নিজের চেহারা আলোকিত করেছে। প্রতিটি গৃহে হাজার হাজার পতঙ্গকে জ্বালিয়ে দিয়েছে)।

আল্লাহ প্রেমের সুপ্ত অনল হচ্ছে এশকে মাজাযীর অন্তরের উত্তাপ। তবে শর্ত হচ্ছে আশেক-মাশুকের মধ্যে মোলাকাত হতে পারবে না। কারণ মিলনের পানি অন্তরের উষ্ণতাকে শীতল করে দেয়। এজন্যই বলা হয়েছে, যার মধ্যে ব্যাকুল ভালোবাসা নেই, তার জন্য তরিকা হারাম। হজরত মির্জা বলতেন, শরীয়ত যাকে সৌন্দর্য দান করেছে, সেই সুন্দর। আর শরীয়ত যাকে কুৎসিত করেছে, তাই কুৎসিত। পরহেজগারী ও ইবাদতের মধ্যে যদিও নূর ও স্বচ্ছতা আছে, মহব্বতের পথে যেহেতু দহন রয়েছে, তাই ইবাদতে আস্বাদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তা অগ্রগামী। হাদিস শরীফে হজরত মুগীছ রা. নামক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দীকার বাঁদী হজরত বারীরার আশেক হয়ে গিয়েছিলেন। বারীরা যখন বাজারে যেতেন, মুগীছ তাঁর পিছনে পিছনে যেতেন। তিনি অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন। তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতো। রসুলেপাক স. তাঁর এহেন অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হলেন। বারীরার কাছে সুপারিশ করলেন, মুগীছকে বিয়ে করো।[১৩] হজরত বারীরা নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহর রসুল! এ বিষয়ে যদি ওহী নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে আমি তা কবুল করলাম। অন্যথায় আমার এখতিয়ার আছে। আমি তার চেহারাও দেখতে চাই না। কিছুকাল পর হজরত মুগীছ এশকের যন্ত্রণায় এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন।

রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ভালোবাসে এবং তা মনের মধ্যে গোপন রাখে এবং পবিত্র জীবন যাপন করে, এভাবে তার যদি মৃত্যু হয়, তবে তার মৃত্যু হবে শাহাদতের মৃত্যু। হাদিসটি দারেমী বর্ণনা করেছেন[১৪] —'মান আশাক্বা ওয়া কাতামা ওয়া আ'ফা ওয়া মাতা মাতা শাহিদান'[১৫]

মহব্বতের প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিক বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে মির্জা মাযহার বলেছেন, একজন আশেক বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মাশুকার নিকটে আশেকের করুন মৃত্যুর সংবাদ যখন পৌঁছলো, তখন সেও মাতম করতে করতে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনেক অনুসন্ধানের পর পাওয়া গেলো ভালোবাসার আকর্ষণে দু'জনের জড়ানো নিথর দু'টি দেহ।

বসিয়ার দীদাহ্ আম কে একী রাদু করদ তেগ
শমশেরে এশ্‌ক কে দু কিসরা একী কুনাম

(এরকম তো খুবই দেখা যায় যে, তরবারী একটি জিনিসকে দুই টুকরা করে দেয়। তবে দেখার বিষয় হচ্ছে, ভালোবাসার তরবারী কিন্তু দু'টি জিনিসকে করে দেয় এক)।

তিনি আরও বলতেন, কোনো এক আশেক এশকের গোলামী থেকে মুক্ত হতে না পেরে অসুস্থ হয়ে দেওয়ানা অবস্থায় তার মাশুকাকে আঘাত করতে চাইলো। তখন কেউ তাকে বললো, মাশুকার দোষ কী? এতো তোমার মনের দোষ। একথা শোনা মাত্র সে তার বক্ষ বিদীর্ণ করে তার কলিজা বের করে এনে খঞ্জর দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কলিজা টুকরো টুকরো করে ফেললো। তিনি আরও বলেছেন, কোনো এক আশেক তার মাশুকাকে বেগানাদের মজলিসে যেতে বারণ করে দিয়েছিলো। কিন্তু মাশুকা তার রূপ-যৌবনের অহংকারে সেই নিষেধের গুরুত্ব দিলো না। সে যেখানে যেতে ইচ্ছা করতো সেখানেই চলে যেতো। এদিকে বেচারা আশেক রাগ ও অভিমানে তিলে তিলে দগ্ধ হতে হতে এক পর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে গেলো। মাশুকার কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছলো, তখন আশেকের কষ্টের কথা মনে করে সেও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। উভয়কেই কাছাকাছি জায়গায় দাফন করা হয়েছিলো।

দু যখমে সুযদ আগার জান্নাত হুয বাশাদ মোরা
এক ওজাব জাআয শেরকুয়ীতু বাস বাশাদ মোরা

(বেহেশতের খাহেশ যদি হয়, তবে দোজখের আগুন যেনো আমাকে জ্বালিয়ে দেয়। আমার জন্য তো তোমার দহলিজের এক বিঘত জায়গাই যথেষ্ট)।

তিনি আরও বলেছেন, এক ময়ুর কোনো এক সুন্দরী রমণীকে ভালোবেসে ফেললো। ময়ুরটি পেখম মেলে নৃত্য করে রমণীর চারপাশে চক্কর দিতে লাগলো। লোকেরা তিরস্কার করে বলতে লাগলো, রমণীটি একটি জানোয়ারের মাশুকা হয়েছে। মানুষের তিরস্কারে রমণীর মনে ক্রোধের সঞ্চার হলো। সে তখন ময়ুরটিকে কাছে ডাকলো। ময়ুর তার মাশুকার ডাক শুনে নাচতে নাচতে তার কাছে উপস্থিত হলো। সে ময়ুরকে বললো, তোমার চোখ দুটি আমার নিকটবর্তী করো। ময়ুর রমণীর প্রতি তার জীবন উৎসর্গকারী আশেক ছিলো। বলা মাত্রই সে তার চোখ তার দিকে এগিয়ে দিলো। রমণী তখন উত্তপ্ত একটি শলাকা তার চোখে প্রবেশ করিয়ে দিলো। নিষ্ঠুর রমণী ময়ুরের অপর চোখেও তাই করতে চাইলো। ময়ুর তার অপর চোখও তার দিকে এগিয়ে দিলো। মহিলা তার অপর চোখেও একইভাবে উত্তপ্ত শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিলো। ময়ুরটি দীর্ঘক্ষণ তার মাশুকার

সামনে মাটিতে দাপাদাপি করে তার প্রাণপ্রিয়া মাশুকার জন্য জীবন উৎসর্গ করলো। রমণীটিও পরবর্তীতে ময়ূরের এশকের হাকীকত অনুধাবন করার পর অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করলো।

তিনি আরো বলেছেন, এক নিষ্ঠুর যুবক একজোড়া কবুতর থেকে একটিকে শিকার করলো। তখন অপর কবুতরটি সাথী হারানোর বেদনা সহ্য করতে পারলো না। সেও নিজেকে হালাক করে দেয়ার পরিকল্পনা করলো। সে তার ঠোঁট দিয়ে খড়কুটা এনে জমা করলো এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। তখন সে ওই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে ভস্ম করে দিলো। অন্তিমকালে বললো—

মোরা চুঁ খলীল আতশী দর দেল আস্ত
কে পান্দারাম ইঁ শোলা বরমান গোলআস্ত

(হজরত ইব্রাহীম খলীলের মতো আমার মনের ভিতর আগুন জ্বলছে। আমি সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ফুল মনে করি)।

তিনি আরও বলেছেন, বসন্তকালে এক বুলবুলির খাঁচায় একটি ফুল ঝুলিয়ে দেয়া হলো। বুলবুলি তার মুখটি ফুলের পাঁপড়ির উপর রেখে আহাজারী করতে লাগলো। দীর্ঘ সময় ধরে বিলাপ করার পর এক সময় নিথর হয়ে গেলো। পরে স্পর্শ করার পর দেখা গেলো সে আর নেই।

আজব আয মুর্দা নাবাশাদ বদর খীমায়ে দোস্ত
আজব আয জিন্দা কে চুঁজান বদর আওয়ারাদ সেলীম

(বন্ধুর দরজায় লাশ হয়ে যাওয়া কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, কোনো জীবন্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জীবন দিয়ে দেয়া)।

শাহ্ গোলাম আলী র. বলছেন, আমিও দেখেছি, বর্ণিত মহব্বতের দৃষ্টান্তগুলোর মতো কেউ কেউ নিজের জীবনে মহব্বতের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছেন। ভালোবাসার কারণে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা জগত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে মাহবুবের দর্শনের মধ্যে চিরনিমজ্জিত হয়েছেন। 'আল্লাহুম্মা আহ্ইনী ফী হুব্বিকা ওয়া আমিতুনী ফী হুব্বিকা ওয়াহ্শুরনী ফী হুব্বিকা' (হে আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বতের মধ্যে জীবিত রাখো। তোমার মহব্বতের মধ্যে রেখে মৃত্যুদান করো এবং তোমার মহব্বতের মধ্যেই আমাকে হাশর করিয়ো)।

মির্জা মাযহার র. বলেছেন, আমার পিতা কোনো কোনো সময় বলতেন, তোমার কসম তোমার জন্ম আমার জন্য মোবারক হয়েছে। যে বছর তোমার জন্ম

হয়, সে বছরই দুনিয়ার প্রতি আমার নির্লিপ্ততা দেখা দেয়। ফকিরী ও অল্পে তুষ্টির দৌলত হাসিল হয়। মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, আমার পিতার সোহবতে আমার স্বভাবে তরকে দুনিয়া এবং মাহবুবের প্রতি রগবত পয়দা হয়েছিলো। ফকিরী জীবনকে দৌলতের জিন্দেগীর উপর প্রাধান্য দিয়েছিলাম। তিনি আরও বলেছেন, আমার বয়স যখন ষোল বছর, তখনই আমি পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হই। মৃত্যুর সময় আমার পিতা আমাকে ওসিয়ত করে বলেছিলেন, তোমার জীবনকালকে বণ্টন করে এভাবে কাজে লাগাবে, যেনো তার মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হও। অযথার্থ কাজে সময় নষ্ট করবে না। পিতা সম্পর্কে মনে করবে, তিনি জীবিত আছেন। আর তোমার পিতার জীবনের মকসুদ ছিলো যোগ্যতা এবং পূর্ণতা অর্জনের জন্য তরবিয়ত করা। তিনি আরও বলতেন, আমার পিতার ওসিয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমি আমার সময়কে এলেম হাসিল, আমল করা এবং বন্ধুগণের সোহবত লাভ করা– এসবের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিলাম। এতে করে আমি জীবনে উপকৃত হয়েছি। তিনি আরও বলেছেন, পিতার ইনতেকালের পর শুভাকাংখীগণের মধ্য থেকে অনেকেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দরবারী পদটি গ্রহণ করো। তাদের পরামর্শে চাকুরী পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাদশাহ্র নিকটে গেলাম। কিন্তু বাদশাহ্ তখন সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে দরবারে উপস্থিত হতে পারেননি। ওই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি, কোনো এক বুজুর্গ তাঁর মাজার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁর মাথার তাজখানা আমার মাথায় রাখলেন। আমার মনে হলো, তিনি ছিলেন হজরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী র.।[১৬] স্বপ্নটি দেখার পর তাজ ও দৌলত পাওয়ার বাসনা আমার মন থেকে উধাও হয়ে গেলো। ফকীর দরবেশদের জিয়ারত করার বাসনা মনের মধ্যে বাসা বাঁধলো। তখন থেকেই কোনো কামেল ব্যক্তির নাম শুনলেই তাঁকে দেখার জন্য সেখানে চলে যেতাম।

একবার আমি শেখ কলীমুল্লাহ চিশতী[১৭] কে দেখার জন্য গেলাম। তিনি সে যুগের একজন অন্যতম বুজুর্গ ছিলেন। তিনি তখন হাদিস পাঠদান করছিলেন। এক হাদিসে এসেছে, এক রাতে জ্বিনদের মধ্য থেকে কোনো এক দুষ্ট জ্বিন রসুলেপাক স.কে আক্রমণ করলো। তিনি হজরত সুলায়মানের দোয়া না পড়েই জ্বিনকে পাকড়াও করার এরাদা করলেন– তখন আমার মনের মধ্যে এই খেয়াল জাগলো যে, দেখি এই শায়েখ এই হাদিসের কী ব্যাখ্যা দেন। তিনি বললেন, এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, একজন শায়েখের উপর অবশ্য কর্তব্য অন্য কোনো শায়েখের মুরিদের উপর তার পীরের এজাযত ছাড়া তাওয়াজ্জোহ প্রয়োগ না করা।

তিনি আরও বলেছেন, একদা আমি শাহ্ মুযাফ্ফর কাদেরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করলো, এ জামানায়ও কি কোনো আবদাল ও আওতাদ আছেন? তিনি জবাব দিলেন, কোনো জামানাই আল্লাহর বন্ধু থেকে খালি থাকে না। কারও যদি কোনো আবদালকে দেখার আগ্রহ হয়, তাহলে সে যেনো এই যুবককে (মির্জা মাযহারকে) দেখে। এটি ওই সময়, যখন আমি তরিকা গ্রহণ করিনি। কিন্তু শায়েখ তাঁর ফেরাসতের নূর দ্বারা পরখ করে আমার ব্যাপারে এমতো মন্তব্য করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি শাহ্ গোলাম মোহাম্মদ মোওয়াহ্হেদের জিয়ারতে গিয়েছিলাম। তাঁর খানকা সবর, অল্পে তুষ্টি নির্লিপ্ততা ও তাওয়াক্কুলের দিক দিয়ে হজরত জুনায়েদ বাগদাদীর খানকার মতো ছিলো। তিনি আরও বলেছেন, আমি মীর হাশেম জালেশরীর জিয়ারতে গিয়েছিলাম। তিনি বলতেন, আমার পীর জীবনে পাঁচ হাজার বার কোরআন খতম করেছিলেন। মীর হাশেমের এলহাম হলো, তোমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। আর তোমার দাফনের স্থান হবে কাশমীরে। তিনি পথ অতিক্রম করে কাশ্মীরে পৌঁছে গেলেন এবং সেখানেই তাঁর ইনতেকাল হলো।

এভাবে বহু বুজুর্গানেদ্বীনের সঙ্গে মির্জা মাযহারের জিয়ারত লাভ হয়েছিলো এবং তিনি তাঁদের সোহবত লাভ করেছিলেন। তাঁদের অনুগ্রহের দৃষ্টি পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

তথ্যপঞ্জি

১। হজরত আলীর ওই সন্তান, যিনি হজরত ফাতেমার ঔরসজাত নন। তাঁকে উলুব্বী বলা হয়– ফাতেমী বলা হয় না।

২। হজরত মাযহারের নসবনামা হজরত মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মাধ্যমে হজরত আলী পর্যন্ত এ ভাবে পৌঁছেছে– তাঁর পিতার নাম মির্জা জান জানা, তাঁর পিতা মির্জা আব্দুস সুবহান, তাঁর পিতা মির্জা মোহাম্মদ আমান, তাঁর পিতা শাহ্ বাবা সুলতান, তাঁর পিতা বাবাখান, তাঁর পিতা আমীর গোলাম মোহাম্মদ, তাঁর পিতা আমীর মোহাম্মদ, তাঁর পিতা খাজা রোস্তম শাহ্, তাঁর পিতা আমীর কামালুদ্দীন। তিনি ঊনিশ পুরুষের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মাধ্যমে হজরত আলী পর্যন্ত পৌঁছেছেন। নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী কৃত মামুলাতে মাযহারিয়া, পৃষ্ঠা ১১।

৩। মাওলানা নাঈমুল্লাহ্ বাহরায়েচী বলেছেন, তিনি আসাদ খান ওজীরের খালাতো বোন ছিলেন। মামুলাতে মাযহারিয়া পৃষ্ঠা ১৪।

৪। গারেসাঁওতাসী লিখেছেন তিনি কাযী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারিখে আদাবিয়াতে হিন্দুস্তান দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৯৭ এবং মির্জা মাযহার আওর উনকা কালাম পৃষ্ঠা ৪৩ লেখা হয়েছে, তিনি আওরঙ্গজেবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিফতায় লেখা হয়েছে, তিনি কোনো কারণে আওরঙ্গজেবের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে স্বীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তবে অন্যান্য

সূত্রে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাশারিয়াতে মাযহারিয়ায় এ রকম বর্ণনা রয়েছে, আওরঙ্গজেবের যখন দুর্দিন যাচ্ছিলো, আরকাটের সুবাদার তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মির্জা জান যে সুবায় নিযুক্ত ছিলেন, সেখানকার সুবাদারের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সুসম্পর্ক ছিলো। সেজন্য বাদশাহ্ সন্ধির জন্য তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে বিদ্রোহী সুবাদারকে বাদশাহ্র প্রতি অনুগত্য প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করেন। সুবাদার সন্তুষ্ট হয়ে বাদশাহ্র জন্য অনেক উপঢৌকন প্রেরণ করে। মির্জা মাযহার জান সেগুলো বাদশাহ্র দরবারে পেশ করেন। বাদশাহ্ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তুমি কী যা চাও বলো। তিনি বলেন, আমি আমার পদে উন্নতি চাই। একথা শুনে বাদশাহ্ রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমার পিতা-পিতামহের অকৃতজ্ঞতার কথা কি স্মরণে নেই? তিনি বলেন, অকৃতজ্ঞতা এবং আত্মত্যাগ সব কিছুই স্মরণ আছে। তাঁদের আত্মত্যাগের বদৌলতেই আজ হিন্দুস্তানে আপনার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাদশাহ্ বলেন, খুলদে মাকানের পক্ষ থেকে কয়েকটি বিষয়ে আমার প্রতি ওসিয়ত আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি যেনো তোমার খান্দান থেকে কাউকে উচ্চপদ দান না করি। মির্জা জান বললেন, আমিও এই খেদমত থেকে নিজকে গুটিয়ে নিলাম। একথা বলে তিনি তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং আকবরাবাদে এসে নির্জনতা অবলম্বন করেন। নাঈমুল্লাহ্ বাহরায়েচী রচিত বাশারাতে মাযহারিয়া, পৃষ্ঠা ১৮।

উপর্যুক্ত বর্ণনায় ঐতিহাসিক তথ্যগত দু'টি ভুল পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তখন আরকাট নামক কোনো সুবার অস্তিত্ব ছিলো না। সুতরাং আরকাটের সুবাদারের বিদ্রোহের বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই। হতে পারে অন্য কোনো সুবায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। সম্ভবতঃ ভুলবশতঃ আরকাট লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়টি খুলদে মাকান আওরঙ্গজেবকেই বলা হতো। শিফতার বর্ণনায় তাই পাওয়া যায়। তারিখে হিন্দুস্তানেও এর বর্ণনা রয়েছে, পৃষ্ঠা ৩৩৫।

৫। হজরত হাজী আবদুর রহমান দেহলভী কাদেরিয়া সিলসিলার মশহুর শাখা– নওশাহীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এজন্য তাঁকে কাদেরী নওশাহী বলা হতো। হজরত পীর মোহাম্মদ নওশাহীর কাছে বায়াত হয়েছিলেন তিনি। কিছুকাল শাহ্ নাথা সুলতানের খেদমতে ছিলেন। তাঁর শায়েখের ইনতেকালের পর সেখান থেকে তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। অতঃপর সেখান থেকে হজ্বে চলে যান। হজ্ব থেকে ফিরে এসে আহমদাবাদে এক বছর অবস্থান করেন। দিল্লীতে তিনি কুচাখান দুরানে অবস্থান করেন। হাজী আবদুর রহমান 'মসনবীয়ে গঞ্জেরাজ' নামক একটি ফার্সী কাব্য রচনা করেছিলেন, যা গোলাম আহমদ ১৩১৩ হিজরীতে প্রকাশ করেন। তাঁর এক পুত্র ছিলো। তাঁর নাম মিয়া আব্দুল্লাহ। মির্জা জান ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকজন খলীফা ছিলেন। যেমন শায়েখ আব্দুল করীম দেহলভী ও আল্লামা মোহাম্মদ শাহ্ সাদাকাত কুঞ্জাহী।

৬। হজরত মাযহারের পিতা মির্জা জানের ইনতেকাল হয়েছিলো ১১৩০ হিজরীতে। বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। কাব্য রচনাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ আমীর ও সুলতান তাঁর স্বভাব-চরিত্র অনুসরণ করতেন। আলমগীরের সৈন্যবাহিনীতে আরও কয়েকজন এরূপ গুণের অধিকারী ছিলেন। মির্জা জান তাঁদের

অনুসরণীয় ছিলেন। তিনি নৌকা চালনা ও তীরন্দাজ বিদ্যায় ছিলেন অনন্য। নৌকা চালনা বিদ্যায় তাঁর অগণিত শিষ্য ছিলো।

৭। হজরত মাযহারের জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। মাওলানা নাঈমুল্লাহ ও হজরত শাহ গোলাম আলী লিখেছেন, ১১১১ এবং ১১১৩ হিজরী। তবে মাওলানা নাঈমুল্লাহ ১১১১ হিজরীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৮। তাঁর যখন ভালোমন্দ বুঝবার বয়স হয়, তখন তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা দেয়ার জিম্মাদারী গ্রহণ করেন। আরবী শিক্ষার জন্য একজন যোগ্য ওস্তাদ রেখে দেন। এ জন্যই তিনি বলতেন, আরবী ও কামালাতে দরবেশীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছি আমার পিতার কাছ থেকে। 'বাশারাত', পৃষ্ঠা ১-৮। বালেগ হওয়া পর্যন্ত তিনি আগ্রাতেই ছিলেন। তারপর সেখান থেকে দিল্লী চলে আসেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহর বর্ণনা।

৯। হজরত মাযহার বলেছেন, আমি অলংকার তৈরী ও পত্তনী পত্র রচনার বিদ্যা শিখতে চৌদ্দ বছর অতিবাহিত করেছি এবং এর মধ্যে দক্ষতা অর্জন করেছি। 'বাশারাত' ৬ অনুচ্ছেদ।

১০। ওই সরদারের নাম ছিলো শায়েখ সরফরাজ আলী খান পূরবী।

১১। হজরত মাযহারের বন্ধুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে লেখকগণ আশেকী কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন।

১২। 'দেওয়ানে হজরত মাযহার', প্রথম প্রকাশ, মুস্তফায়ী প্রকাশনা, কানপুর- ১২৭১ হিজরী, পৃষ্ঠা ৩০।

১৩। তিরমিযী শরীফে এসেছে, হজরত বারীরা হজরত মুগীছের বিবাহবন্ধনে ছিলেন। তাঁকে যখন আযাদ করে দেয়া হয়, তখন স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন ঠিক রাখা না রাখার ব্যাপারে তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিলো। তখন হজরত মুগীছ ক্রন্দন করতেন এবং তাঁর সঙ্গে সংসার করার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন। কিন্তু বারীরা তাঁকে চাইলেন না। তিরমিযী, প্রকাশক সাঈদ এ্যান্ড কোম্পানী, করাচী। পৃষ্ঠা ২১৯।

১৪। 'মসনদে দারেমী'র প্রকাশিত ও প্রচলিত পুস্তকে হাদিসটি পাওয়া যায় না।

১৫। হাফেজ ইমাম সুয়ূতী হাদিসখানি উদ্ধৃত করেছেন 'জামেউস সগীর' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে, ১৬০ পৃষ্ঠায়। মুনাদী জামেউস সগীরের টীকাভাষ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

১৬। খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর ওফাত হয়েছিলো ১৪ই রবিউল আউয়াল ৬৩৩ হিজরীতে।

১৭। হজরত শাহ কলীমুল্লাহ জাহানাবাদীর ওফাত হয়েছিলো ১১৪২ হিজরীতে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী থেকে ফায়দা গ্রহণ

মির্জা মাযহার জানে জানান বলেছেন, আমার বয়স যখন আঠারো বছর, তখন এক ব্যক্তি আমার সামনে হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর কামালিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করছিলো। হজরতের গুণাবলীর বর্ণনা শেষ মাত্রই আমার অন্তরে তাঁর পদচুম্বন করার আগ্রহ জাগ্রত হলো। সুতরাং তাঁর মারেফতের দীদার লাভ করার সৌভাগ্য আমার হলো। সত্যই তাঁকে একজন মহান বুজুর্গ হিসাবে পেলাম। তাঁকে শরীয়তের অনুসারী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর সুন্নতের প্রতিপালনকারী এবং আল্লাহ্তায়ালার আখলাকের প্রতিবিম্ব হিসাবে দেখতে পেলাম। তাঁর সোহবতের নূর আমার দিলকে পরিচ্ছন্নকারী এবং প্রাণের জন্য শান্তি আনয়নকারী ছিলো। আমি আমার বিশ্বাসের চোখ দিয়ে দেখলাম, মকসুদ এখানেই পূরণ হবে। আমার অন্তর প্রশান্তি পেলো। প্রত্যক্ষ করলাম, হকের আভা উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমাকে দেখে হজরত প্রশ্ন করলেন, কী জন্য এসেছো? নিবেদন করলাম, ফায়দা লাভের জন্য। এস্তেখারা ব্যতীত তরিকা শিক্ষা দেয়া তাঁর স্বভাববিরোধী ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্র ফজলে কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই তিনি আমার হালের দিকে মনোযোগ দিলেন। ফলে আমার পাঁচ লতীফায় ইসমে জাতের জিকির শুরু হলো। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিলো, তাঁর প্রথম তাওয়াজ্জোহেই সালেকের পাঁচ লতীফা জারী হয়ে যেতো এবং সালেক তাজাল্লিয়ে সিফাতের আবির্ভাবস্থল হয়ে যেতো। তাঁর তাওয়াজ্জোহের তাছীরে আমার বাতেন জগতে এমন এক ধরনের রঙ আবির্ভূত হলো যে, আয়নায় নিজের সুরত হুবহু তাঁর সুরতের মতো দেখতে পেলাম। যার ফলে তাঁর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পেলো এবং বিশ্বাসও সুদৃঢ় হলো। মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী সালেকগণের হালের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। তাদের ভুলত্রুটি হলে সাবধান করে দিতেন।

একদিনের ঘটনা– পথিমধ্যে এক বেগানা মেয়েলোকের প্রতি আমার নজর পড়েছিলো। তাঁর খেদমতে যখন হাজির হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তো তোমার মধ্যে যেনার কালিমা দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবতঃ তোমার দৃষ্টি কোনো বেগানা নারীর প্রতি পড়েছিলো। আমি আমার নিজের হালের প্রতি লক্ষ্য করলাম এবং আমার বাতেনে তমসা প্রত্যক্ষ করলাম।

একদিন রাস্তার মাথায় এক শরাবীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। হজরত আমাকে বললেন, আজ তোমার বাতেনে শরাবের তমসা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ তুমি শরাব পান করেছো। তিনি আমার হালের প্রতি লক্ষ্য করে আমার মধ্যে শরাবের কালিমা

দেখতে পেলেন। বললেন, ফাসেকদের সাক্ষাৎ ঘটলে বাতেনের নূর অপরিষ্কার হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ! অবস্থা যদি এরকম হয়, তাহলে গোনাহ্ করলে হাল কী রকম হতে পারে?

এমনিভাবে তিনি তাঁর সাথীদের আমলের নূর তাদের বাতেন জগতে প্রত্যক্ষ করতেন। কেউ যদি কালেমা তাইয়্যেবার ওজিফা আদায় করার পর তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন, তখন তিনি বলতেন, আজ তুমি কালেমা তাইয়্যেবার ওজিফা আদায় করেছো। কেউ যদি দরূদ শরীফের আমল করে তাঁর কাছে হাজির হতেন, তখন তিনি বলতেন, আজ তোমার কাছ থেকে দরূদ শরীফের আমলের নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একদিন বললেন, দরূদ শরীফ পাঠকালে তার সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি বললাম, দরূদ শরীফের সংখ্যা বুঝা যাবে কেমন করে। তিনি বললেন, দরূদ শরীফের নূর শত পাঁপড়ি বিশিষ্ট ফুলের মতো পৃথক পৃথকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, হজরতের সোহবতের বরকতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার তরিকতের বাতেন জগতের হাল অর্জিত হয়েছিলো। উপর্যুপরি জযবা (আত্মিক আকর্ষণ) অর্জিত হওয়ার ফলে আমার অন্তকরণ গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে পবিত্র হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত অন্তরে বসে গিয়েছিলো। ফলে অন্য কিছুর মহব্বত অন্তরে স্থান পায়নি। অসহ্য প্রেমজ্বালায় আমার আহার নিদ্রা ও আরাম দূর হয়ে গিয়েছিলো। পরিচ্ছদবিহীন অবস্থায় জনমানবহীন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অব্যক্ত বস্তু লাভের আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষার প্রহর গুণে গুণে আমার অন্তকরণ চিরন্তন মহাসত্যের দিকে ধাবিত হয়ে গেলো। হুজুরী এবং এহসান কলবের লতীফার মতো হয়ে গেলো।

'আন তা'বুদুল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু'[১] (তুমি আল্লাহ্র ইবাদত এভাবে করবে যেনো তুমি আল্লাহ্তায়ালাকে দেখতে পাচ্ছো) এই হাদিসের চাহিদা অনুসারে আমার হাল বাস্তবায়িত হলো। সাহেবে দিল হজরতগণের পরিভাষা অনুসারে আমার ফানা (লয়) ও বাকা (স্থিতি) অর্জিত হলো। দিল থেকে ওয়াস্ওয়াসা ও অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো এবং তওহীদের রহস্য উন্মোচিত হলো। সমস্ত গাছ পালা ও জড় পদার্থ প্রেমাস্পদের সুরতে দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। কখনও কখনও অধিকের মধ্যে এককত্ব দৃষ্টিগোচর হলো। আবার কখনও (গায়রুল্লাহর) খেয়াল দূরিভূত হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে কলবে আহাজারী এবং কান্না শুরু হয়ে যেতো। আল্লাহ্র ভয়, কান্না ও গোনাহ্র কারণে অনুতাপ সৃষ্টি হতে লাগলো। এমতাবস্থায় জেহরী জিকির দ্বারা মনের মধ্যে নম্রতার ভাব আসতো। ওয়াজদ ও হালের কারণে অশ্রু প্রবাহিত হতো। জযবার উত্তাপের কারণে অন্তকরণে অসহ্য জ্বালা এবং কান্নার সূত্রপাত হতো।

বুলবুলি বর্গ গুলি খোশ রং দর মেনকারে দাশত্
দানাদ রাঁ বুর্গও নওয়া খোশ নালেহায়ী যারে দাশত্
গুফতশ্দর আইন ওয়াসাল ইঁ নালা ও ফরইয়াদে চিস্ত
গুফতে মারা জালওয়ায়ে মাশুক দর ইঁ কারে দাশত্

(বুলবুল সুন্দর রঙের ফুলের পাপড়ি তার ঠোঁটের মধ্যে নিয়ে আহাজারী প্রকাশ করছিলো। আমি তাকে বললাম, মিলনের মুহূর্তে বিলাপ করার অর্থ কী? সে বললো, মাশুকের জালওয়া (সৌন্দর্যের আভা) আমাকে এ কাজ করতে আদেশ করেছে)।

যে মিলন কলব লতীফার মূল থেকে হয়ে থাকে, তার মধ্যে অসহ্য শওক (আকাংখা) সৃষ্টি হয়। যার কারণে দৃশ্যমান সৌন্দর্য, দর্শন, সঙ্গীত শ্রবণ এবং ক্রন্দনের মাধ্যমে তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিছু কাল এ ধরনের আকাংখা ও আস্বাদন আমাকে বিভোরতার মধ্যে রেখে গায়রুল্লাহ থেকে উদাসীন করে দিলো। এমন কি কলব লতীফার সুলতানাত (রাজত্ব) বাস্তবায়িত হলো এবং দেমাগী (মস্তিষ্কজাত) লতীফা থেকে তা অগ্রগামী হয়ে গেলো। শওকের (আকাংখার) অনল শীতল হয়ে গেলো। আহাজারী করার অবকাশটুকুও আর অবশিষ্ট রইলো না। আমার মধ্যে নিরবতা এবং এক ধরনের স্বাদহীনতা সৃষ্টি হলো। তখন আমি আমার হাল সম্পর্কে আমার মোর্শেদের কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি আমার যাবতীয় হালের বর্ণনা শোনার পর আফসোস করে বললেন, এখন সে সমস্ত হাল কোথায়? এ স্বাদহীনতাই মোবারক হোক। এই কলবের মাকামে আমার অন্যান্য হালসমূহ অর্জিত হলো। এই মাকামে জযবা (আকর্ষণ)সমূহ নেগরানী (পর্যবেক্ষণ) এবং এনতেজার-স্বাভাবিকভাবেই আমার অর্জিত হলো। এরপর চার লতীফা (রূহ, সের, খফী ও আখফা) এবং নফস লতীফাও আমার হাসিল হলো। নফসের ফানা, চারিত্রিক উৎকর্ষ, জৈবিক চাহিদা খর্বকরণ, দুর্বলকরণ এবং আমিত্বের ফানা হাসিল হলো। এ পর্যায়ে আমি পূর্ণতা ও গুণাবলীকে মূলের প্রতি সম্পৃক্ত পেলাম এবং স্বীয় সত্তাকে আস্তিত্বহীন হিসাবে দেখতে পেলাম। এ মাকামের এলেম ও মারেফত অর্জিত হলো। নেসবতের নূর বিস্তার লাভ করে শরীরকে বেষ্টন করলো। যে সকল কল্পনা মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে কলবে পতিত হয়, তাও দূরীভূত হয়ে গেলো। হজরত মোজাদ্দেদ র. প্রত্যেক লতীফার সুলুক আলাদা আলাদা করে নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর তিনি কলবের সুলুক ও সুমার্জিত করণের পর নফস লতীফার উপর আমল নির্ধারণ করেছেন। এই দুই লতীফার আলোকেই রূহ, সের , খফী ও আখফার নূর ও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় এবং তাদের মূল থেকে ফানা এবং বাকা হাসিল হয়।[২]

মির্জা মাযহার বলেছেন, আমি আমার শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর কাছ থেকে চার বছর পর্যন্ত ফায়দা হাসিল করেছি। তারপর তিনি আমাকে তরিকা শিক্ষা দেয়ার এজাযত এবং বরকতের খেরকা প্রদান করেন। তিনি আমাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা, সুন্নতের উপর আমল এবং বেদাত বর্জন করার ওসিয়ত করেন।

তিনি আরও বলেছেন, হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের খলীফা হজরত শাহ গোলশান[৩] একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শায়েখ তোমাকে কোন মাকামের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বাতেনের সায়ের ও সুলুকে তোমাকে কোন মাকাম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন? তখন আমার শায়েখ আমার মাকাম সম্পর্কে যা কিছু বলতেন, আমি তাঁকে তাই বললাম। এ সব কথা শুনে হজরত শাহ গোলশান বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি এসব অস্বীকার করে বললেন, তোমার পীর তো অনেক উচ্চতার দাবি করেছেন। কিন্তু এ সব তো বিখ্যাত আকাবেরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না। আমি তাঁর এ সকল মন্তব্য সম্পর্কে আমার পীর কেবলাকে জানালাম। বললাম, তিনি তো আপনাকে অস্বীকার করেন। মোর্শেদ কেবলা বললেন, তুমি সেখানে কেনো গিয়েছিলে? তাঁর এলেম তো আল্লাহ্‌র এলেম নয় যে, সব কিছুকেই বেষ্টন করতে পারবে। আর আমি তো কোনো পয়গম্বরও নই যে, আমাকে অস্বীকার করলে কুফুরী হবে। তাছাড়া আমি বেলায়েতের দাবিও তো করি না যে, আমাকে অস্বীকার করলে কেউ ফাসেক হয়ে যাবে। মির্জা মাযহার বলেন, এভাবে শায়েখ গোলশানের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। কেনোনা মাশায়েখগণের ভাষ্য আছে, কেউ যদি তোমার পীরের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে আর তুমি তাকে ভালো মনে করো, তাহলে কুকুর তোমার চেয়ে উত্তম। এক বছর পর শাহ গোলশানের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি তোমার পীরকে অস্বীকার করেছিলাম। আমি আমার পীর মোর্শেদের স্বীকৃতিমূলক জবাব দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার পীরের পূর্ণতার বিষয় আমার নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।

একদিন আমি বাজারের এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। একটি পালকী আগমন করলো। পালকীটি আগমন করার সঙ্গে সঙ্গে বাজারটি আলোকিত হয়ে গেলো। কেউ যেনো বললো, মির্জা জান জানান সাহেবের পীর আগমন করেছেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলাম, ঘরটি বাইতুল্লাহ শরীফের মতো নূরানী হয়ে গিয়েছে। ঘরের দেয়াল মাটি সব কিছুতেই কাইফিয়াতে এলাহীর ঢেউ খেলছে। আমি আমার পীর সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর খেদমতে হাজির হয়ে শাহ গোলশান যে প্রশংসা করেছেন, তার বর্ণনা

দিলাম। ওই প্রশংসা ও স্বীকৃতির মূল বক্তব্য শোনার পর তাঁর মধ্যে খুশির কোনো আলামত আমি দেখতে পেলাম না। কেনোনা সর্বসাধারণের প্রশংসা ও মন্দ ধারণা থেকে তাঁর নফস পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রেজা ও তাসলীম তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিলো।

মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, হজরত বদায়ুনীর ওফাতের পর আমি নিয়মিত তাঁর মাজার জিয়ারত করে নূর হাসিল করতাম। এভাবে আমি দুই বছর পর্যন্ত তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্য নিয়মিত যেতাম। তাঁর তাওয়াজ্জোহে আমার বাতেনী জগতের উন্নতি হয়েছিলো। আমি বাতেনী সুলুক, সিফতের মধ্যে দুবার শুয়ুনাত এবং উসুল অতিক্রম করে ইসমে বাতেনের তাজাল্লিয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। তখন বিভিন্ন হালের পরিবর্তন, বিস্ময়কর হালসমূহ আমার বাতেনী নেসবতের মধ্যে দর্শন করতে লাগলাম। তখন আলী কুশায়রী[৪] খাজা মোহাম্মদ সিদ্দিকের খলীফা আমাকে বলতেন, হজরত সাইয়্যেদ বদায়ুনী সাহেবের মাজারের ওসিলায় তোমার নেসবতে নতুন রঙ এসেছে এবং উন্নতি হচ্ছে। আমি বললাম, আমিও আমার হালের উন্নতি অনুভব করছি।

শায়েখ মাযহার র. আরও বলেছেন, হজরত সাইয়্যেদ বদায়ুনী স্বপ্নযোগে আমাকে বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার কামালাত সীমাহীন। সেজন্য নিজের জীবন হকের অন্বেষণে ব্যয় করা উচিত। কবর থেকে ফায়দা হাসিলের অনুমতি নেই। কোনো জীবিত বুজুর্গের খেদমতে গিয়ে নৈকট্যের মাকাম হাসিল করা উচিত। আমার প্রতি তাঁর এই নির্দেশ কয়েকবার প্রকাশিত হলো। তখন আমি তাঁর হুকুম মোতাবেক সে সময়ের বুজুর্গানেদ্বীনের নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম।

তথ্য পঞ্জি

১ ফতহুল বারী শরহে বোখারী, ইবনে হাজার আসকালানী, পৃষ্ঠা ১১৪, অনুচ্ছেদ-৩৭।

২ বিস্তারিত জানার জন্য

ক) মাক্বামাতে মাযহারী, মাকাতিব অনুচ্ছেদ, মকতুব-২৪।

খ) হেদায়াতুত্ত্বলেবীন, শাহ আবু সাঈদ মোজাদ্দেদী।

গ) আরবায়ে আনহাব, শাহ আহমদ সাঈদ মোজাদ্দেদী।

ঘ) ইজাহুত্তরিকা, শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী।

ঙ) আলতাফুল কুদ্দুস, শাহ ওলিউল্লাহ।

৩ হজরত শাহ গোলশান, ওফাত ১১৪০ হিজরী। তাঁর সম্পর্কে অধিক জানতে হলে পাঠ করতে হবে হালাতে শুআরা।

৪ মাক্বামাতে মাযহারীর দু'টি সংস্করণে আলী কাশমিরী ছাপা হয়েছে। এটি ছাপার ভুল। মামুলাতে মাযহারিয়া পৃষ্ঠা ১৫তে লেখা হয়েছে আলী কুশায়রী। এটিই বিশুদ্ধ। তাঁর নামের সাথে শায়েখুল আরব উপাধি লেখা হয়েছে।

৫ হজরত শায়েখ মোহাম্মদ সিদ্দীক সেরহিন্দী ইবনে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম সেরহিন্দী হজ্বব্রত পালন করে দিল্লীতে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাদশাহ্ ফররখ সায়র তাঁর শিষ্য ছিলেন। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করা উচিত (ক) মাক্বামাতে মাসুমিয়া- সফর আহমদ। (খ) রওজাতুল কাইয়্যুমিয়া, কামালউদ্দীন মোহাম্মদ এহসান। (গ) হেদায়াতে আহমদিয়া, আহমদ আবুল খায়ের মক্কী। (ঘ) নুযহাতুল খাওয়াতের, আব্দুল হাই।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

হাজী মোহাম্মদ আফজল থেকে ফায়দা গ্রহণ

মির্জা মাযহার বলেছেন, আমি হজরত শাহ গোলশানের খেদমতে হাজির হয়ে আমার বাসনা প্রকাশ করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এ যুগের একজন শায়েখ প্রয়োজন। আমি তো এ তরিকার আদব পূর্ণরূপে রপ্ত করতে পারিনি। কখনও কখনও সেমা শ্রবণ করি। আবার কখনও কখনও নামাজ বেজামাত আদায় করে থাকি। তাই তোমার অন্য কোনো জায়গায় যাওয়া প্রয়োজন। আমি হজরত হুজ্জাতুল্লাহ নকশবন্দীর খলীফা হজরত মোহাম্মদ যোবায়ের নবীরা[১] এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি আমার হালের প্রতি অনেক মেহেরবানি করলেন। তাঁর সন্তানকে বললেন, এমন ব্যক্তি যে বাহ্যিক আদব ও বাতেনী নূর দ্বারা সুসজ্জিত, তার সাথে মোলাকাত করা অপরিহার্য। আমি তাঁর পদচুম্বন করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমাদেরই। তবে এই তরিকার শর্ত হচ্ছে সোহবত গ্রহণ। কিন্তু তোমার রাস্তা তো অনেক দূরের। প্রতিদিন আসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি হজরত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী থেকে যে নেসবত হাসিল করেছো, তা-ই সুদৃঢ়। তুমি যদি এই নেসবতের হেফাযত করতে পারো, তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর আমি হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজলের খেদমতে তাওয়াজ্জোহের দরখাস্ত করলাম। তিনি বললেন, তুমি দিব্যদৃষ্টির সাথে সুলুকের মঞ্জিলসমূহ অতিক্রম করেছো এবং তোমার বিভিন্ন মাকামের কাশফও অর্জিত হয়েছে। আমার তো কাশফ এবং মাকামসমূহের এলেম নেই। কাজেই আমার কাছ থেকে তোমার ফায়দা গ্রহণ সুন্দর হবে না।

মির্জা মাযহার বলেন, বাহ্যিকভাবে যদিও তাঁর কাছ থেকে আমার ফায়দাগ্রহণ হয়নি, তবে হাদিসের পাঠ দান কালে তাঁর বাতেনী ফয়েজ দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি এবং নেসবত প্রকাশের ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করেছি। হাজী মোহাম্মদ আফজল যখন হাদিসের দরস দিতেন তখন রসুল স. এর নেসবতের উপস্থিতি হাসিল হতো এবং নূর ও বরকত অধিক মাত্রায় প্রকাশ পেতো। যেনো আধ্যাত্মিকভাবে রসুলেপাক স. এর সোহবত হাসিল হতো। ওই সময় তাঁর তাওয়াজ্জোহ ও দৃষ্টিপাত প্রত্যক্ষগোচর হতো। কামালাতে নবুওয়াতের নেসবত, তার প্রশস্ততার চূড়ান্ত ও নূরের আধিক্য উদ্ভাসিত হতো। 'আল উলামাআউ হুম

ওয়ারছাতুল আম্বিয়া’ (আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী)[২] এই হাদিসের তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। তিনি শায়েখুল হাদিস এবং সোহবতের দিক দিয়ে আমার পীর ছিলেন। আমি তাঁর খেদমতে থেকে বিশ বছর পর্যন্ত তাঁর থেকে জাহেরী এবং বাতেনী ফায়দা হাসিল করেছি।

কুতুবে এরশাদ হজরত খাজা মোহাম্মদ যোবায়েরের ইনতেকালের পর হাজী মোহাম্মদ আফজলের খলীফা শায়েখ মোহাম্মদ আযম বলেছিলেন, কুতুবিয়াতের মর্যাদা খাজা মোহাম্মদ যোবায়ের থেকে আমার নিকট স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এরশাদের নহর যা তাঁর সীনায় জারী ছিলো, তা এখন আমার মধ্যে প্রবহমান। একথা শুনে হাজী মোহাম্মদ আফজল বলেছিলেন, এই মর্যাদা তো মির্জা জান জানানের নসীব হয়েছে। তার চেহারার দিকে লক্ষ্য করে দেখো। সে তো এ সময়ের জন্য তরিকার মাদার (ভিত্তি)। তাঁর খেদমতে তালেবগণের অধিকহারে আগমন এর দলীল। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না, তার সাথীগণ কাম্য মাকামসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হন? দৈনিকই তার ফয়েজ প্রদান ধারা উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

মির্জা মাযহার বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি হাজী মোহাম্মদ আফজলের নিকট হাজির হয়ে বললো, স্বপ্নে দেখলাম, এক বিশাল প্রান্তরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ওই অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম। রামচন্দ্রকে দেখলাম আগুনের এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন কোনো এক ব্যক্তি ওই স্বপ্নের তাবীর করলো এভাবে– হিন্দু ধর্মের দু’জন বিশেষ দেবতা কৃষ্ণ ও রামচন্দ্র তারা দু’জনেই দোজখের আযাবে জ্বলছে। আমি বললাম, এই স্বপ্নের তাবীর এছাড়া অন্য রকমও হতে পারে। কেনোনা পূর্ববর্তীগণের মধ্য থেকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর কুফুরীর ফতওয়া দেয়া জায়েয নয়, যার ব্যাপারে শরীয়ত নিরবতা অবলম্বন করেছে। কিতাবুল্লাহ ও হাদিস উভয়ই এ দু’জনের অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ। তাছাড়া এই আয়াতে করীমা ‘ওয়া ইম্‌মিন উম্মাতিন ইল্লা খলা ফীহা নাজীর’[৩] (প্রত্যেক উম্মতের জন্যই কোনো না কোনো ভয়প্রদর্শনকারী ছিলো) এর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এই কাওম (ভারত) এর জন্যও কোনো না কোনো সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ওলী বা নবী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৪]

সৃষ্টিজগত সৃষ্টিকালে রামচন্দ্রকে জিন জাতিতে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। সে সময় তাদের আয়ু হতো দীর্ঘ এবং কায়িক শক্তিও হতো অধিক। তিনি তাঁর সমসাময়িকদেরকে সুলুকের নেসবত দ্বারা তরবিয়ত প্রদান করতেন। কৃষ্ণ ছিলেন তাদের সময়ের সর্বশেষ বুজুর্গ। তাঁর মধ্যে পূর্ববর্তীদের তুলনায় কম আয়ু ও দুর্বলতা এসেছিলো। তিনি তাঁর সমসাময়িকদেরকে জযবার নেসবত দ্বারা

হেদায়েত করতেন। তিনি সঙ্গীত ও সেমা শ্রবণে অধিক অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে যে যওক শওক ছিলো, তা জযবার নেসবতের দলীল। এশক ও মহব্বতের নেসবতের উষ্ণতাকে দেখা গিয়েছে যেনো তিনি প্রান্তরে অগ্নিকুণ্ডে দাঁড়িয়ে আছেন। তা কৃষ্ণের মহব্বতে নিমজ্জিত থাকার অবস্থা জ্ঞাপক। সেজন্যই তাঁকে দেখা গিয়েছে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর রামচন্দ্র ছিলেন সুলুকের পথে। সেজন্য তাঁকে দেখা গিয়েছে অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় দণ্ডায়মান। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

হজরত হাজী সাহেব বর্ণিত তাবিরটি খুব পছন্দ করলেন এবং এতে খুব খুশি হলেন, অধম লেখক শাহ গোলাম আলী বলেন, হাজী সাহেবের জনৈক খলীফা আবু সালেহ খান একদা মথুরা গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বিশেষ কোনো প্রয়োজনে সাত টাকার খুব দরকার হলো। রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছিলেন। অকস্মাৎ দেখা গেলো হিন্দুদের বর্ণনাকৃত শ্রীকৃষ্ণের আকৃতিতে এক ব্যক্তি সেখানে আত্মপ্রকাশ করলো এবং সালাম দিয়ে তাঁকে সাতটি টাকা দিতে চাইলো। তিনি বলেন, আমি তাকে ইশারা করে বললাম, তুমি অপেক্ষা করো। নামাজ শেষ করে নেই। নামাজের পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী? সে বললো, কৃষ্ণ। আর এই সাত টাকা আপনার জন্য নজর এনেছি। আপনি আমাদের শহরে এসেছেন। তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, আমি মোহাম্মদী। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. আমার পয়গম্বর। তিনি আমার ওসিলা। আমার হাজত পুরা করার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আমি কোনো বেগানা লোকের হাদিয়া গ্রহণ করি না। কৃষ্ণ তখন ক্রন্দন করে বলতে লাগলো, নবীয়ে আখেরুজ্জামানের গুণাবলী, এখলাস এবং আপনার এত্তেবা সম্পর্কে আমি যা শুনেছিলাম, তার চেয়ে বেশী আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হাজী সাহেবের নেসবতের মাধ্যমে বর্ণবিহীন ওয়াহ্দানিয়াতের প্রকাশ ঘটতো এবং তাঁর মধ্যে লাতাফাত বা সূক্ষ্মতা এমন ছিলো যে, অনেক ওলী তা অনুভব করতে পারতেন না। একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি বললেন, আজ আমার মহফিলে হজরত খাজা যোবায়েরের সঙ্গীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলো। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে আরেকজন এসে যোগ দিলো। তারা উভয়েই মোরাকাবা করলো এবং পরস্পরে আলাপ আলোচনা করলো যে, আমার এবং তোমার বাতেনের মধ্যে নেসবত ও কাইফিয়ত প্রকাশিত। কিন্তু হজরত হাজী সাহেবের বাতেনের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেও তাঁর বিষয়ে কিছুই প্রকাশিত হলো না। আমি (মির্জা মাযহার) বললাম, হজরত! আপনি হজরত মোহাম্মদ যোবায়েরের পীর এবং হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের কাছ থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত বাতেনী নেসবত হাসিল করেছেন। তার ফলে আপনি যে নেসবত, হায়আতে উলুব্বী (উচ্চ অবস্থা) এবং সূক্ষ্মতা অর্জন

করেছেন, দুর্বল নেসবতধারী ব্যক্তিগণ সেই উচ্চ মাকামসমূহ সম্পর্কে কীভাবে অনুভব করবে? এবং তারা হাকীকতের বিষয়াদি পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছবে? এধরনের আম লোকেরা যওক-শওকের উত্তাপ অনুভব করতে পারে কিন্তু আহমদী মোজাদ্দেদিয়া খান্দানের নেসবতের কারখানায় তৈরী সুফীগণের পরিচয় সাধারণ পরিচয়ের চেয়ে ভিন্ন। কামালাতে এলাহীর বহিঃপ্রকাশ তাদের মধ্যে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে তা আকলের গণ্ডি বহির্ভূত। যেমন কোরআনে করীমে এসেছে 'অলা ইউহীতূনা বিহি ই'লমা'[৫] (তাদের এলেম তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না)। হজরত হাজী সাহেব আমার বর্ণনা শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

মির্জা মাযহার বলতেন, হজরত হাজী সাহেবের উপর ফানা ও নিস্তি প্রবল ছিলো। তাঁর একটি বিশেষত্ব ছিলো, তিনি মানুষের ভুলত্রুটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে তাদরকে মাযুর বলে গ্রহণ করতেন। এ নসিহত আমি তাঁর কাছ থেকেই হাসিল করেছি। এ ধরনের বহু উপকারী বিষয় আমি তাঁর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তথ্যপঞ্জি

১ হজরত খাজা মোহাম্মদ যোবায়ের র. ওফাত ১১৫২ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

২ ফতহুলবারী শরহে সহী বোখারী ১, ১৬০ হাদিসের মতনে 'হুম' শব্দটি নেই। আবু দাউদ এলম ১, ইবনে মাজা ভূমিকা ১৭, দায়েমী ভূমিকা ৩২, মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫, ১৯৬।

৩ আল ক্বোরআন, ফাতির ৩৫, ২৪।

৪ এখানে হজরত মাযহার রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণকে ওলী বা নবী হওয়ার ব্যাপারে কিয়াস করেছেন। বর্তমান যুগের কোনো কোনো মুহাক্কেক বিশেষ করে ডঃ মোহাম্মদ ওমর বলেছেন, হজরত মাযহারের এহেন অজ্ঞাত কিয়াস তাঁর নিজস্ব অভিমত।

৫ আল ক্বোরআন, ত্বাহা ২০, ১১০।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

হজরত হাফেজ সাদুল্লাহ থেকে ফায়দা গ্রহণ

মির্জা মাযহার র. বলেছেন, আমি জনাব হজরত হাফেজ সাদুল্লাহর কাছে তরিকার ফয়েজ হাসিল করার জন্য আবেদন পেশ করলে তিনি আমাকে এস্তেখারা করার হুকুম দিলেন। এস্তেখারা করার পর আমি উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হলাম যে, তিনি আমার কাম্য। সুতরাং তাঁর সোহবত লাভকে আমার জন্য অপরিহার্য করে নিলাম এবং তাঁর জুতা বহন করার খেদমত বেছে নিলাম। ওই খেদমতের বরকতে আমার অনেক ফায়দা হাসিল হলো। আমি আমার মধ্যে বাতেনী নূরের ক্রমোন্নতি অনুভব করতে লাগলাম। আমার নেসবত (আত্মিক সম্বন্ধ) প্রশস্ত হলো। হজরত হাফেজ সাহেবের বয়স যখন আশি বছরের বেশী হলো, তখন তিনি বার্ধ্যক্যজনিত কারণে তালেবগণের হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতে অক্ষম হলেন। তখনও তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা কালামপাক এক পারা তেলাওয়াত করতেন। ফায়দা গ্রহণকারী তালেবগণ তখন তাঁর পাশে বসে যেতেন এবং কোরআন মজীদ শ্রবণ করতেন। এভাবে আমি বারো বছর পর্যন্ত তাঁর মোবারক সোহবত থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছি এবং আমার হালের মধ্যে বেশুমার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছি। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি তাঁর মুরিদগণের হাল সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতেন। আমি যা বলতাম, তিনি তা প্রত্যয়ন করতেন। তিনি তাঁর সাথীগণের তরবিয়াতের জন্য আমাকে হুকুম দিতেন। বলতেন, তুমি ওদেরকে শরীয়ত ও তরিকতের শিক্ষা প্রদান করো।

একদা তাঁর দরবারে পুণ্যবানগণের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে হজরত খাজা মোহাম্মদ নাসেরও উপস্থিত ছিলেন। হাফেজ সাহেব তাঁর নেসবতের অবস্থা জানার জন্য তাঁর দিকে তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তখন আমি কবি হাফেজের এই শেরটি পাঠ করলামঃ

হারকিসকে দীদাহ রুয়ীতু পুশিদা চশমে মন
কারীকে কার্দ দীদাহমন বী নজর নাকার্দি

(যে তোমার চেহারা দেখলো সে যেনো আমার চক্ষু চুম্বন করলো। চক্ষু ওই কাজটি করলো যা খর্বদৃষ্টিসম্পন্ন আমি করতে পারিনি)।

হাফেজ সাহেব বললেন, তাঁর নেসবত চূড়ান্ত সূক্ষ্মতা এবং দৃঢ়তার সাথে উদ্ভাসিত। তাঁর কামালাতের নূর সূর্যের মতো অন্ধকার অপসারণকারী- যার বর্ণনা নিস্প্রয়োজন।

হজরত মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, একবার আমাদের শুভাকাংক্ষী এক আমীর দুশমনের মোকাবলোয় তার সেনাবাহিনীর হেফাজতের জন্য এবং নিজের বিজয়ের জন্য হিজবুল বাহর দোয়া পড়েছিলেন। তখন হজরত হাফেজ সাহেব

এবং পীরানে কেরামের বাতেনী সাহায্যের ওসিলায় তিনি ওই যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। তাঁর শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলো। তিনি আরও বলেছেন, হজরত হাফেজ সাহেব থেকে আমার ফায়দা গ্রহণ করার পর অনেক লোক আমার দিকে ধাবিত হয়েছিলো। অনেক আমীর ওমরা ও ধনী লোক অধিক হারে আমার খেদমতে হাজির হতে লাগলো।

নওয়াব খান ফিরোজ জঙ্গ হজরত হাফেজ সাহেবের নিকট বায়াত ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে ফয়েজ হাসিলের জন্য প্রত্যেক দিন তাঁর জিকির ও মোরাকাবার হালকায় হাজির হতেন। তাঁর খানকায় অনেক ফকীর দরবেশের আগমন হতো। দৈনিক আশিজন লোক তাঁর খানকার পাকশালার খাবার গ্রহণ করতো। মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত হাফেজ সাহেব আমীর, ওমরাগণের নিকট বিভিন্ন লোকের জন্য সুপারিশ করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি কারও কারও জন্য তিনি আমীর ওমরাগণের দরবারে তশরীফ নিয়ে যেতেন। কোনো মুরিদ হজরতের অনুমতি ছাড়া কোনো মাজার জিয়ারতের জন্য চলে গেলে তিনি খুব রাগান্বিত হতেন। তখন সে লোক তার বাতেনের নেসবতে শূন্যতা অনুভব করতো। হজরতের নিকট ওজরখাহী না করা পর্যন্ত তার নেসবত ঠিক হতো না। মির্জা মাযহার বলেছেন, আমি একদিন হজরতের নিকট আরয করলাম, এ তরিকায় উন্নতি সাধনের ভিত্তি কিসের উপর? তিনি বললেন, মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ (আত্মিক লক্ষ্য) এর উপর। তিনি কয়েক বছর পর্যন্ত আমাকে একই তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেছেন। কিন্তু আমার অন্তরে সর্বদাই অধিক উন্নতির বাসনা বিদ্যমান ছিলো। আমার দুঃসাহসিকতার কারণে একবার তিনি আমার প্রতি খাস তাওয়াজ্জোহ প্রদান করে তাসাররুদ (পরিবর্তন) আনয়ন করলেন। ফলে আমি তিন মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। অবশেষে তিনি একদিন আমাকে দেখতে এলেন। আমি সুস্থ হয়ে গেলাম এবং আমার নেসবত ঠিক হয়ে গেলো।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হাফেজ সাদুল্লাহ্ বার্ধক্যজনিত কারণে তালেবগণের হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতে পারছিলেন না। সে কারণে আমি শায়েখ হজরত আবেদ সুনামীর নিকট প্রত্যাবর্তন করি। সাথে সাথে হজরত হাফেজ সাহেবের খেদমতেও হাজির হতে থাকি। হাফেজ সাহেবের খলীফা শায়েখ সিবগাতুল্লাহ একথা তাঁকে জানালেন। তিনি মনে দুঃখ পেলেন। আমাকে ডেকে বললেন, আমার এখানকার ফয়েজ ও বরকতের কী কমতি দেখে অন্য জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলে? আমি উত্তর করলাম, আমার মকসুদ আল্লাহ্ এবং উচ্চ নেসবত ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর তা অর্জন করা উচ্চস্তরের তাওয়াজ্জোহ ব্যতীত সম্ভব নয়। আপনি তো শারীরিক দুর্বলতার কারণে তা প্রদান করতে পারছেন না। তাই আমি আপনার এক ভাইয়ের কাছে যাই। আমার এখলাস ও বন্দেগীর দৃঢ়তা আছে। কিন্তু আমার এ সব কারণ বর্ণনার পরও তাঁর মনোকষ্ট দূর হলো না। তাঁর ইনতেকালের পর আমি তাঁর মাজারে হাজির হলাম এবং সেখানে তাঁকে অসন্তুষ্টই

দেখতে পেলাম। এভাবে কয়েক বছর চলে যাওয়ার পর হজরত সিবগাতুল্লাহ আমাকে সুসংবাদ দিলেন, হজরত আমাকে স্বপ্নে বলেছেন, আমি মির্জা সাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট। কেনোনা তিনি যা করেছেন তা আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জি মোতাবেকই করেছেন। আমি তখন শোকরানা সেজদা করলাম। কেনোনা আহলে হকগণের সন্তুষ্টি আল্লাহ্‌তায়ালার মহা নেয়ামত।

এই গ্রন্থের লেখক ফকীর শাহ গোলাম আলী বলছেন, হজরত মোহাম্মদ যোবায়েরের ভক্তবৃন্দের মধ্য হতে একজন তাঁর ইনতেকালের পর হজরত শায়েখ আবেদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তখন দেখতে পান, তাঁর রূহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। এমনকি তিনি তাঁর প্রতি তরবারী উত্তোলন করেছেন। তিনি তখন হজরত শায়েখের (মির্জা মাযহারের) আশ্রয় চাইলেন। হজরত আবেদ মির্জা মাযহারকে বললেন, অসন্তুষ্টির কারণ কী? সত্য অন্বেষণের জন্য এক ব্যক্তি তাঁরই খান্দানের মধ্য হতে একজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করেছে। তাকে মাযুর মনে করা উচিত।

শায়েখ জালাল পানিপথি[১] এর আওলাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমার কাছে (শাহ গোলাম আলী) বায়াত গ্রহণ করে। স্বপ্নযোগে তিনি (শায়েখ জালাল পানিপথি) বললেন, তুমি আমার তরিকা ছেড়ে দিয়ে নকশবন্দী কেনো হলে? উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা সালেকের ভাবান্তরের বিষয়। কেনোনা দেখা যায় কোনো কোনো মোর্শেদ তাঁদের কোনো কোনো মুরিদকে অন্য বুজুর্গের নিকটেও পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হজরত মির্জা মাযহার পীরের হুকুমে আমাদের থেকে ফায়দা হাসিল করেছেন। কেউ যদি অন্য কোনো বুজুর্গ থেকে ফায়দা বেশী পায় অথবা কারও কাছ থেকে জিকির ও আমলাদী শিক্ষা করে বা শিক্ষা করার চেষ্টা করে, পীরের খেদমত ও আমল যথাযথ আদায় করার পরও যদি মকসুদ হাসিল না হয়, অথবা দূরত্বের কারণে তালেব যথাযথ ফায়দা লাভ করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার কর্তব্য হবে অন্য কোনো শায়েখের নিকট যাওয়া এবং ফয়েজে এলাহী থেকে বঞ্চিত না থাকা।

মির্জা মাযহার বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে বেহেশত দেখতে পাই। অকস্মাৎ সেখানে নবীগণের একটি দলকে দেখতে পেলাম। দেখলাম, হজরত হাফেজ সাহেব তাঁর আকাবেরগণের আগে আগে চলে যাচ্ছেন। তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম এবং অগ্রে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন হজরত নূহ বললেন, তাঁর মনিব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আগে তশরীফ নিয়ে গেছেন। তাই তিনি তাঁর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগে আগে চলে যাচ্ছেন।

তথ্যপঞ্জি

১ শায়েখ মোহাম্মদ ইবনে মাহমুদ জালালউদ্দীন মাহমুদ পানিপথির উপাধি ছিলো কাবীরুল আউলিয়া। তিনি শায়েখ শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথির খলীফা ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা ছিলো। তাঁর মশহুর খলীফাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শায়েখ আহমদ আব্দুল হক দেহলভী। হজরত মির্জা পানিপথির বংশধর।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

হজরত শায়েখ আবেদ সুনামী থেকে ফায়দা গ্রহণ

মির্জা মাযহার র. বলেছেন, তরিকতের মাকামে বেলায়েতত্রয় (বেলায়েতে সুগরা, বেলায়েতে উলিয়া, বেলায়েতে কোবরা), বিভিন্ন হাল, মারেফতের এলেম ওয়ারেদাত (এলকা, এলহাম, কাশফ) ইত্যাদি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী থেকে হাসিল হয়েছিলো। তারপর কামালতত্রয় (কামালতে নবুওয়াত, কামালতে রেসালত, কামালতে উলুল আজম) এবং সাতটি হকীকতের মাকাম সাত বছর পর্যন্ত শায়েখের কাছ থেকে হাসিল করি। তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার এক বছর পর্যন্ত মুরাদের সায়ের হিসেবে সকল মাকাম পুনরায় অতিক্রম করি। এ সায়েরে প্রত্যেক মাকামে হালসমূহে নতুন নতুন শক্তি সঞ্চয় করি। এমতাবস্থায় আমি মোজাদ্দেদিয়া আলীয়া মাকামসমূহে যে কাইফিয়ত (অবস্থা) এর আলোচনা করা হয়েছে- তা অর্জন করি। তিনি আরও বলেছেন, তওহীদের ওয়ারেদাত (কাশফ, এলহাম) এর প্রকাশ থেকে যওক-শওক (আত্মিক প্রেরণা-আস্বাদন) অর্জিত হওয়া বেলায়েতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এই মাকামসমূহে সমস্ত হাল ও প্রাপ্তি দূর হয়ে গেলো এবং এশ্ক মহব্বতের জোশ প্রেরণা যা সিফতের তাজাল্লীসমূহের চাহিদা তা জাতী তাজাল্লীতে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। এই মাকামে এসে নিঃস্বতা ও দাসত্ব ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না। আইন (মূল সত্তা) এর সাথে নেসবত এবং প্রতিবিম্বের সাথে এত্তেহাদ (এক হওয়া) এর সূত্র যা দুনিয়াকে তার স্রষ্টার সাথে মিলিত বলে সাব্যস্ত করে, হজরতের চূড়ান্ত পবিত্রতার সংস্পর্শে সে হাল অতিক্রম করা সম্ভব হলো। এ সব কিছুই মত্ততার প্রাবল্যের কারণে হয়ে থাকে। এই স্তরে এসে নেসবত (আত্মিক সম্বন্ধ) ছাড়া বন্দেগীর মাকাম হাসিল হয় না। 'মালত্ তুরাবি ওয়া রব্বিল আরবাব' (মাটির সাথে মহাধিপতির সম্বন্ধ কোথায়)?

এই মাকামের (তওহীদ) হাকীকত ও মারেফত প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আকায়েদ, শরীয়ত ও আহকামের সাথে সম্পৃক্ত। এই মাকামে বিশ্বাস, প্রকারবিহীন মিলন, বর্ণবিহীন অবস্থা এবং নেসবতের সূক্ষ্মতা তাৎক্ষণিকভাবে অপরিহার্য। এ সম্পর্কে ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. তাঁর মকতুবাত শরীফে বলেছেন, এই তরিকার মাকামসমূহের বিভিন্ন স্তরে অবস্থা ও বর্ণবিহীনতা অর্জিত হয় এবং

নিম্নতর মাকামসমূহে ফয়েজ যা বড় বড় বৃষ্টির ফোটার মতো ছিলো, তা এই মাকামে এসে ছোটো ও সূক্ষ্ম হয়ে শিশির বিন্দুসম হয়ে যায়।

হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর তাওয়াজ্জোহের বরকত ছিলো বর্ণ বিহীন। তাই তা অনুভূতিতে ধরা পড়তো খুব কম। বরং হালের শেষের দিকে তাঁর সোহবতের মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের পরিশুদ্ধি হাসিল হলো এবং কোনো প্রকারের যওক (স্বাদ) ও কাইফিয়ত (অবস্থা) অবশিষ্ট রইলো না। কাইফিয়ত দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণ সম্পর্কে হজরতকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। কেনোনা এই মাকামে এলাহীর ফয়েজের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জারী থাকে, যদিও তা বর্ণবিহীন হওয়ার কারণে অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। ব্যাপারটি এরকম— যেমন কোনো একটি হাউজ প্রণালী পর্যন্ত পানিতে পরিপূর্ণ। হাউজটি যতোক্ষণ খালি থাকে ততোক্ষণ তাতে পানি পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। হাউজটি যখন প্রণালী পর্যন্ত পানিতে ভরপুর হয়ে যায়, তখন আর তাতে পানি পড়ার শব্দ পাওয়া যায় না।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীর তাওয়াজ্জোহে আমার বাতেনী নেসবতের মধ্যে এরূপ প্রশস্ততা এলো, যা কাশফের নজরে অনুভব করাও সম্ভব ছিলো না এবং তরিকার মাকামসমূহের সুলুক এমন শক্তিশালীভাবে হচ্ছিলো, যা প্রকাশ করা আত্মগৌরবের নামান্তর হবে। তিনি আরও বলেন, হজরত শায়েখ আমার হালের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অন্য কারও এমন বিশেষত্ব অর্জিত হয়নি। তিনি আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত কামালিয়তের অন্তর্ভুক্ত করে ধন্য করেছিলেন। আমাকে তাঁর ফয়েজ বরকতে শরীক করে নিয়ে একদিন আমাকে বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা গত রাতে আমার উপর নতুন কামালাত ও তাজা ফয়েজ দান করেছেন, যা পূর্বের সমস্ত আত্মিক পূর্ণতা ও আত্মিক প্রাপ্তির উপর অগ্রগণ্য। আমি বললাম, রাত তখনও বাকি ছিলো- আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত ফযীলত যা আপনার বাতেনে অর্জিত হয়েছিলো— ওসিলা, ঐক্য ও মহব্বতের কারণে আমি তখন আমার নিজের মধ্যে বিস্ময়কর হাল অনুভব করেছিলাম। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছো। তোমাকে আমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুদরতের সমস্ত দান ও মর্যাদা যা আমাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে তোমাকেও এক বিরাট ও পূর্ণ হিস্সা প্রদান করা হয়েছে।

মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালা হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীকে বিশেষ কতকগুলি সম্মান দান করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'বৃহতের অন্তর্ভূক্তি' যা একটি উচ্চতর মাকাম, এটি হজরত আবু বকর সিদ্দীকের

জন্য বিশিষ্ট ছিলো। এ ক্ষেত্রে এই হাদিসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রসুলেপাক স. বলেছেন, 'মা সাববাল্লহু ফী সাদরী শাইয়ান ইল্লা সবাবতুহু ফী সাদরী আবী বাক্‌রিন'[১] (আল্লাহ্‌তায়ালা যা কিছু আমার সীনায় ঢেলে দিয়েছেন, তা আমি আবু বকরের সীনায় ঢেলে দিয়েছি)। দ্বিতীয়, যে কোনো ব্যক্তিকে হজরতের কবরের আশ-পাশে দাফন করা হবে, যতটুকু পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি কাজ করবে, তাকে মাফ করে দেয়া হবে। তৃতীয়, যে হজরতকে দেখেছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। চতুর্থ, তিনি যাকে সায়ের সুলুক করাবেন, তাকে মুরাদ বানিয়ে দেয়া হবে। পঞ্চম, একদিন এলহাম হলো— এই মুহূর্তে এই হালকায় তাজাল্লিয়ে জাতীর ফয়েজ জারী হচ্ছে। আমি (মির্জা মাযহার) বললাম, আলহামদু লিল্লাহ! এই ফকীরও হালকাতে হাজির রয়েছে। তিনি বললেন, তোমার সায়ের সুলুককেও মুরাদে সায়ের সুলুক করা হয়েছে। তোমার হালকাতেও তাজাল্লীয়ে জাতীর ফয়েজ জারী থাকবে। এই মহান দানের শোকরিয়া আদায় করা উচিত।

তিনি আরও বলেছেন, একদিন আমি কাদেরিয়া খান্দানের এজাযত কামনা করেছিলাম। তিনি বললেন, আমি তোমার জন্য এই খান্দানের এজাযত জনাব রসুলুল্লাহ স. এর কাছ থেকে দিতে চাই। তিনি জনাব রসুল করীম স. এর প্রতি তাওয়াজ্জোহ হয়ে বসলেন। আমি তাঁর হুকুম মোতাবেক মোরাকাবায় বসে গেলাম। দেখতে পেলাম, হাবীবে আল্লাহ্‌ স. আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তাঁর বড় বড় সাহাবী ও আওলিয়া কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। গাউছুছ্‌ছাকালাইন আবদুল কাদের জিলানী র. রসুলেপাক স.এর সামনে দণ্ডায়মান। হজরত শায়েখ আবেদ সুনামী রসুলেপাক স. এর খেদমতে নিবেদন করলেন, মির্জা জান জানান কাদেরিয়া খান্দানের এজাযত প্রার্থী। রসুলেপাক স. বললেন, এ বিষয়ে আবদুল কাদের জিলানীর প্রতি রুজু করো। অতঃপর তিনি হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীর নিবেদন কবুল করে বান্দাকে বরকতের খেরকা প্রদান করেন এবং আমাকে এজাযত দেন। তখন আমার বাতেনে কাদেরিয়া তরিকার নেসবতের হাল ও বরকত অনুভব করলাম এবং আমার সীনা তাঁর কাদেরিয়া তরিকার নূর দ্বারা উদ্ভাসিত হলো। নকশবন্দিয়া তরিকায় আত্মহারা ও আসক্তির হাল অধিক মাত্রায় থাকে। আর কাদেরিয়া তরিকায় উজ্জ্বলতা ও নূরের চাকচিক্যের হাল হয়ে থাকে।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত শায়েখ আমাকে কাদেরিয়া, চিশতিয়া এবং সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার এজাযত দিয়েছিলেন। খাজা কুতুবুদ্দীন র. এর

নেসবতের মাধ্যমে আমি চিশতিয়া তরিকার নেসবত পেয়েছিলাম। তিনি আরও বলেছেন, চিশতিয়া খান্দানের সমসাময়িক কোনো কোনো বুজুর্গের মধ্যে যখন চিশতিয়া তরিকার নেসবত প্রকাশ পেতো, তখন সেমা তাদের কাছে ভালো লাগতো। এশক ও মহব্বতের জ্বালা, যা এই তরিকার বৈশিষ্ট্য, তা আমার বাতেনের রঙে গালেব হয়ে যেতো। এক রাতে এই কিতাবের লেখক শাহ্ গোলাম আলী এশার নামাজের পর মির্জা মাযহারের খেদমতে হাজির ছিলাম। নির্জন মুহূর্ত। হালের এক চূড়ান্ত মুহূর্তে তিনি গুনগুন করছিলেন এবং তার সাথে সাথে সীমাহীন কান্নাও জড়িত ছিলো। এই হাল যখন শেষ হলো, তখন তিনি বললেন, চিশতিয়া তরিকার বুজুর্গানের আত্মপ্রকাশ হয়েছিলো।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত হাফেজ সাদুল্লাহর ওফাতের পর নওয়াব খান ফিরোজ জঙ্গ হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীর খেদমতে হাজির হয়ে ফায়দা গ্রহণ করতে চাইলেন। তখন এই বান্দা (মির্জা মাযহার) হজরতের খেদমতে এ বিষয়ে আরয করলাম। তিনি দুঃখ করে বললেন, তুমি কী চাও যে আমাদের এই খানকা হজরত হাফেজ সাদুল্লাহর খানকার মতো বরকতহীন হয়ে যাক? দুনিয়াদারদের কদম নহুসত (দোষ) যুক্ত। বাতেনের জন্য তা বরকতহীনতার কারণ হয়। তিনি আরও বলেছেন, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, ওমুক ব্যক্তি দুনিয়াদার। বড় দৌলতের অধিকারী। একথা শুনে তিনি বললেন, আসলে সে অভাবী। কেনোনা দৌলত ও নেয়ামত কেবল আল্লাহ্র সঙ্গে নেসবতধারী ব্যক্তিদেরই হাসিল হয়ে থাকে। হাদিস শরীফে আছে- 'আল গিনাউ গিনাআন্ নাফসি' (প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে নফসের অমুখাপেক্ষিতা)।

তথ্যপঞ্জি

১ আশআতুল্‌লুমআত, তরজমা মেশকাত। কৃত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী। মুদ্রণ পাকিস্তান।

২ মুসলিম, বাবে ফজলে কেনাআত, বোখারী, রেকাব অনুচ্ছেদ, তিরমিযী যোহদ অনুচ্ছেদ।

নবম অনুচ্ছেদ

সমকালীন বুজুর্গগণের নিকট মির্জা মাযহারের উচ্চ মর্যাদার বিষয়

মির্জা মাযহার বলেছেন, আমি ফার্সী কায়দা ও অন্যান্য পুস্তিকা পড়েছি আমার পিতার কাছ থেকে। কালামুল্লাহ শরীফ, এলমে তাজভীদ ও এলমে ক্বেরাতের শিক্ষা ও সনদ নিয়েছি ক্বারী আব্দুর রসুলের কাছ থেকে। প্রচলিত দীনী এলেম হাসিল করি সমসাময়িক উলামায়ে কেরাম থেকে। পিতা মহোদয়ের ওফাতের পর হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল থেকে এলমে দীনের কতিপয় কিতাব বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করি। এলমে হাদিস ও তাফসীরের সনদও তাঁর নিকট থেকেই গ্রহণ করি। এলেম শিক্ষা দেয়ার পর হজরত হাজী সাহেব আমাকে তাঁর কেলাহ্ (এক প্রকারের টুপী) মোবারক বরকত স্বরূপ দান করেন, যা তিনি পনেরো বছর পর্যন্ত পাগড়ির নিচে পরিধান করেছিলেন। রাতে সেই কেলাহ্ মোবারক গরম পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখলাম। তার পানি যখন কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করলো, তখন আমি সেই পানি পান করলাম। যার বরকতে আমার অনুধাবন শক্তি হলো অধিকতর তীক্ষ্ণ। কোনো জটিল ও কঠিন কিতাব আমার নিকট আর কঠিন রইলো না। তার পর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তালেবে এলেমদেরকে জাহেরী এলেমের পাঠ দিতে থাকি। বাতেনী এলেমের নেসবত যখন প্রবল হয়, তখন কিতাবের শোগল ছেড়ে দেই।

মির্জা মাযহার বলেছেন, আমি একদিন স্বপ্নে দেখি, কেউ আমাকে অদৃশ্য থেকে ডেকে বলছে, তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। খালকের হেদায়েত এবং তরিকার প্রচার প্রসারের সঙ্গে তোমার অস্তিত্ব জড়িত। সেজন্য মানুষকে ফায়দা প্রদানের সময় আমি আমার মধ্যে বাতেনী নেসবতের নূর সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতাম। তখন আমার মনে হতো গায়েব থেকে যেনো আমাকে শক্তি প্রদান করা হচ্ছে।

মির্জা মাযহার র. বলেছেন, ফকীর (মির্জা মাযহার), ইব্রাহীমি মাশরাবের অন্তর্ভূত। শায়েখ তাকে বাতেনী তাসাররুফ (ক্ষমতাপ্রয়োগ) এর মাধ্যমে মোহাম্মদী মাশরাব বানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, যখন শায়েখ আমাকে হাকীকতে মোহাম্মদীর সুসংবাদ দিলেন এবং উক্ত মাকামের নূরে আমার ফানা হাসিল হলো, তখন আমি দেখলাম, সরওয়ারে আলম স. আমার সামনাসামনি তশরীফ নিয়ে এসেছেন। তারপর দেখি তিনি আমার জায়গায় তশরীফ রেখেছেন। অতঃপর

দেখি আমি রসুলেপাক স. এর বসার স্থানে বসে আছি। তারপর দেখি দু'জায়গাতেই তিনি বসে আছেন। অতঃপর দেখি উক্ত দু'জায়গাতেই আমি বসে আছি। এই যে ফানা ও বাকা রসুলেপাক স. থেকে হাসিল হয়েছিলো, তা হজরত মাযহারের উচ্চ মর্যাদাই প্রমাণ করে। তিনি আরও বলেছেন, একদিন আমি শায়েখের খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি আমার সম্পর্কে বলতে লাগলেন, দু'টি সূর্য পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বের হয়েছে। সূর্যদ্বয়ের আলোর তীব্রতা এতোই অধিক যে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা তালেবে মাওলাগণের তরবিয়তের দিকে মনোনিবেশ করলে এই দুনিয়াকে আলোকিত করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন, একদিন শায়েখ অতি বিনয়বশতঃ আমার জানুতে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমার সাথীগণের মধ্যে তাঁর মতো আর কেউ নেই। একদিন হজরত শায়েখ বলতে লাগলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল স. এর প্রতি তোমার সীমাহীন ভালোবাসার কারণে তরিকার প্রচলন তোমার দ্বারা সম্ভব হবে। আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ লকব (উপাধি) দান করেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, হজরত শায়েখ তাঁর কতিপয় তরবিয়তের সাথীকে আমার হাওলা করে দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে তরিকার মাকামসমূহের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে হজরতের খেদমতে তাদেরকে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমার কাছ থেকে তারা মাকামসমূহের সঠিক হাল ও কাইফিয়ত অর্জন করেছে। তরিকার ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুবাত অনুসারেই হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, এই বান্দার উপর আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে মাশায়েখে কেরাম, বিশেষ করে হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী এবং হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীর প্রতি মহব্বতের দৃঢ়তা দান করেছেন। যদিও রসুলুল্লাহ স. এর রওজা শরীফের জিয়ারত আমার সৌভাগ্য হয়নি, তবু অনেক শুকরিয়া যে, তাঁর প্রতিনিধিগণের সোহবত লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো এবং সেই ওসিলায় আমার জীবন হয়েছে অর্থবহ। ওই সকল বুজুর্গ এই অধমকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন, যা এই বান্দার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী।

একদিন হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী অত্যধিক বিনয়বশতঃ আমার জুতা সোজা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তোমার পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা আছে। হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজল আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, আমি তোমার নেসবতের তাজীম করি। তারপর বলেছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার মতো নেসবতধারীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে

দিন। হজরত হাফেজ সাদুল্লাহ্ আমাকে খুব সম্মান করতেন এবং বলতেন, তোমাকে আমি আমার মোর্শেদের স্থলে খেয়াল করি।

মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, একদা এক সাহেবজাদা (মীর আসাদুল্লাহ) সেরহিন্দ শরীফ যাচ্ছিলো। আমি তাকে বললাম, হজরত মোজাদ্দেদের নিকট আমার সালাম পৌঁছে দিয়ো। সেরহিন্দ শরীফ থেকে ফিরে এসে সে আমাকে বললো, মাজার শরীফে পৌঁছে যখন আপনার সালাম পেশ করলাম, তখন দেখি হজরত মোজাদ্দেদ তাঁর পবিত্র মস্তক বুক পর্যন্ত মাজার শরীফ থেকে বের করে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মির্জা? কে আমার এশকে দেওয়ানা? তোমার ও তার উপর সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সাহেবজাদা বললো, এর আগে কখনো হজরত মোজাদ্দেদের জিয়ারত লাভ আমার সৌভাগ্য হয়নি। তবে আপনার ওসিলায় এই সৌভাগ্য আমার হাসিল হয়েছে। তারপর থেকে উক্ত সাহেবজাদা আমার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক তাজীম প্রকাশ করতে লাগলো। বললো, আপনি আমার শ্রদ্ধেয় দাদাজানের নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করেছেন।

হজরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী র. বলতেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে সহী কাশফের নেয়ামত দান করেছেন। নিখিল বিশ্বের কোনো কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। সবকিছু হাতের রেখাসমূহের মতো আমার নিকট সুস্পষ্ট। তবে এ সময় হজরত মির্জা মাযহার জান জানানের মতো ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর কোনো অঞ্চল বা শহরে নেই। সুলুকের মাকামসমূহ কেউ যদি অর্জন করতে চায়, তাহলে তার মির্জা মাযহার জানে জানানের খেদমতে যাওয়া উচিত।[১] তাঁর এই নির্দেশানুসারে তাঁর সাথীদের অনেকেই ফায়দা গ্রহণার্থে মির্জা সাহেবের খেদমতে রুজু করতেন। তিনি তাঁর পত্রে মির্জা সাহেবের নিকট এরকম সম্বোধন করতেন[২] আল্লাহ্তায়ালা এই তরিকায়ে আহমদিয়া মোজাদ্দেদিয়া এবং দায়ীয়ে সুনানে নববিয়া (নবীজীর সুন্নতের প্রতি আহবানকারী)কে মুসলমানদের উপকারার্থে দীর্ঘদিন পর্যন্ত জীবিত রাখুন। আল্লাহ্তায়ালা সুফীগণের তরিকাকে বিশেষ করে তরিকায়ে আহমদিয়াকে যে তাজাল্লী ও ফযীলত দান করেছেন, তা যেনো দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিরাপদ রেখে মানুষের জন্য সর্বপ্রকারের বরকত নাযিল করেন। আমীন।

হাজি মোহাম্মদ ফাখের[৩] এলমে হাদিসের একজন আকাবের আলেম ছিলেন। তিনি বলতেন, মির্জা সাহেব মোস্তফা স. এর অনুসরণে আজীম শানের অধিকারী ছিলেন। আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম একটি ইরাকী ঘোড়া পরিপূর্ণ সজ্জিত

অবস্থায় রসুলুল্লাহ স. এর দরজায় দণ্ডায়মান। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ঘোড়া কার? কে যেনো বললো, রসুলুল্লাহ স. এর। আমি ভিতর থেকে বাইরে এলাম। আবার কে যেনো বললো, এ ঘোড়া মির্জা জান জানানের। আমি স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করলাম এভাবে– হজরত মির্জা মাযহার রসুলুল্লাহ স. এর সুন্নতের অনুসরণে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের পাথেয় সঞ্চয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপের অধিকারী।

মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলী একদা স্বপ্নে রসুলুল্লাহ স. এর নিকট জানতে চাইলেন, আমার পীর মোর্শেদ মির্জা সাহেবের তরিকার প্রচলন এবং তার প্রচার শরীয়তের বিধানে গ্রহণযোগ্য এবং প্রশংসিত কি না? রসুলেপাক স. বললেন, হাঁ। সিদ্দীকে আকবরও তা সমর্থন করেন। হজরত মোহাম্মদ আফজলের খলীফা শায়েখ মোহাম্মদ আজম বলেছেন, হজরত মির্জা সাহেবের বিষয়ে আমার কাছে এলহাম হয়েছে। 'হাজা রজুলুন লাহু শানুন আজীমুন। ওয়ালা ইউক্বাস আলাইহি রজুলুন আখা' (তিনি একজন আজীমুশশান ব্যক্তি, তাঁর বুজুর্গীর সমকক্ষ আর কেউ নেই)। হজরত খাজা মীর ওরাদ বলেছেন, আমি হজরত মির্জা সাহেবের সঙ্গীগণের মধ্য থেকে যাকেই দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই আপন প্রিয় বুজুর্গের নেসবত প্রাপ্তিতে ধন্য। তবে তাঁদের মর্যাদা, হাল ও মাকাম ভিন্ন ভিন্ন। হজরত শায়েখ আব্দুল আজল যোবায়রী র. বলেছেন, মির্জা মাযহারের সময়ে তাঁর দরবারে তালেবে মাওলাগণের সমাগম এতো বেশী হতো, যা অন্য কোনো স্থানে হতো না। ওই সময় তিনি হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর নায়েব ছিলেন।

তথ্যপঞ্জি

১ নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী ' আনফাসুল আকাবের', লখনৌ ছাপা ১২৯১ হিজরী পৃষ্ঠা ২৪।

২ শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী, 'মকতুবাতে মাশমুলা কালেমাতে তাইয়্যেবাত'। মকতুব নং ৩, পৃষ্ঠা ১৫৯।

৩ শায়েখ মোহাম্মদ ফাখের-যাঁর উপাধি ছিলো যায়েরে এলাহাবাদী। তিনি মুত্তাকী আলেম, মোহাদ্দেছ এবং শায়েখ মোহাম্মদ আফজল এলাহাবাদীর মুরিদ ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে 'দুর্‌রাতুত্ তাহ্কীক' 'কুররাতুলআইন ফী এছবাতে রফয়িল ইয়াদাইন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দশম অনুচ্ছেদ

হজরত মির্জা মাযহারের সোহব্বতের তাছীর এবং তাঁর উন্নত তাওয়াজ্জোহের বর্ণনা

হজরত মির্জা মাযহার র. এর মজলিশ আল্লাহ্‌র নূরে বেষ্টিত এবং হজরত মোস্তফা স. এর ফয়েজ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। সেখানে নকশবন্দী নেসবতের উপস্থিতি ও এস্তেগরাক (নিমজ্জন) ছিলো। যে কারণে অন্তর্জগত আপনাআপনি আসক্ত হয়ে যেতো এবং কাদেরিয়া তরিকার হালের জৌলুস ও পরিচ্ছন্নতা তাঁর পবিত্র মহফিলে প্রকাশ পেতো। চিশতিয়া তরিকার নেসবতের যওক শওক (আস্বাদ ও প্রেরণা) ওই সু-উন্নত মহফিলকে আল্লাহ্‌প্রেমে উন্নততর করে দিতো। এই নতুন আহমদিয়া (মোজাদ্দেদিয়া) তরিকার সূক্ষ্মতা ও বর্ণবিহীনতা ওই পবিত্র মজলিশকে আরও সজীবতা ও পরিচ্ছন্নতা দান করেছিলো। তাঁর নিরবতা এবং মোরাকাবা গায়রুল্লাহর নকশাকে অন্তর্জগত থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতো। তিনি যে কথাবার্তা বলতেন তার বিষয়বস্তু ছিলো শরীয়ত, তরিকত এবং বাতেনী কাইফিয়তের বর্ণনা। তাছাড়া তাঁর হাদিস ও তাফসীরের আলোচনা অন্তরের মধ্যে পবিত্রতা এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি করতো। তাঁর আলোচনায় তাজাল্লিয়ে জাতীর নেসবতের প্রতিবিম্ব পাওয়া যেতো। তাঁর রচনা এবং কবিতা আত্মিক প্রেরণা দান করে। কেনোনা তাঁর রচনা ও কবিতায় যা আলোচনা করা হয়েছে তা সবই আত্মিক প্রেরণা ও হালের রহস্য সম্পর্কিত। তাঁর মহব্বতের আলোচনা বাতেন জগতকে পরিবর্তন করে প্রেরণার সৃষ্টি করে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত করে। যা শুনলে শীতল অন্তর উষ্ণ হয়। বলাবাহুল্য যে, সালেহ্ ব্যক্তিগণের জীবন কাহিনী মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌প্রেমের হাল সৃষ্টি করে। মির্জা মাযহার বিভিন্ন বিষয়ে এলমী মাসলা মাসায়েলের বিস্তারিত আলোচনা করে লোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। তিনি নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার সুফীগণের হাকীকত ও মারেফতের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতেন এবং মারেফতের রহস্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে শ্রোতাদেরকে জ্ঞান দান করতেন। তিনি সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করতে পারতেন এবং কঠিন জটিলতার নিরসন করে দিতেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে সমস্ত আল্লাহ্‌প্রদত্ত গুণাবলী সন্নিবেশিত হয়েছিলো, তার কারণে দুনিয়াতে তিনি অনুসরণীয় হয়েছিলেন এবং তাঁর চারজন মাশায়েখের ওফাতের পর তাঁদের

প্রিয়ভাজনদেরকে খেলাফত প্রদানের যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। এই উচ্চ তরিকার প্রচার প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের কারণে হয়েছিলো। বিভিন্ন দিক থেকে তালেবে মাওলাগণ তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিলো। হজরত শায়েখ আবেদ সুনামীর বড় বড় সাথী এবং সে সময়ের মাশায়েখগণের থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হজরত মাযহার র. থেকে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেছিলেন। আলেম উলামা ও নেককার লোকগণ ফয়েজে এলাহী অর্জনের জন্য তাঁর খানকায় সমবেত হতেন। তাঁর কামালিয়াত সম্পর্কে সারা দুনিয়ায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর তাওয়াজ্জোহের তাছীরে মানুষের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হতো এবং পূর্ণ নিমজ্জনের মাধ্যমে মানুষ আত্মহারা হয়ে পড়তো। আল্লাহ্প্রেমের উষ্ণতা মানুষকে সুলুকের পথ প্রদর্শন করতো। এভাবে মহব্বতের জযবায় সালেকগণের মাকামসমূহ অতিক্রম হতো। জীবনের শেষ দিকে তাঁর বাতেন জগতে সূক্ষ্মতা এবং বর্ণবিহীনতার হাল বৃদ্ধি পেয়েছিলো। ফলে ফয়েজপ্রাপ্তগণ আপন আপন বাতেন জগতে স্থিতিশীলতা এবং প্রশান্তি লাভ করে নৈকট্যের স্তর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেছিলো। তারা তরিকতের রহস্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারতো। তাদের কারও কারও কাছে আলমে মেছাল সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। কারও কারও সম্পর্ক ছিলো আলমে আরওয়াহ এর সাথে। কেউ কেউ কাশফে কওনী (জগতবিষয়ক কাশফ), কেউ কেউ কাশফে কুবুর এবং কেউ ইশরাফে খাওয়াতিরের (অন্তরে উদয় হওয়ার) যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কেউ কেউ নূরের মোশাহাদায় (দর্শনে) নিমজ্জিত থাকতেন। কারও কারও নিকট তওহীদ ও মারেফতের রহস্য উদ্ভাসিত হয়েছিলো। কারও কারও নিকটে এ সকল বিষয়ের নেসবত ছিলো। তাঁদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যাঁরা আপন আপন মাকাম অতিক্রমকালে তরিকায়ে আহমদিয়ায় (মোজাদ্দেদিয়ায়) যা প্রচলিত আছে, সে সব বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারতেন এবং প্রত্যেক মাকামের এলেম, মারেফত, হাল ও প্রাপ্তির বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।

তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণকারীদের অধিকাংশ ব্যক্তি তরিকতের মাকামসমূহের বিষয়ে অবশ্য কাশফধারী ছিলেন না। তবে সকল ফায়দাগ্রহণকারী সকল মাকামের হাল, কাইফিয়ত ও প্রাপ্তিসমূহ আপন আপন বাতেন জগতে তৃপ্তির সাথে অনুভব করতে পারতেন এবং ফানা ও বাকা লাভে ধন্য হতেন। হকতায়ালার মোশাহাদায় (আত্মিক দর্শনে) তাঁদের নিমজ্জন হাসিল হতো। তিনি তাদের বাতেন জগতের নেসবতে প্রশস্ততা এবং বাতেনের স্থিতিশীলতায় উন্নতি সাধন করতেন।

মন-মস্তিষ্ক থেকে কল্পনা দূরীকরণে উন্নতি সাধন করতেন। তাঁর মুরিদগণের প্রাথমিক অবস্থায়ই তাসফিয়া (আত্মিক পরিচ্ছন্নতা) এবং তাযকিয়া (আত্মিক পবিত্রতা) অর্জিত হতো। ইবাদতে স্বাদ পেতেন এবং বেদাত ও গোনাহ্‌র প্রতি তাঁদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হতো। জাহের ও বাতেনের আদব এবং তাঁর সোহবতের নূর ও বরকতে সালেকগণের মধ্যে নফসের যে পরিশীলন অর্জিত হতো, তা প্রাচীন বুজুর্গগণের সালেকদের মধ্যেই সম্ভবতঃ বিদ্যমান ছিলো।

ওই সময়ের মাশায়েখে কেরাম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, মির্জা মাযহারের শুধুমাত্র সোহবতের ফলে তালেবগণের যে ফয়েজ হাসিল হতো, তা অন্যান্য মাশায়েখের তাওয়াজ্জোহের হিম্মতের দ্বারাও হাসিল হতো না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি একবার তাঁর খেদমতে হাজির হলো। লোকটি হজরত খাজা মীর দরদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। সেখানে পৌঁছার পর তিনি তাকে বললেন, তুমি তো মির্জা মাযহারের তরিকা গ্রহণ করেছো। ওই তরিকার নেসবতের নূর তোমার অন্তর্জগতে রয়েছে। লোকটি বললো, না। আমি তো কেবল তাঁর দরবারে হাজির হয়েছিলাম।

আহেন কেবপারেছ আশে না শোদ
ফিল ফওর ব সুরতে তালা শোদ

(পরশ পাথরের সঙ্গে যখন লোহার মহব্বত হয়, তখন সে লোহা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়)।

তাঁর এক খাদেম তাঁর জিকিরের হালকায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হজরত আবেদ সুনামীর দরবারে হাজির ছিলেন। খাজা আবেদ সুনামী তাকে বললেন, মির্জা সাহেবের সোহবতের নূর ও তার প্রতিক্রিয়া তোমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তুমি আল্লাহ্‌পাকের শুকরিয়া আদায় করো। আল্লাহ্‌তায়ালা মির্জা মাযহার সাহেবকে বাতেনী নেসবত প্রদানের উপর পূর্ণ শক্তি প্রদান করেছেন।

দূর দূরান্তের সালেকগণ তাঁর গায়েবী তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে উন্নতি করতো। তাঁর দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে রকম হাল পেতেন, দূর দূরান্তের তালেবগণও ওইরূপ হাল পেতেন। হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের মুরিদ শাহ্ ভেক কাবুলে অবস্থান করতেন। তিনি দিল্লী থেকে মির্জা সাহেবের গায়েবী তাওয়াজ্জোহ্ পেয়ে তরিকতের উচ্চ মাকামে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে তাঁর অন্যান্য প্রিয়ভাজনগণও আপন আপন মকসুদ হাসিলে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি আমভাবে সালেকদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে যারা হালের পূর্ণতা পর্যন্ত

পৌঁছেনি, তাদেরকে নিম্নতর মাকাম থেকে উচ্চতর মাকামে মিলিত করে দিতেন। ওই মাকামসমূহের হালত কাইফিয়ত তাদের মধ্যে এলক্বা (নিক্ষেপ) করতেন। সালেকগণ যেনো প্রতিটি মাকামের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অধিক মাত্রায় জিকির ও মোরাকাবার মাধ্যমে সফলতায় পৌঁছতে পারে এবং উচ্চ মাকামসমূহের নূর ও বরকত লাভ করতে পারে। তাঁর খলীফা খাজা মোহাম্মদ এহসান জযবার মাকামে অসহ্য হয়ে জিকিরের হালকার শৃঙ্খলা এবং প্রশান্তির মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তখন তাঁকে উচ্চতর মাকামে নিয়ে গেলেন, যা ছিলো বাতেনী প্রশান্তি ও স্থিরতার মাকাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে গেলো এবং বাতেন জগত শান্তিময় হয়ে গেলো। তখন তাঁর বাতেন জগতে অন্য পথে হাল আগমন শুরু হলো।

তিনি সব সময় তাঁর উচ্চ হিম্মতের মাধ্যমে এই চেষ্টাই করতেন, যেনো তরিকায়ে আহমদিয়া (নকশ্‌বন্দিয়া) জগতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায় এবং নতুন নেসবত যা মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বৈশিষ্ট্য, তার দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উচ্চতর তাওয়াজ্জোহের ওসিলায় অধিকাংশ সালেকের হাল ও মাকাম হাসিল হতো এবং তাঁরা প্রাপ্ত অর্জন, মারেফত ও হাল অতিক্রম করে উচ্চতর মাকামে উন্নতি লাভ করতেন। হজরতের প্রতি তালেবগণের যে পরিমাণ এখলাস থাকতো, সেই পরিমাণে তারা হাবিবে খোদা স. এর মহব্বত পেতেন এবং জিয়ারত লাভ করতে সক্ষম হতেন। এই এখলাস ও মহব্বতের কারণেই তাঁরা জযবা ও এস্তেফা (মনোনয়ন) এর মাকামে উন্নতি লাভ করতেন। হাজার হাজার লোক তাঁর কাছ থেকে তরিকার তালীম গ্রহণ করে অবিরত আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল হয়েছিলেন। প্রায় দুইশত লোক তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পেয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শুধুমাত্র আম্বালা শহরে পঞ্চাশজন আহমদিয়া (মোজাদ্দেদিয়া) তরিকার মাকামসমূহের চূড়ান্তে পৌঁছে তরিকতের জগতে অনুসরণীয় হয়েছিলেন। এই তরিকায় দাওয়াম ও হুযুর, ফানায়ে কলব, চরিত্র সংশোধন এবং সুন্নতের এত্তেবা ছাড়া তরিকতের এজাযত পাওয়া যায় না। এটা হচ্ছে এজাযতের মাকামের নিম্নতম স্তর। এর মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছে লতীফায়ে নফসের ফানা, সালেকের আমিত্ব বিসর্জন এবং নেসবতের নূরের প্রবাহ সৃষ্টি হওয়া। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে লতীফায়ে কলব ও নফসের ফানা ও বাকা লাভের পর আলমে খালকের লতীফাসমূহ মার্জিত করণ। এ স্তরে এসবের তৃষ্ণা প্রশান্ত হয়, বাতেন জগতে পরিপূর্ণ স্তরের প্রশন্তি সৃষ্টি হয় এবং মোস্তফা স. কর্তৃক আনিত বিধানের কাছে প্রবৃত্তির বাসনা অবদমিত হয়। বর্ণিত স্তরগুলোর কোনো

একটি অর্জন ব্যতীত যদি কাউকে এজাযত দেয়া হয়, তাহলে এজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তি গরুরে (আত্মগৌরবে) নিপতিত হবে এবং ফায়দা গ্রহণকারীগণ বঞ্চিত হবে। নাউযুবিল্লাহ!

তাঁর খলীফাবৃন্দ বিভিন্ন শহরে এই তরিকার নিয়ম অনুযায়ী হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তন্মধ্যে কোনো কেনো খলীফার আলোচনা অচিরেই করা হবে। আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে তাঁকে এই তরিকার মাকামসমূহের সুলুক করানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তেইশ বছর পর্যন্ত আপন মাশায়েখগণের নিকট থেকে তরিকত ও হাকীকতের নূর ও বরকত হাসিল করে কামাল (পূর্ণতা) এবং তাকমীল (পূর্ণতা প্রদান) এর চূড়ান্ত মর্তবা হাসিল করেছিলেন এবং তেইশ বছরের অধিক সময় সালেকগণের তরবিয়তের কাজে মশগুল থেকে পৃথিবীর কালপ্রবাহে কল্যাণের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. হজরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এবং হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. এর আওলাদগণের মধ্য থেকে অনেকেই হজরত মির্জা মাযহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে কারও কারও বিষয়ে এই গ্রন্থের 'খলীফাবৃন্দ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

২. কাশফ্– অদৃশ্য বিষয় এবং হাকীকতের আধ্যাত্মিকতার পর্দা উঠে যাওয়া। হাকীকত জগত ও দায়েরায়ে হেজাব (পর্দার বেষ্টনী) থেকে ওজুদ ও শুহুদের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ আহরণ। কাশফ্ দুই প্রকার– কাশফে সুরী ও কাশফে মানবী।

একাদশ অনুচ্ছেদ

মির্জা মাযহারের নির্লিপ্ততা এবং অন্যান্য গুণাবলীর আলোচনা

মির্জা মাযহার জানে জানান র. বলতেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে পরিপূর্ণ আকল এবং উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা দান করেছেন। যার ফলে আমি সুলতানাতের কার্যাবলী এবং রাজকার্যে শৃংখলাবিধানে যাবতীয় বিষয়ে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে ভালোভাবে শিক্ষা প্রদান করতে পারতাম। এ জন্য সমসাময়িক আমীর ওমরাগণ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। তিনি বলতেন, আমার পিতা মহোদয়ের তরবিয়তের বরকতে আমি এক নজরেই যে কোনো ব্যক্তির অবস্থা জেনে নিতে পারতাম। বুঝতে পারতাম তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কী কী গুণাবলী ও যোগ্যতা রয়েছে। মানুষের ললাটের দিকে নজর করেই বুঝে যেতাম তার মধ্যে তরিকতের যোগ্যতা রয়েছে কি না। সে সৌভাগ্যশালী না হতভাগ্য, বেহেশতী না দোযখী।

মির্জা মাযহারের সত্তা পরিপূর্ণ যোহদ ও তাওয়াক্কুলের গুণে ভূষিত ছিলো। দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী ছিলেন। তাদের থেকে তিনি হাদিয়া খুব কম গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একবার বাদশাহ্ মোহাম্মদ শাহ[১] তাঁর ওজীর কমরউদ্দীন খানের মাধ্যমে বলে পাঠালেন, আল্লাহ্তায়ালা আমাকে রাজ্য দান করেছেন। আপনাকে আমি হাদিয়া দিতে চাই। আপনার যা ইচ্ছা হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করুন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন[২] 'কুল্ল মাতাউদ্ দুন্ইয়া ক্বলীল' (দুনিয়ার সম্পদ অতি অল্প)। এখানে বলা হয়েছে সাত রাজার রাজ্যই যেনো অতি অল্প। এই অল্প থেকে এক সপ্তমাংশ ভারত উপমহাদেশ আপনার কাছে রয়েছে। এ থেকে দেয়ার মতো আপনার কী আছে, যা দিয়ে আপনি ফকীরগণের হিম্মতের মস্তক অবনত করতে পারেন।

একবার এক আমীর হাবেলী ও খানকা প্রস্তুত করে ফকীর দরবেশগণের বসবাসের সুবিধা করে দিতে চাইলেন। তিনি হজরতের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানালেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করলেন না। বললেন, এ বাড়ি তো ছেড়ে যেতেই হবে। সুতরাং তা নতুন বা পুরাতন দুটোই সমান। রুজি, যা এলমে এলাহীতে নির্ধারিত তা নির্দিষ্ট সময়ে মিলবেই। ফকীর দরবেশগণের জন্য সবর ও কানাআতের (অল্পে তুষ্টির) খাযানাই যথেষ্ট।

একবার প্রচণ্ড শীতের দিন তিনি একটি পুরাতন চাদর পরিহিত ছিলেন। সেখানে নবাব খান ফিরোজ জঙ্গ উপস্থিত ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি অশ্রুসজল হয়ে পড়লেন। তাঁর এক মোসাহেবকে বললেন, আমাদের মতো গোনাহ্গারেরা কতোই না হতভাগ্য। যে বুজুর্গের মুরিদ আমরা, তিনি আমাদের হাদিয়া তোহফা কবুল করেন না। মির্জা মাযহার বলতেন, ফকীর হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে রোজা রেখেছে। এখন জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হয়েছি। এমতাবস্থায় যদি রোজা ভঙ্গ করি, তাহলে দু'লাখ রুপিয়ার প্রয়োজন হবে। তাহলে প্রতিবেশীদের নারীদের উনুনে আগুন জ্বলতে পারে।

নবাব নিজামুলমুলক[৩] নগদ তেইশহাজার রুপি হাদিয়া নিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। নবাব বললেন, এগুলো তাহলে অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করে দিন। মির্জা সাহেব বললেন, আমি আপনার খানশামা নই যে, এখান থেকে বের হয়ে তা বণ্টন করবো। তারপর দুই বাড়ি দেয়ার পর তা শেষ হয়ে যাবে।

এক আফগানী সরদার তাঁর জন্য তিনশ' স্বর্ণ মুদ্রা হাদিয়া পাঠালেন। তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করতে যদিও নিষেধ করা হয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়নি। হাদিয়ার মাল হালাল বলে যদি একীন হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বরকতের বিষয়। মির্জা মাযহারের সাথীগণের মধ্য থেকে যাঁরা এখলাস ও সতর্কতার সাথে হাদিয়া নিয়ে আসতেন, তিনি তাঁদের হাদিয়া গ্রহণ করতেন। তবে যারা আমীর ওমরা ও ধনী, তাদের অধিকাংশ সম্পদ সন্দেহযুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের হক তাদের সম্পদের সাথে যুক্ত থাকে। কিয়ামতের দিন তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। এই মর্মে তিরমিযী শরীফে হাদিস বর্ণিত হয়েছে 'ওয়ামা যা আসিলা ফীমা আলিমা লা ইয়াকুলু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ক্বাদামা ইবনি আদামা হাত্তা ইউস্আলা আন খামসিন আন উমরিহি ফীমা আফনাহু ওয়া আন শাবাবিহী ফীমা আবলাহু ওয়া আন মালিহী মিন আইনা ইকতাসাবাহু ওয়া ফীমা আনফাকাহু'[৪] (কিয়ামতের দিন আদম সন্তান পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তার পদদ্বয় নাড়াতে পারবে না। তাকে প্রশ্ন করা হবে, তার জীবনকে সে কী কাজে অতিবাহিত করেছে? যৌবনকে কী কাজে লাগিয়ে বার্ধ্যক্যে পৌঁছেছে? সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং তা কোথায় ব্যয় করেছে এবং সে যা শিখেছিলো, তার কতটুকু আমলে পরিণত করেছে)। এ জন্যই হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করার কালে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

একদা কোনো এক আমীর তাঁর দরবারে কিছু আম হাদিয়া পাঠালো। তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। পুনরায় লোকটি তা পাঠিয়ে দিলো, তিনি সেগুলির মধ্য থেকে

দু'টি আম রেখে, বাকীগুলি ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলি গ্রহণ করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। একটু পরেই এক ফলচাষী তাঁর দরবারে এসে অভিযোগ করলো, ওমুক আমীর তার বাগান থেকে বলপূর্বক কিছু আম নিয়ে এসেছেন এবং তন্মধ্যে কিছু আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। আপনি এই মজলুমকে সহযোগিতা করুন। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! সে তো অপরিণামদর্শী। সে ছিনতাইকৃত মাল হাদিয়া দিয়ে ফকীরের বাতেন জগতকে কলুষিত করতে চায়।

তিনি আমীর ওমরাগণের খানা খুব কম গ্রহণ করতেন। বলতেন, ওদের খাবারের তমসা বাতেন জগতকে কলুষিত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন 'শার্‌রুত্ ত্বয়ামি ত্বয়ামুল আগনিয়া' (মন্দতর খাবার হচ্ছে ধনী লোকদের খাবার)। দরিদ্রদের দাওয়াত গ্রহণ করতেও তিনি চিন্তা ভাবনা করতেন। কেনোনা তারা সহায়-সম্বলহীন হওয়ার কারণে সুদে অর্থ নিয়ে জিয়াফতের আয়োজন করে থাকে। একদিন তিনি রোজা রেখে ইফতার করার সময় কোনো এক অজানা লোকের খাবার সাথীগণের মধ্যে বণ্টন করলেন। তিনি নিজেও কিছু গ্রহণ করলেন। তারাবীর নামাজের পর বললেন, প্রিয় বন্ধুগণ! আপন আপন বাতেনের হাল বর্ণনা করো। রুটির টুকরাগুলো বাতেনজগতে কী আছর সৃষ্টি করেছে? তখন আমি (শাহ গোলাম আলী দেহলভী) আরয করলাম, হজরত! আপনিও তো গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন, আমার বাতেন তার কারণে ধ্বংস এবং কালো হয়ে গিয়েছে। নামাজ ও কোরআন শরীফ শ্রবণ করার বরকতে তা আবার যথাযথ হয়ে গেছে। আমি আবার আরয করলাম, নিশ্চয়ই সন্দেহযুক্ত লোকমা আপনার বাতেন জগত এবং নূরের দরিয়ায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো। আমাদের মতো সংকীর্ণ অন্তরধারীর মন্দ হালের অবস্থা আর কী বর্ণনা করবো? তিনি বললেন, লোকমা বন্দেগীর তওফীক ও আনুগত্যের নূর বৃদ্ধি করে।

মির্জা মাযহার দারিদ্রকে ধনাঢ্যের উপর প্রাধান্য দিতেন। ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি পছন্দ করতেন। তসলীম (আত্মসমর্পণ) ও রেজা (সন্তুষ্ট থাকা) কে স্বীয় পছন্দের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে অনুকূল-প্রতিকূল উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন ঘটাতেন। নবী করীম স. এর দোয়া 'আল্লাহুম্মাজ আল রিজকা আলি মোহাম্মাদিন কাফাফা'[৫] (হে আল্লাহ্! মোহাম্মদের বংশধরগণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে রিযিক দান করো) মোতাবেক জীবনে চলার পথে যা প্রয়োজন তাকেই যথেষ্ট মনে করতেন এবং সাথীগণের জন্যও দোয়া করতেন, তারা যেনো এমতো পরিমাণ ধনবান না হয়, যার কারণে ফজুল খরচ করা শুরু করে দেয় এবং তারা যেনো এমন অভাবীও না হয়, যার কারণে ঋণের বোঝা কাঁধে বহন করতে হয়। তিনি তাঁর সাথী সঙ্গীগণের মধ্যে সর্বাধিক আসবাব-সরঞ্জামহীন ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুত

থাকতেন। বলতেন, বন্দেগীর বিভিন্ন স্তর ও হালকায়ে জিকিরের পর আমার অবশিষ্ট সময় মওতের অপেক্ষাতেই অতিবাহিত হয়। এখন অন্তরে কোনো বাসনা অবিশিষ্ট নেই এবং দিলেরও কোনো পার্থিব আকর্ষণ নেই। মউত তো আল্লাহ্পাকের দেয়া এক মহান উপহার। যার ফলে আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে মোলাকাত এবং মোস্তফা স. এর জিয়ারত লাভ হয়। প্রতিটি আমলের ক্ষেত্রে তিনি হাদিস শরীফের কথা ভাবতেন। বলতেন, আমরা আমাদের সময় ও আমল মোস্ত ফা স. এর সুন্নত ও ফেকাহ শাস্ত্রের বর্ণনা মোতাবেক বিশুদ্ধ করে নিয়েছি। কেউ যদি আমাদেরকে সুন্নতের খেলাফ আমল করতে দেখে, তাহলে সে যেনো আমাদেরকে নিষেধ করে দেয়। তিনি লোকদেরকে রসুল স. এর সুন্নত মোতাবেক সালাম প্রদানের তাকিদ করতেন। সালাম প্রদান কালে মাথায় হাত তোলা এবং মস্তক অবনত করতে নিষেধ করতেন। বলতেন, নির্জন থাকা আমার পছন্দ। আপন মাশায়েখগণের প্রতি তাঁর মহব্বত ছিলো সুদৃঢ়। তিনি বলতেন, আমার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আপন পীরানে কেরামের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণেই হয়েছে। তোমার আমলের যথার্থতা কোথায় যে, তার দ্বারা বারেগাহে কিবরিয়ার নৈকট্য লাভ করবে? মকবুল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত হজরতগণের প্রতি মহব্বতই আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হওয়ার সবচেয়ে মজবুত উপায়। তিনি সম্মানিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সকল মানুষের সঙ্গে বিনয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। সম্মানিত ও মোত্তাকী ব্যক্তিগণকে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে সম্মান করতেন। কোনো অমুসলিম ব্যক্তি, চাই সে আমীর হোক বা গরীব তাকে সম্মান করার জন্য তিনি সারা জীবনেও কখনও দাঁড়াননি।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন, এক মারাঠা সরদার তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছে। তিনি তখন বৈঠকখানায় যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তা বাদ দিয়ে হুজরা শরীফে চলে গেলেন। মারাঠা সরদার এসে যখন বসে গেলো, তখন হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে এলেন। আবার যখন সরদারের বেরিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে বলে মনে করলেন, তখন পুনরায় হুজরার ভিতরে চলে গেলেন, তার আসা এবং যাওয়ার কালে দাঁড়িয়ে তাকে যাতে সম্মান করতে না হয়। আর সম্মান না করলে সে অসন্তুষ্ট হবে– এহেন অবস্থায় কোনো দুনিয়াদারকে সম্মান প্রদর্শন করলে দীনের ক্ষতি হয়ে যায়।

মির্জা মাযহার তরিকার নূর প্রসারে এবং তালেবগণের হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। তিনি তাঁর সাথীগণকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট তাগিদ প্রদান করতেন। বলতেন, এই তরিকার বরকতে অন্তরে নূর এবং ইবাদতে হুজুরী পয়দা হয়। যে ইবাদত হুজুরী এবং চৈতন্যের সাথে করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আশা করা যায়। এই তরিকার নূরের বরকতে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করার অভ্যাস হয়ে যায়।

একবার তিনি শক্ত অসুখে পড়লেন। দাঁড়াতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তাঁর সাথীগণ তখন তাঁর আসনের পাশে এসে হালকা বানিয়ে মোরাকাবা করতে বসে গেলেন। তখন অকস্মাৎ তিনি এই শেরটি আবৃত্তি করলেন

খিযির আয হাসাদ বমীরাদ চুঁ বর ওই ইয়ারে বাকের
কুনাদ আখেরী নেগাহ ওরাহ পায়েদার গির্দ

(খিযিরেরও হিংসা হবে, যখন আমার উপর পতিত হবে মাহবুবে হাকীকীর নিরবচ্ছিন্ন নজর)।

এই শের পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে এক অভাবনীয় তাছীর পয়দা হয়ে গেলো এবং তিনি আসন থেকে নেমে এসে তালেবগণের সঙ্গে বসে মোরাকাবায় মশগুল হয়ে গেলেন। মনে হলো যেনো তাঁকে কোনো অসুস্থতা এবং দুর্বলতা স্পর্শই করেনি।

একদিন কোনো এক বুজুর্গ তাঁর কাছে এলেন। মহব্বত বা ঘৃণা সৃষ্টি, স্থান অতিক্রম করা, গায়েবী ক্ষমতা অর্জন এবং রাজা বাদশাহ্গণকে বাধ্য করার আমলের জন্য এজাযত চাইলেন। তিনি জাকাত আদায়ের শর্তসমূহ ছাড়াই একসের গিনি সোনা তাঁকে দান করলেন। কিন্তু মির্জা সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। কেনোনা এ ধরনের কাজে বাতেনী নেসবতে রিয়া মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দুনিয়াবী সরঞ্জামাদির প্রতি আকর্ষণের সন্দেহ বিদ্যমান থাকে। তাঁর তালেবগণের মধ্য থেকে কেউ যদি এ ধরনের বশীকরণের আমলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন, অথবা শেখার চেষ্টা করতেন, তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, এদের কী হলো? এরা তাওয়াক্কুলের (নির্ভরতার) এবং মুখাপেক্ষিতার দরজা ছেড়ে দিয়ে ধ্বংসশীল বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে কেনো? যে সকল লোক দুনিয়াদারদের সাথে মেলামেশা করে, তারা সোহবতের বরকত এবং তরিকার নূর থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি বলতেন, প্রয়োজন অনুসারে দুনিয়াদার লোকদের সাথে মেলামেশা করাতে দোষ নেই। তবে এই শর্তে যে, তার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং তার বাতেনী নেসবতের হেফাজত করতে হবে। তিনি বলতেন, দুনিয়া আল্লাহ্র গজবের লক্ষ্য বস্তু। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে ‘আলা ইন্নাদ দুন্ইয়া মালউনাতুন ওয়া মালউনুন মা ফীহা ইল্লা জিকরুল্লাহি ওয়ামা ওলাহু ওয়া আ’লিমুন আও মুতাআ’ল্লিমুন’[৬] (রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকলকিছু অভিশপ্ত। আল্লাহ্র জিকির, আল্লাহ্র প্রিয় আলেম বা তালেবে এলেম ব্যতীত)। তিরমিযী। সালেকের অন্তরে আল্লাহ্ ও দুনিয়া একত্র হতে পারে না। গায়রুল্লাহকে বর্জন এবং দুনিয়াবী মকসুদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

আরযু ব গুজার তা রহম আয়েদাশ
আয মুদম মন চুঁনী মী বায়েদাশ

(খাহেশকে অন্তর থেকে বের করে দাও যেনো অন্তরে রহম আসে। আমি বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছি– তিনি (আল্লাহ্) তা পছন্দ করেন)।

মুয়ে সরফ ওয়াহদাত কিছি নুশ কর্দ
কে দুনিয়া ও উক্ববা ফরামুশ কর্দ

(যে ব্যক্তি খালেস ওয়াহদাত (একত্ববাদ) এর শরাব পান করেছে, সে ভুলে গিয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতকে)।

তথ্যপঞ্জি

১ এতেমাদুদ্দৌলা কমরউদ্দীন খান বাহাদুর ১১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ্ মোহাম্মদ শাহের উজীর ছিলেন। রাষ্ট্রীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। তাঁর পুত্র এনতেজামুদ্দৌলা হজরত মাযহারের মুরিদ ছিলেন। হজরত মাযহারের দু'টি চিঠি তাঁর নামে লেখা হয়েছিলো।

২ আল কোরআন, সুরা নিসা-৪/৭৭।

৩ নওয়াব নিজামুল মুলক আসফজাহ প্রথম (১০৭২-১১৬১) দৌলতে আসেফার প্রতিষ্ঠাতা।

৪ তিরমিযী শরীফ বাবে মা জাআফী শানুল হিসাব ওয়াল কিসাস। ছাপা করাচী।

৫ মুসলিম শরীফ ২/৪০৯।

৬ তিরমিযী শরীফ ২/৫৭।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

হজরত মির্জা মাযহারের মলফুজাত (বাণীসমূহ)

১. তিনি বলেছেন, ইমানে মুজমাল অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপর ইমান এনেছি এবং তিনি আল্লাহ্তায়ালা থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ইমান এনেছি। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বন্ধুগণের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করি। আর তাঁর দুশমনদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করি। এটাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মাসআলা দলিল সহকারে সাব্যস্ত করা অভিজ্ঞ আলেমগণের কাজ। আম-মুসলমানগণের এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নেই।

২. আহলে বাইতের ইমামগণের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করা এবং বড় বড় সাহাবীগণকে সম্মান করা অপরিহার্য। আর এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম, যা কিয়ামতের দিন পুলসিরাত রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় এই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হবে না, সে কিয়ামতের দিন দৃঢ়তার সাথে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে।

৩. একবার এক বেআদব রাফেজী জনাব আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারুক রা.কে গালি দিলো। আমি দীনের মর্যাদা এবং রসুলের সাহাবীগণের প্রতি সম্মানবোধের কারণে রাগান্বিত হলাম এবং সেই বেআদবের মাথায় খঞ্জর মারার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সে ভয় পেয়ে এই বলে ফরিয়াদ করতে লাগলো যে, আমাকে হজরত ইমাম হাসানের খাতিরে ছেড়ে দিন। হজরত ইমাম হাসানের নাম শোনা মাত্র আমার রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো এবং ওই বেআদবকে ক্ষমা করে দিলাম।

৪. আউলিয়া কেরামকে সম্মান করা এবং মাশায়েখে কেরামকে মহব্বত করা অবশ্য কর্তব্য। যদি ফায়দা গ্রহণের খাতিরে আপন পীরকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে তা অন্যান্যদের প্রতি মহব্বতের পরিপন্থী হবে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. যিনি এক নতুন তরিকার প্রচলন করেছেন এবং তাঁর তরিকার মাকামসমূহ এবং কামালাতের বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁর মনোনীত সাথীগণ, যাঁরা ওই মাকামসমূহে এবং লব্ধ মারেফাতসমূহে পৌঁছেছেন তাঁদের সংখ্যা হাজারের অধিক। তাঁর আবিষ্কৃত মাকামসমূহের বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহও নেই। কেনোনা হাজার হাজার আলেম ও জ্ঞানী মোতাওয়াতিরের ভিত্তিতে তাঁর স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁকে স্বনামধন্য আউলিয়া কেরামের সমকক্ষ মনে করা বা আকাবের মাশায়েখগণের উপর প্রাধান্য দেয়ার আকীদা পোষণ করা যাবে না। কেনোনা ওই সকল আকাবেরে দীন যাঁরা, তাঁরা তাঁর মাশায়েখ ছিলেন।

৫. এ সময়ের মানুষের আল্লাহ্তায়ালার বিধানের উপর আমল করা এবং তাকওয়ার জীবন গ্রহণ করা খুব মুশকিল। মোয়ামালাতের লেনদেনের বিধান ধ্বংস হয়ে গেছে। শরীয়ত মোতাবেক আমল করা স্থগিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি ফেকাহ শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে জাহেরী ফতওয়ার উপর আমল করে এবং বেদাত পরিহার করে তাহলে তা হবে গনিমত তুল্য।

৬. তিনি বলতেন, 'আস্ সেমাউ ইউরিছুর রিক্কাতা ওয়ার রিক্কাতু তুরিছুর রহমাতা' (সেমা অন্তরে নম্রতা আনয়ন করে আর নম্রতা রহমতের কারণ)। সুতরাং যে জিনিস রহমতে এলাহীর কারণ হয়, তা হারাম হয় কেমন করে? তবে হাঁ, বাদ্যযন্ত্র হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু খুশির স্থলে দফ বাজানো মোবাহ এবং বাঁশি বাজানো মাকরুহ। হজরত রসুলে খোদা স. একবার এক জায়গায় গিয়েছিলেন। সেখানে বাঁশির আওয়াজ শুনে তিনি কান বন্ধ করে নিয়েছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রসুলেপাক স. এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁকে বাঁশির আওয়াজ শুনতে নিষেধ করেননি। সুতরাং জানা গেলো যে, বাঁশির বাজনা শ্রবণ না করাই পূর্ণ তাকওয়া।

যেহেতু নকশ্বন্দী বুজুর্গগণের আমল আযীমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁরা রুখসতের আমল পরিহার করে থাকেন। তাই সেমাও তাঁদের নিকট পরিত্যাজ্য। যেহেতু সঙ্গীত শ্রবণ করার বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। সুতরাং মতভেদযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করাই উত্তম। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়ার ভিত্তিতে জিকরে খফী গ্রহণ করেছেন এবং জিকরে জহর মওকুফ করেছেন।[১]

৭. তওহীদে ওজুদীর মাসআলাটি দ্বীনের অপরিহার্য বিষয় নয়। শরীয়ত এ প্রসঙ্গে নীরব। সুফিয়ানে কেরাম বিষয়টিকে আপন আপন কাশফ ও প্রাপ্ত মারেফতের আলোকে বর্ণনা করেছেন। মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে যে হাল হয়ে থাকে, তা মাযুর (নিরুপায়)। ওয়াহ্দাতুল ওজুদ সম্পর্কিত পুস্তিকাসমূহ এবং 'লা মাওজুদা ইল্লাল্লহ্' এর অর্থের প্রতি খেয়াল করে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ হাসিল করার জন্য চেষ্টা করা আহলে মারেফতগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

এক আলেম একবার স্বপ্নে দেখলেন, আলেম ও সুফীগণ রসুলেপাক স. এর সামনে উপস্থিত। আলেমগণ সুফীগণের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ সকল সুফী 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' এর প্রচার করে শরীয়তের মধ্যে বিপর্যয় ঘটাচ্ছেন। নির্বোধ লোকেরা এর মাধ্যমে অহমিকা প্রদর্শন করে। কিন্তু রসুল স. তাঁদেরকে মাযুর মনে করে এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেন। কেনোনা আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মহব্বতের প্রাবল্যের কারণেই এরকম ঘটে থাকে।

৮. একবার আমার উরুজ (ঊর্ধ্বারোহণ) হলো। উন্মোচিত হলো সুবিস্তৃত নূর। তার মধ্যে মুদ্রিত ছিলো সকল সৃষ্টির চিত্র। তখন আমার শায়েখ আকবরের উক্তি মনে পড়ে গেলো। তিনি বলেছেন 'আল আশইয়াউ আ'রাজুন মুজআমিয়াতুন ফী

আইনিন ওয়াহিদীন'[২] (সমগ্র মহাবিশ্ব চাই তা ঊর্ধ্বজগতস্থিত হোক অথবা হোক নিম্নজগতস্থিত, সবই আরয (অবাস্তব)। সবাই এক হাকীকতে লীন। আমার তখন জানা হলো যে, ইসিম ও সিফতের প্রতিবিম্ব, যা এলেমের স্তরে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে, তা ওজুদ এর বাতেন। তা জাহেরী ওজুদেও প্রতিবিম্বিত হয়ে আছারে মকসুদ (আল্লাহ্র এরাদার প্রতিফল) এ আকৃতি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে খারেজে (সৃষ্টজগতে) ওই একই ওজুদ বিদ্যমান। তখন হঠাৎ আমাকে অবহিত করা হলো যে, এই স্তরের উপরে রয়েছে আরেকটি স্তর। যেমন সুফী সম্প্রদায়ের আকাবেরগণ বলেছেন, 'ফাওকা আ'লমিল ওয়াজুদি আলামুল মালিকিল ওয়াদূদ' (মালিকুল ওয়াদুদের আলম আলামুল ওয়াজুদের উপর)।

সুলুকের পথে ওয়াহ্দাতুল ওজুদের মারেফাত এসে যায়। এই মারেফতের এলেমটি বাহ্যিক শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। কিন্তু পরবর্তীতে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যে সকল আকাবের আউলিয়া এহেন ওয়াহ্দাতুল ওজুদের মারেফতের সপক্ষে ছিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা এ অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়ে উন্নতি লাভ করেছেন।

৯. আল্লাহ্তায়ালা যখন তাঁর কোনো বান্দাকে এখলাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং চান তাঁর বুজুর্গীর উন্নতি সাধন, তখন তাঁর উপর ফয়েজ বৃদ্ধি করে দেন এবং তাঁর জটিলতাসমূহ দূরীকরণার্থে তাঁর পীর ও মোর্শেদের ব্যাপারে কাশফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে হেদায়েত দিয়ে থাকেন। আবার কোনো কোনো সময় পীরের লতীফাসমূহ তাঁর আকৃতি ধারণ করে তাঁর কার্য সমাধানের ওসিলা হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় ওই বুজুর্গ সম্পর্কে অবহিতও করা হয়। এক ব্যক্তি একদিন আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনি কবে মক্কা শরীফ থেকে এসেছেন? আমি বললাম, আমি তো মক্কা শরীফ যাইনি। লোকটি বললো, আপনার সঙ্গে আমি কাবা শরীফে দেখা করেছি। একটি শেরের পঙ্ক্তি ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি তা আমাকে বলে দিয়েছিলেন। এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং এ রকম ক্ষেত্রে কারও গর্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমাদের তোমাদের সকলের জন্যই কেবল একটি বাহানা। প্রকৃতপক্ষে সকল কাজের সৃজয়িতা আল্লাহ্তায়ালাই।

ও বদুলহামী নুমায়েদ খেশেরা
ও বদুযদ খেরকায়ে দরবেশে রা

(তিনি (আল্লাহ্) নিজেকে অন্তরসমূহে প্রকাশ করেন। আর দরবেশকে খেরকা দান করেন)।

১০. এই তরিকায় পীর মুরিদী শুধুমাত্র বায়াত, সেজরা প্রদান এবং কেলাহ্ (টুপী) দান নয়। বরং মোর্শেদের সোহবতে থেকে কলবী জিকির, জমইয়ত (অন্তরকে খাতির জমা করা) এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করার তালীমই এই তরিকার বৈশিষ্ট্য।

১১. তরিকার বিভিন্ন শোগল (আমলসমূহ) গ্রহণ করা হয় মহব্বতে এলাহীর প্রাবল্য অর্জনের জন্য। কখনও কখনও কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহেও প্রবল মহব্বত হয়ে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র বন্ধুগণের তরিকায় শর্তসহকারে অবিরত আল্লাহ্র জিকির অপরিহার্য। এমতাবস্থায় সকল কাম্যবস্তু বর্জন করে অধিকহারে আল্লাহ্র জিকির করতে হবে। কেনোনা অধিক জিকির ব্যতীত কলবের আবরণ উন্মোচিত হয় না। জিকির করার সময় কোনো কাইফিয়ত বা আত্মহারা ভাব সৃষ্টি হলে, তা সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো রকম হাল প্রকাশ না হলে আজিযী এনকেসারীর (বিনয়নম্রতার) সাথে জিকির করতে হবে। এভাবেই বিভিন্ন শোগলে লেগে থাকতে হবে, যেনো স্থায়ী কাইফিয়ত (অবস্থা) অর্জিত হয়।

১২. সময়কে জিকির ও এবাদতের মাধ্যমে আবাদ করতে হবে। প্রাপ্ত শক্তিকে গায়রুল্লাহ্র দিক থেকে পবিত্র রাখতে হবে। 'আল্লাহ্' ইসিম মোবারকের মাফহুম, যার উপর আমরা ইমান এনেছি, তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি আমাদের মনোযোগ ও হিম্মত প্রয়োগ করা যাবে না, যাতে করে হুজুরীর (মগ্নতার) যোগ্যতা সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ দীন-ইসলাম, ইমান ও এহসান হাসিল হয়। কলবের দিকে যখনই খেয়াল করবে, তখনই যেনো তাকে হক সুবহানাহু তায়ালার প্রতি মনোনিবেশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এমতো শোগলের অবস্থায় যদি অন্য কোনো যওক শওক (আস্বাদন-আগ্রহ) এবং কাইফিয়ত (অবস্থা) পাওয়া যায়, তাহলে তাকে আল্লাহ্তায়ালার অধিক অনুগ্রহ মনে করতে হবে। মূলতঃ হুজুরী অর্জনই এখানে আসল কাজ।

১৩. এমন সলীম কলব পয়দা করা উচিত, যেখানে গায়রুল্লাহর যাতায়াত রুদ্ধ হয়। কোনো ঘটনা বা স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়। কেনোনা এসবের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের আবির্ভাব ঘটে। কখনও এত্তেবায়ে সুন্নতের নূর, জিকিরের নূর, মোর্শেদের নেসবত, অধিক হারে দরূদ পাঠ, পীরানে কেরামের খেদমত, হাদিসের অনুশীলন, কখনও তাসদীক ও এখলাস এসব কিছু রসুলুল্লাহ স. এর সুরত ধরে প্রকাশিত হয়। এভাবে আউলিয়া কেরামের সাথে সম্পর্কের রাবেতা ওই সকল আউলিয়া কেরামের সুরতে দেখা দেয়। কখনও কোনো সুবিখ্যাত সংবাদ এবং ঘটনার সুরতে দেখা দেয়। এ সবই অন্তরে আনন্দ দানের জন্য হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো মূল বিষয় নয়। তবে রসুলুল্লাহ স. এর জিয়ারত সালেকের মধ্যে হাল, বাতেনের নূর এবং ইবাদতের তওফীক বৃদ্ধি করে। মূল কাজ মূল লক্ষ্য অনুসারেই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা।

১৪. হজরত রসুলুল্লাহ স. এর জিয়ারত এবং আল্লাহ্তায়ালার (আত্মিক)দর্শন, যাকে তাজাল্লিয়ে সুরী বলা হয়, তা আল্লাহ্তায়ালার মহা অনুগ্রহ। যে প্রকারেই হোক না কেনো তা নেসবতের দৃঢ়তার সুসংবাদ প্রদানকারী। 'হানিআল লিআরবা বিন্নায়ীমে নাঈমুহুম'[৩] (নেয়ামত ওয়ালাদের জন্য তাদের নেয়ামত খুবই সুখকর বিষয়)।

১৫. হৃদয়ে কল্পনা প্রবল হলে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে পানা (সাহায্য) চাইতে হবে। আর মোর্শেদের সুরতকে মনোযোগের কেন্দ্রস্থল বানিয়ে বাতেনী রোগসমূহ দূরীকরণার্থে আশ্রয় যাচনা করতে হবে।

১৬. সালেকের মধ্যে দারিদ্র ও ভগ্নতার সিফত থাকা অপরিহার্য। মানুষের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করা এবং এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

চীস্ত মেরাজ ফানা ইঁ নিস্তী
আশেকাঁ রা মাযহাব ও দীন নিস্তী

(ফানার মেরাজের (উর্ধ্বারোহণের) বাহন হচ্ছে অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়া আশেকগণের একমাত্র পথ হচ্ছে মাহবুবের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া)।

দৃষ্টি উন্নত হওয়া উচিত। মাজাযী বিষয়াদীকে তকদিরের লিখন মনে করতে হবে। উচ্চবাচ্য করা যাবে না। হজরত রসুলে খোদা স. এর খাদেম হজরত আনাস রা. থেকে যদি কখনও কোনো ভুলত্রুটি হয়ে যেতো এবং আহলে বাইত তাঁকে তিরস্কার করতেন, তখন রসুল স. বলতেন, ওকে কিছু বলো না। যদি তকদীরে নির্ধারিত থাকতো, তাহলে কি সে এরকম করতো?

১৭. শরীয়তের হুকুম আহকামসমূহের সার কথা হচ্ছে রসুলুল্লাহ স. এর সম্মানিত চরিত্র অনুসারে আমাদের চরিত্র সুগঠিত করে নেয়া। তাঁর স. চরিত্র হচ্ছে খুলুকে আজীম (মহান চরিত্র)। হাদিস শরীফে এসেছে 'বুইছতু লি উতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক'[৪] (সম্মানিত চরিত্রকে পূর্ণতা প্রদানের জন্য আমি আবির্ভূত হয়েছি)।

নফী ইসবাতের জিকিরের অনুশীলন দ্বারা মানবীয় বৈশিষ্ট্য পরিশীলিত হয়। এই জিকিরের নিয়ম হচ্ছে মন্দ স্বভাবসমূহ পৃথক পৃথকভাবে খেয়াল করে লা কলেমা দ্বারা কিছু দিন পর্যন্ত নফী (রহিত) করতে থাকবে এবং সেস্থানে আল্লাহ্র মহব্বত প্রতিষ্ঠিত করবে। এভাবে এক পর্যায়ে সেই মন্দ স্বভাব দূরীভূত হয়ে যাবে। নফসানী খাহেশের বিপরীতে সুলুকের মাকামসমূহ অর্জন করতে হবে। এ রকম করতে থাকলে হতে পারে একদিন মন্দস্বভাবসমূহ সৎগুণাবলীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

১৮. এটা সত্য যে, মন্দ স্বভাবসমূহ তাসফিয়া ও তাযকিয়া (আত্মিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা) এর পর দূরীভূত হয়। কিন্তু পরিপূর্ণ নিঃশেষ হয় না। হাদিস শরীফে এসেছে, তুমি যদি শোনো, পাহাড় তার স্বস্থান থেকে সরে গিয়েছে, তা বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু যদি শোনো, কারও জন্মস্বভাব পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে, তাহলে তা বিশ্বাস কোরো না। 'লা তাবদীলা লি খলক্বিল্লাহ'[৫] (আল্লাহ্তায়ালার সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।)

আমীরুল মুমিনীন হজরত ওমর ফারুক রা. বলতেন, আমার রাগ দূর হয়ে যায়নি। তবে তা আগে কুফুরীর কাজে প্রয়োগ হতো। এখন ইসলামের সহায়তায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

১৯. ফানা এবং নফসের প্রশান্তির পর তসলীম (সমর্পণ) ও রেজা (সন্তুষ্টি) সালেকের গুণ হয়ে যায়। কলবের ফানায় মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে কার্যসমূহের কারণ সালেকের নিকট থেকে হারিয়ে যায়। ফয়েজে হাকিকী বা প্রকৃত কর্তা (আল্লাহ্) ছাড়া আর সব কিছুই সালেকের দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে যায়।

২০. পানাহার, নিদ্রা ও জাগরণ এবং আমল ও ইবাদতে মধ্যম পন্থা এবং ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন কাজ। তবে সব সময় সকল কাজে রসুলে করীম স. এর সুন্নতের অনুসরণ করার চেষ্টায় থাকতে হবে। সকল কাজে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই আম্বিয়া কেরামের অনুসরণ করতে হয়। সকল ক্ষেত্রেই 'লিইয়াকুমান্নাস্ বিল্কিস্ত'[৬] (মানুষ যেনো ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়) আল্লাহ্তায়ালার এই হুকুম অকাট্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আরও বলেছেন, ফয়েজের উৎস (আল্লাহ্তায়ালার তরফ) থেকে অবিরত তাওয়াজ্জোহের ফলে সালেকের মধ্যে এমন পরিমাণ ফয়েজ ও বরকত আসতে থাকে যে, তার বাতেন জগত মহব্বতের কাইফিয়ত ও নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে নূরের প্রবাহ জারী হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সালেকের নিজের আমলের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং শুধু আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহের প্রতি খেয়াল রেখে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যতো আমলই করা হোক না কেনো, তার পরেও দুর্বিনয় ও অহংকারকে ভয় করতে হবে। নিজের আমলের ত্রুটির প্রতি খেয়াল এবং রহমত লাভের আশাই কবুল হওয়ার ওসিলা। সামান্য গোনাহ্কে অনেক বড় বলে মনে করবে। অল্প নেয়ামতকে বেশুমার মনে করে শোকর ও রেজার পথ গ্রহণ করতে হবে।

২১. সালেকদের দৈনিক একহাজার বার দরূদ শরীফ পড়া এবং অধিকমাত্রায় এস্তেগফার পাঠ করা অপরিহার্য। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মকতুবাত শরীফ, যা শরীয়তের মাসলা, তরিকতের গোপন রহস্য, হাকীকতের জ্ঞান, সুলুকের সূক্ষ্ম বিষয়, এলমে তাসাউফের হাকীকত, আল্লাহ্র সঙ্গে নেসবতের নূর সম্বলিত কিতাব

প্রতিদিন নিয়মিত আসরের পর তার পাঠ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আমল করতে থাকলে সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়।

২২. প্রত্যেক দিন মুশকিলসমূহ দূর করার উদ্দেশ্যে হেজবুল বাহরের দোয়া, সকাল সন্ধ্যার ওজিফা এবং খতমে খাজেগান শরীফ পাঠ করা উচিত। তাহাজ্জুদের নামাজ দশ বা বারো রাকাত সুরা এখলাস, সুরা ইয়াসীন অথবা যে কোনো সুরা দ্বারা সম্ভব হয় আদায় করা উচিত। এশরাক নামাজ চার রাকাত, চাশতের নামাজ চার বা ছয় রাকাত এবং সূর্য ঢলে পড়ার পরও চার রাকাত নফল নামাজ এক সালামে পড়তে হবে। মাগরিবের সুন্নতের পর ছয় বা বিশ রাকাত, এশার সুন্নতের পর চার রাকাত, আসরের সুন্নত এবং তাহিয়াতুল ওজুও পড়া উচিত। প্রতিদিন কোরআন মজীদ এক পারা তেলাওয়াত করতে হবে। কলেমা তামজীদ, কালেমা তাওহীদ একশ বার, সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সকালে এবং শয়নকালে একশ বার করে পাঠ করতে হবে। হাদিস শরীফে সময় ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকল দোয়া উল্লেখ আছে, তাও পাঠ করতে হবে। তবে এ সকল আমলের মধ্যে হুজুরে কলব থাকতে হবে।

২৩. ফানা হাসিলের আলামত হচ্ছে, গায়রুল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং আল্লাহ্তায়ালার প্রতি স্থায়ী মনোযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই ফানা যদিও এই তরিকায় অতি দ্রুত অর্জিত হয়, তবুও তা সাব্যস্ত ও স্থায়ী হওয়া যা-দ্বারা গায়রুল্লাহকে বিস্মৃত হওয়া যায় এবং এলেম ও হুব্ব এর সম্পর্ক দিল থেকে কর্তন করা– তা দীর্ঘ দিন পর হাসিল হয়।

এ তরিকার মাকামসমূহ অর্জন করার জন্য তিরিশ বছর পর্যন্ত মাশায়েখে কেরামের খেদমত করেছি। তারপর তিরিশ বছরের অধিক সময় ধরে তালেবে মাওলাগণকে তরিকার তালীম প্রদানে নিয়োজিত ছিলাম। ষাট বছর পর হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর তাওয়াজ্জোহের বদৌলতে আমার কলবের ফানা হাসিল হয়। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে বাতেনী আমলে নিয়োজিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রায়ানুসারে আমার মধ্যে কলবের ফানার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন ফানার পূর্ণতা প্রকাশ পেলো, তখন বার বার আমার মনে হচ্ছিলো যে, আমি এই দুনিয়া থেকে এখনই বিদায় গ্রহণ করবো। তখন কেউ সালাম দিলে আমার মনে হতো যেনো কোনো ব্যক্তি এসে আমার কবরে সালাম পেশ করছে। তারপর এক পর্যায়ে এই হাল থেকে আমার চৈতন্য এলো। তখন আমার মনে হলো, আমি বোধহয় বেঁচে আছি এবং এখনই সফরের সামান বাঁধার সময় হয়নি।

২৪. আমার ফানার হাল যখন প্রকাশিত হলো, তখন আমার মধ্যে স্বীয় ক্রটি এমনভাবে দেখা দিতে লাগলো যে, মানুষ আমার খেদমত এবং সম্মান করলে আমি বিস্মিত হতাম। এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের রচয়িতা শাহ্ গোলাম আলী বলছেন, একদিন আমি আমার শায়েখ মির্জা মাযহারের নিকট হাজির ছিলাম। আমি তাঁকে পাখার বাতাস করছিলাম। তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। কিন্তু আরেকদিন পাখা করার জন্য নিজেই আমাকে হুকুম দিলেন। বললেন, গতকাল আমার মধ্যে ফানার নেসবত প্রকাশ পেয়েছিলো। তখন আমার মনে হচ্ছিলো, তুমি আমার প্রতি বিদ্রূপছলে বাতাস করছো। তাই শক্তভাবে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। এখন আমার মধ্যে বাকার নেসবত প্রকাশিত। তাই আমার বাতেনে আল্লাহ্তায়ালার আজমত ও কিবরিয়া সিফতের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার কিবরিয়ার সামনে তাঁর সম্মানার্থে যদি সমগ্র পৃথিবীও দণ্ডায়মান হয়, তবুও তাঁর সম্মানের হক আদায় হবে না।

২৫. তাজাল্লিয়ে এলাহী (আল্লাহ্তায়ালার আবির্ভাব) যা আহলে মহব্বত ও মারেফতের বাতেন জগতে উপনীত হয়, তা অধিকভাবে চিনতে পারা খুবই কঠিন কাজ। তাকে চিনতে হলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন। তাহলেই তাজাল্লীসমূহের হাল পৃথক পৃথকভাবে বোধগম্য হবে।

২৬. তরিকতের বিভিন্ন মাকাম হাসিলের পর সালেকের হাল হয় বিভিন্ন চিত্র অংকিত পটের মতো। ওই পটে কখনও মাকামের নেসবত প্রকাশিত হয় এবং সালেক সেই হালকে তার নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে। আবার কখনও মাকামসমূহের নেসবত অন্যের মধ্যে প্রক্ষেপণ করে। তখন সালেকের মধ্যে অন্য রকম হাল হয়। কিন্তু মোজাদ্দেদিয়া খান্দানের তালেবগণের নেসবত যখন ঊর্ধ্বে এবং পূর্ণতায় পৌঁছে, তখন সালেক তার হালের বর্ণবিহীনতা এবং সূক্ষ্মতার কারণে অনুভব করতে পারে না। কেনোনা নিম্নের সকল মাকামসমূহে সূক্ষ্মতা এবং পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং সেই পরিচ্ছন্নতা সমস্ত কাইফিয়তকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। যে সকল ঘটনা এবং স্বপ্ন তরিকতের পথের শিশুদের যাত্রাপথে ঘটে থাকে, যা মনকে আনন্দ দেয়, নুজুলের সময় তা কমে যায়। এখানে কেবল অজ্ঞতা এবং হয়রানিই বিদ্যমান থাকে।

২৭. নির্জনে বসে বাতেনী নেসবতের হেফাজত এবং ফয়েজের উৎসের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকল মুহূর্তকে জাহেরী আমল দ্বারা ভরপুর করে রাখতে হবে। কেনোনা আমলসমূহের নূর জমইয়ত (আত্মিক স্থিরতা), নেসবতের পরিচ্ছন্নতা, হুজুরী এবং চৈতন্যের কারণে হয়ে থাকে।

২৮. সব সময় মোরাকাবা করা দ্বারা বাতেনী নেসবতে সুলক ও মালাকুত (ইহজগত ও ফেরেশতাদের জগত) এর সংবাদ অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে

আল্লাহ্পাকের মেহেরবানিতে এক প্রকারের শক্তি অর্জিত হয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লহ এর অধিক জিকির দ্বারা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ফানা, অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফের দ্বারা ভালো ভালো ঘটনা, অধিক নফল ইবাদতের দ্বারা আজেযী এনকেসারী (বিনয়,নম্রতা) এবং অধিক তেলাওয়াতের দ্বারা নূর ও পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' জিকির আর্থিকভাবে এ তরিকায় উপকারী। তবে শুধু শব্দোচ্চারণও আখেরাতে পুণ্যলাভের কারণ হবে এবং এতে করে মন্দ স্বভাব দূরীভূত হবে।

২৯. নফী ইসবাতের জিকির হাবসে দম (দম বন্ধ) এর মাধ্যমে তিনশ বারের কম হলে তাতে কোনো ফায়দা পাওয়া যাবে না। এই জিকির যতোই বেশী করা যাবে ততোই উপকারী হবে। হজরত খাজা নকশবন্দ র. দম বন্ধ করাকে জিকিরের শর্ত করেননি। বরং তা উপকারী কেবল একথাই বলেছেন। তবে সার্বক্ষণিক জিকির, কলবের প্রতি খেয়াল এবং ফয়েজের উৎসের প্রতি লক্ষ্য রাখা এই তরিকার রোকন (অঙ্গ) নির্ধারণ করেছেন।[৭]

৩০. প্রথমে কলবের জিকির জরুরী। যখন জিকিরে কিছু শক্তি সঞ্চারিত হবে এবং ইসমে জাতের আওয়াজ খেয়ালের কানে শুনতে পাওয়া যাবে, তখন প্রত্যেক দমে দমে আল্লাহ্তায়ালার জাতের প্রতি তাওয়াজ্জোহ্ এবং চৈতন্য রাখতে হবে। মনের মধ্যে যখনই কোনো কল্পনা আসবে, তখনই তাকে বাধা দিতে হবে। যেনো নফসের খাহেশ এবং ওয়াস্ওয়াসায় কোনো বিপর্যয় না নেমে আসে। কেনোনা মনের কামনা-বাসনা ফয়েজ আগমনের প্রতিবন্ধক। হুঁশ হরদম এর তাৎপর্য এটাই।

৩১. ইসমে জাতের জিকির দ্বারা জযবায়ে এলাহীর নেসবত হাসিল হয়। নফী ইসবাতের জিকির সুলুকের রাস্তা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে উপকারী।

৩২. বাতেনী হালসমূহ অনুভব করা এবং তা সংরক্ষণ করা বেলায়েতের স্তরের কাজ। তবে কামালাতে নবুওয়াতে বাতেনের বৈশিষ্ট্য অজ্ঞতা এবং হয়রানী ছাড়া আর কিছুই নয়। তদূর্ধ্বের মাকামসমূহে সূক্ষ্মতা এবং বর্ণবিহীনতা অপরিহার্য। সার কথা হচ্ছে, এসব মাকামে এমন কিছু এলেম লাভ হয়, যা ব্যক্ত করা যায় না।

৩৩. মোজাদ্দেদিয়া সিলসিলার নেসবতে সূক্ষ্মতা এবং বর্ণবিহীনতা থাকার কারণে অনেক সময় মানুষ তা এনকার করে বসে। তাই এ তরিকার সালেক যখন তার সায়ের সুলুক পূর্ণ করে শেষ প্রান্তে পৌঁছে, তখন আমার মনে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে, না জানি তরিকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্তায়ালা যদি আমার হায়াত পূর্ণ করেন, তাহলে সালেকগণকে নিম্ন মাকামসমূহ থেকে ঊর্ধ্ব মাকামে পৌঁছে দেবো। এক্ষেত্রে আসল মকসুদ তো আল্লাহ্তায়ালা এবং সুন্নতের অনুসারী হওয়া, যা সকল মাকামেই হাসিল হয়।

৩৪. মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মাকামসমূহে কলবের মধ্যবর্তী অবস্থায় একীন এবং প্রশান্তি বেশী পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী অবস্থায় মকসুদ এর সাথে প্রকারবিহীন মিলন হয়।

এত্তসালে বেতাকাইয়ুফ বে কিয়াস
হাস্তে রাব্বুন্নাসে রা বা নুয়ে নাস

(মানব জাতির সঙ্গে মানুষের রবের যে মিলন, তা হয় প্রকার ও অনুমানবিহীন অবস্থায়। তখন সালেকের মধ্যে কোনো ধরনের যওক-শওক ও হুজুরীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না)।

৩৫. কামালাতে পৌঁছার রাস্তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং বেলায়েতের পথ বিলীন হওয়ার উপক্রম। এই আখেরী জামানায় সুলুকের মাকামসমূহ পার হওয়ার জন্য মানুষের যোগ্যতা খর্ব হয়ে গেছে। কাজেই তারা মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে অক্ষম। তিরিশ বছর পূর্বে তালেবগণের সায়ের সুলুকের মধ্যে দ্রুততা ছিলো। তাদের কাশফ্ ও প্রাপ্তিও বিশুদ্ধ হতো। এখনও যদি আমার সাথীগণের মধ্য থেকে কোনো তালেব খাঁটি ও এখলাসের সাথে তরিকার ফয়েজ হাসিলের জন্য চেষ্টা করে, তবে দীর্ঘ সময়ের পর সে কলবের বেলায়েত বা উচ্চতর মাকাম লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু তরিকায়ে মোজাদ্দেদিয়ার মাকাম অর্জন করা খুবই কঠিন কাজ।

৩৬. বিভিন্ন মাকামে সায়ের সুলুক কালে যে কাশফ্ হয়, তা বাস্তবভিত্তিক খুব কমই হয়। কাজেই এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ্র উপর অপবাদ দেয়া এবং সালেকদেরকে অহংকারী বানানো উচিত নয়। হালসমূহের মধ্যে পরিবর্তন, ওয়ারেদাতের আগমন, আল্লাহ্তায়ালার প্রতি দায়েমী (সার্বক্ষণিক) মনোযোগ, অন্তরের খাতিরজমা (নির্লিপ্ত) ভাব, সময়ের ওজিফা আদায় এবং ইবাদত অনুসারে নিজেকে আবাদ করা– এ সবই হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত।

৩৭. যওক-শওক এর তাছীর উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। ওই তাছীর আহলে দিল ব্যক্তিকে সংরক্ষণ করে। সকল তরিকার হাল ও তাসার্রুফাত (কারামত) এর ক্ষেত্রে সে নেসবতটিই তালেবকে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রশান্তি ও খাতিরজমা ভাব অর্জন করা, যা কামালাতে নবুওয়াতের স্তরে হয় তা অধিকতর উচ্চ, যা কেবল মোজাদ্দেদিয়া তরিকারই বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে অনেক নূর আছে এবং এক্ষেত্রে সালেকগণ অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। উষ্ণ তাছীর, যা অস্থিরতা নিয়ে আসে, তা তরিকতের পথে উপকারী।

প্রকাশ থাকে যে, প্রাচীনকালের বুজুর্গগণের মধ্যে খাতিরজমা এবং প্রশান্তি খুব বেশী দেখা যেতো। সে জন্য তাঁরা তাঁদের সাথী (মুরিদ) গণকে অস্থির কর্মকাণ্ড করতে নিষেধ করতেন। কেনোনা বিলাপ ও চিৎকার এ সকল রসুলেপাক স. এর সাহাবীগণের পরে প্রচলিত হয়েছে।

৩৮. জরুরী মাসআলা মাসায়েল পড়া অথবা আলেমগণের সোহবতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে শুনে আমলের বিশুদ্ধতার জন্য তা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য। এলমে হাদিস এমন একটি জামে এলেম, যার মধ্যে তাফসীর, ফেকাহ এবং সুলুকের সূক্ষ্ম বিষয়াদি রয়েছে। এই এলেমের বরকতে ইমানের নূর বৃদ্ধি পায়। নেক আমল এবং উত্তম চরিত্র গঠনের তৌফিক লাভ হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, যে সকল হাদিস সহীহ্, যা রহিত হয়নি, যা মোহাদ্দেছগণ বর্ণনা করেছেন, রাবীগণের (বর্ণনাকারীগণের) অবস্থাও জানা, কয়েকটি মাধ্যমেই তা রসুলেপাক স. পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, তাদের ভুলের সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু মানুষ এ সকল হাদিসের উপর আমল না করে ফেকাহের বর্ণনা, যার বর্ণনাকারী কোনো কাযী বা মুফতী, যাদের লেখার বিষয়ে অবস্থা ও আদল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না, যে সব বর্ণনা দশ মাধ্যমে মুজতাহিদ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যাদের থেকে ভুল ও সঠিকতা উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে– মানুষ তার উপর আমল করতে উৎসাহবোধ করে। 'রব্বানা লা তুআখিজনা ইন্না সীনা আও আখত্ব'না'[৮] (হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা যদি ভুলে যাই, বা ভুল করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও কোরো না)।

৩৯. বিয়ে করা আম্বিয়া কেরামের সুন্নত। তবে এই জমানায় হালাল রিযিক দুষ্প্রাপ্য। জাহালতের (মূর্খতার) যুগে অধিকাংশের আওলাদ ফরজন্দ এলেম ও আদব থেকে উদাসীন। বিয়ের অনুষ্ঠানে বেদাত প্রচলনের মাধ্যমে অনেক ত্রুটি দেখা যায়। তাই সালেকগণের জন্য এ সকল কিছু বর্জন করা এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করাই উত্তম। স্বল্প জীবিকা গ্রহণ করা, মাওলার ইবাদতে মশগুল থাকা, লোকালয়ে বিখ্যাত না হওয়া, কোনো উত্তরাধিকার সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারী না রাখা এবং সন্দেহহীন সম্পদ রাখাই বুজুর্গী ও শরাফত (আভিজাত্য)। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে– 'ইন্না আগবাতা আওলিয়াই ইনদা লা মু'মিনুন খাফিফুল হাজি জুহাজ্জিন মিনাস্ সালাতি আহসানা ইবাদাতা রব্বিহী ওয়া ইত্বআতিহী ফিস্ সিররি ওয়া কানা ফিন্নাসি লা ইউশারু ইলাইহি বিল আসাবিয়া ওয়াকানা রিজকুহু কিফাফান ফা সাবারা আনা জালিকা ছুম্মা লাক্বাদা বিইয়াদিহী ফাক্বালা আজিলাত মানিয়াতুন ক্বাল্লাত বাওয়াকিহী কাল্লাতুরাছুহু'[৯]

(নবী করীম স. বলেছেন, আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে আমার নিকট সবার্ধিক প্রিয়ভাজন ওই মুমিন, যে কম সন্তানবিশিষ্ট, নামাজে যার অংশ আছে। যে গোপনে সুন্দর করে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য করে। সে মানুষের মধ্যে এমনভাবে গোপন থাকে যে, মানুষ আঙ্গুল দ্বারা তার দিকে ইশারাও করে না। তার রিজিক হয় প্রয়োজন অনুপাতে এবং সে তাতে ধৈর্যধারণ করে। অতঃপর রসুলে পাক স. স্বীয় হস্তদ্বয় যমীনের উপর মারার পর বললেন, এমন ব্যক্তির মৃত্যু সহজতর হবে। কেনোনা তার উপর ক্রন্দনকারী নারীদের সংখ্যা কম এবং তার রেখে যাওয়া সম্পদও কম)। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [১০] তিরমিযী ও ইবনে মাজা [১১]।

তথ্যপঞ্জি

১. জিকরে খফী ও জিকরে জলী সম্পর্কিত হজরত মাযহারের মকতুব নং ১১, এই গ্রন্থ।

২. এটি হচ্ছে শায়েখ আলাউদ্দৌলা সুমনানীর উক্তি, যা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি স্বীয় মাকতুব ২/2 তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মাআরেফে লাদুন্নিয়াতেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সুমনানীর উক্তি উল্লেখ করেছেন। মাবদা ও মাআদ কিতাবেও এই উক্তির বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৩. উক্তিটি এসমায়ীর। নফহাতুল ইয়ামান কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। রচয়িতা শায়েখ আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইয়ামনী শরওয়ানী।

৪. মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক গ্রন্থে হাদিস খানির উল্লেখ এরকম 'বুইছতু লিউতাম্মিমা হুস্নিল আখলাক' তবে মাদারেজুন্ নবুওয়াত গ্রন্থে শায়েখ আব্দুল হক র. "মাকারেমাল আখলাক" উল্লেখ করেছেন।

৫. আল কোরআন, সুরা রোম- ৩০/৩০।

৬. আল কোরআন, সুরা হাদীদ ৫৭/২৫।

৭. খাজা মোহাম্মদ পারসা, কুদ্দুসিয়া (মলফুজাতে হজরত খাজা নকশবন্দ)।

৮. আল কোরআন, সুরা বাকারা ২/২৮৬।

৯. তিরমিযী, ২/৬০।

১০. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৫/২৫২, ২৫৫।

১১. ইবনে মাজা।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

মির্জা মাযহারের নসিহতসমূহ যা তিনি তাঁর সাথী (মুরীদ) গণকে প্রদান করেছিলেন

মির্জা মাযহার জানে জানান তাঁর মুরিদগণকে নসিহত প্রদান করে বলতেন, তোমরা তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করো। একাগ্রচিত্তে হজরত মোস্তফা স. এর অনুসরণ করো। তোমরা তোমাদের হালসমূহ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসুল স. এর সম্মুখীন করো। যদি তা কিতাব ও সুন্নতের অনুকূলে হয়, তাহলে তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করো। আর যদি বিপরীত হয়, তাহলে তাকে পরিত্যাগ করো। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা অপরিহার্য করার পর হাদিস ও ফেকাহ এর এলেম হাসিল করো। আলেমগণের সোহবত গ্রহণ করে আখেরাতের ছওয়াব হাসিল করো। যদি সম্ভব হয়, তবে সব সময় হাদিসের উপর আমল করতে থাকো। অন্যথায় কখনও কখনও হাদিসের উপর আমল করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়ো। যেনো তার নূর থেকে বঞ্চিত না হতে হয়।

অন্তরকে দু'জাহানের উদ্দেশ্যসমূহ থেকে পবিত্র করে নাও। তোমার আমলই কী, যে তুমি তা বিক্রি করবে? কার ক্ষমতা আছে যে, সে তার আমলের প্রতি নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করবে? বাতেনী পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্জনতা অপরিহার্য। কেনোনা দরবেশীর উপকরণ হচ্ছে বাতেনী পরিচ্ছন্নতার উপস্থিতি। দুনিয়াবী উপকরণ খুব কম গ্রহণ করো। কেনোনা কিয়ামতের দিন এগুলোর হিসাব দিতে হবে। ইবাদত এবং জিকিরের আমল জারী রেখো। আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রেখো না। মাশায়েখে কেরামের ভালোবাসার বিষয়ে স্বীয় আকীদা সুদৃঢ় রাখো। কেনোনা আল্লাহ্‌র বন্ধুগণকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য লাভের কারণ হয়। স্বীয় পীরের উপস্থিতিতে অন্যের খেয়াল কোরো না। যখন পীরের সোহবত তোমার ভাগ্যে হবে, তখন কোনো নফল ইবাদত করবে না। যতদূর সম্ভব হয় সবর ও তাওয়াক্কুলের সাথে জীবন অতিবাহিত কোরো। গায়রুল্লাহর কল্পনা নিজের মন থেকে বের করে দাও। স্বীয় কর্ম আল্লাহ্‌তায়ালার উপর ন্যস্ত করো। মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, সত্য ওয়াদা মনে করে তাকে নির্জনতার উপকরণ মনে করো।

তোমার অন্তরে যদি দ্বন্দ্বের উদ্ভব না ঘটে, তাহলে নির্জনতা অবলম্বন করো। রিজিকের জন্য সময় নির্ধারিত আছে, তা সময় মতো নিজেই চলে আসবে। যদি পরিবার পরিজনের চিন্তা-ফিকির করো, তাহলে জীবিকা অর্জন করা আম্বিয়া কেরামের সুন্নত। নির্ধারিত জীবিকার উপর যদি নির্ভর না করা হয়, তাহলে তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।[১] ফকীর দরবেশগণের মূলধন হচ্ছে চিন্তামুক্ত এবং খাতিরজমা থাকা। কেনোনা তাঁদের চিন্তামুক্ত অন্তর মকসুদ (কাম্যবস্তু) এর অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং এরকম যেনো না হয় যে, খাতিরজমা অন্তর আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং তাওয়াজ্জোহ ও একাগ্রতায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে। অল্পেতুষ্টি গুণ গ্রহণ করো। লোভ-লালসা অন্তর থেকে বের করে দাও। বন্ধু-বান্ধব বা অপর কোনো ব্যক্তি থেকে নিরাশ হয়ে যাও। কোনো কিছু অর্জিত হওয়া বা না হওয়া উভয়কেই সমান মনে করো। কাউকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে নিম্নস্তরের এবং অপরাধী মনে করো। তালেবে মাওলার পথে অহংকারকে অন্তর থেকে এবং শ্রেষ্ঠত্বকে হাত থেকে ছেড়ে দেয়া উচিত। তরিকতের পথে বলা হয়, দেমাগের ভিতরে যা কিছু আছে, তা বের করে দাও, তোমার উপর যদি কোনো মুসিবত এসে পড়ে, তাহলে একটু নড়াচড়াও কোরো না– এই হচ্ছে দরবেশী। অতীতের কোনো কাজের এবং ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের আশংকা মন থেকে বের করে দাও। নিজের ইবাদত ও আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার কোরো না। স্বীয় ত্রুটি দর্শন এবং স্বীয় অস্তিত্বহীনতাকে উপকরণ বানাও। যতদূর সম্ভব নফসের বিরোধিতা করা উত্তম। তবে এতো বেশীও করা যাবে না, যাতে জীবনে স্থবিরতা এসে যায় এবং ইবাদতের আনন্দ উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কখনও কখনও নফসের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত। কেনোনা মুমিন ব্যক্তির নফসের সন্তুষ্টিও ছওয়াবের কারণ হতে পারে।

একবার আমার নফস কোনো এক বিশেষ খাবার খাওয়ার জন্য আরজু করলো। কিন্তু তখন সেখানে এমন কেউ উপস্থিত ছিলো না যে, আমি আমার নফসের বাসনাটি তার কাছে প্রকাশ করতে পারি। কিছুদিন পর আমার নফস আবার সেই খাদ্যটি খাওয়ার আবেদন করলো। তখন সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আমার হুকুম মতো খাবার প্রস্তুত করলো। লোকটির এমন একটি সমস্যা ছিলো যা দূর হচ্ছিলো না। কিন্তু কাজটি করার পর তার সমস্যাটি দূর হয়ে গেলো।

শুকুরগোজারী করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো উপাদেয় আহার্য প্রস্তুত করা হয়, তাহলে তা উত্তম হবে। কেনোনা আস্বাদবিবর্জিত আহার্য ভক্ষণ করলে মন থেকে শুকরিয়া আসে না। কোনো সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে যদি অ-সুস্বাদু পানি সরবরাহ করা হয়, তাহলে নেয়ামতে এলাহীকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করার শামিল হয়ে যায়। রসুলেপাক স. আকর্ষণীয় খাবার গ্রহণ করতেন। আকর্ষণবোধ না করলে সে খাবার তিনি খেতেন না।

আমাদের নফস তো হজরত জুনায়েদ বাগদাদী বা শিবলীর নফসের মতো হয়নি যে, তিক্ত খাবারকেও মিষ্টি মনে করে বলবে, নাক মুখ উঁচু করা ব্যতীত তিক্ত বস্তু পান করার নামই সবর।

ওই শুকরিয়া, যা শুধু জবান দ্বারা আদায় করা হয়, তাও সবরের একটি প্রকার যার আছর রূহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আউলিয়া কেরামের মাজার জিয়ারতকে ফয়েজ ও খাতিরজমা লাভের দরজা বানাও। মাশায়েখে কেরামের পবিত্র রূহসমূহের উপর ফাতেহা ও দরূদের মাধ্যমে ছওয়াব রেছানী করে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁদেরকে ওসিলা বানাও। কেনোনা এই কাজের মাধ্যমে জাহেরী ও বাতেনী সৌভাগ্য হাসিল হয়। তবে তরিকতের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কলবের সাফায়ী অর্জন ব্যতীত আউলিয়া কেরামের কবর থেকে ফয়েজ হাসিল করা মুশকিলই বটে। তাই হজরত খাজা নকশবন্দ র. বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে নিয়োজিত থাকা আউলিয়া কেরামের কবরের পাশে অবস্থান করা থেকে উত্তম। কবরস্থানে সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জা করার যে অপসংস্কার রয়েছে, তা সাধারণতঃ উপকারী হয় না। কেনোনা এ সকল কাজ করতে গেলে তাঁবু বিছানার প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া লোকজনের ভীড়ের কারণে তরতীব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কাজেই প্রয়োজন পূরণার্থীগণ গোপনে আর্থিক সাহায্য করার মাধ্যমেই দ্রুত ছওয়াব পেতে পারেন।

তথ্যপঞ্জি

১. অর্থাৎ নির্ধারিত আমদানীকেই দায়েমী রিজিক মনে করা যাবে না। বরং তাকে সাময়িক রিজিকের মাধ্যম মনে করতে হবে।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

মির্জা মাযহারের স্বপ্ন এবং তাঁর বর্ণনায় আউলিয়া কেরামের হালসমূহ

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. বলেছেন, আমার কয়েকবার রসুলেপাক স. এর জিয়ারত লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। যার ফলে আমার হালের মধ্যে তাঁর অনুগ্রহ আমি লক্ষ্য করেছি। সর্বশেষে রসুলেপাক স. এর জিয়ারতের যে সৌভাগ্য লাভ করেছি, তাতে দেখতে পেলাম, তিনি একটি হাতীর উপরে আরোহণ করে আছেন। অতঃপর অবতরণ করলেন। বললেন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলাই এসো। আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বুঝতে পারিনি।

তিনি আরও বলেছেন, একবার আমার রসুলেপাক স. এর জিয়ারত নসীব হলো। দেখলাম, আমি নিজেকে তাঁর পবিত্র শরীরের সাথে জড়িয়ে রেখেছি। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম। এমন সময় আমার পানির পিপাসা পেলো। সেরহিন্দ শরীফের সাহেবজাদাগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রসুলেপাক স. তাঁদের একজনকে পানি আনতে বললেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল ! তিনি তো আমার পীরজাদা। তিনি স. বললেন, সে তো আমার নির্দেশ পালন করছে। তাঁদের একজন পানি এনে দিলেন। আমি পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলাম। নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি স. বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে তার মতো আর কে আছে? আমি বললাম, তাঁর মকতুবাত কি আপনার দৃষ্টি অতিক্রম করেছে? তিনি স. বললেন, যদি তোমার কিছু স্মরণ থাকে তাহলে আমাকে শোনাও। আমি তাঁর একটি মকতুব[১] থেকে এই বাক্যটি পাঠ করলাম– 'সুবহানাহু তায়া'লা ওয়ারাআল ওয়ারাই ছুম্মা ওয়ারাআল ওয়ারাই' (জ্ঞান ও অনুভূতি যে পর্যন্ত পৌঁছে, আল্লাহ্‌তায়ালার জাতে পাক তার পরে, বরং তারও আরও পরে)। তিনি এই বাক্যটি খুব পছন্দ করলেন এবং আপ্লুত হয়ে বললেন, আবার পড়ো। আমি পুনরায় বাক্যটি পাঠ করলাম। তিনি স. আরও বেশী প্রশংসা করলেন। এই মোবারক সোহবতের হাল দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বিরাজ করেছিলো। সকাল বেলা এক বন্ধু এসে বললেন, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি, আপনি খুবই সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নটি কী? আমি তাঁর কাছে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে বললাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

মির্জা মাযহার বলেন, রসুলেপাক স. এর পবিত্র নিশ্বাস এবং তাঁর মহান সাহচর্যের বরকতে আমি আমার আপাদমস্তকে নূর এবং হুজুরী অনুভব করি। এই

স্বপ্নের কাইফিয়ত যা জাগ্রত অবস্থার চেয়েও উত্তম, তার বরকতে কয়েকদিন পর্যন্ত আমি ছিলাম ক্ষুৎপিপাসার অনুভূতিরহিত।

তিনি আরও বলেছেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, মরুভূমি এলাকার একটি বিশাল মাঠে অনেক ওলিআল্লাহ্ মোরাকাবায় বসে আছেন। হালকার মধ্যে খাজা নকশবন্দ এবং হজরত জুনায়েদ বাগদাদীও মাথা নিচু করে বসে আছেন। হজরত জুনায়েদ বাগদাদীর উপর গায়রুল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষিতা এবং ফানার হাল বিদ্যমান ছিলো। অতঃপর সেখান থেকে সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিলেন, হজরত আমীরুল মুমিনীন আলী রা. কে স্বাগতম জানাতে। কিছুক্ষণ পর আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আপাদমস্তক তালিযুক্ত কাপড় পরিহিত, খালি পা ও আলু-থালু চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি। হজরত আলী পূর্ণ বিনয় ও সম্মানের সাথে তাঁর হাত ধরে রেখেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? একজন উত্তরে বললেন, খাইরুত্তাবেয়ীন হজরত ওয়ায়েস কুরনী র.। সেখানে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আলোকিত হুজরা শরীফ দেখতে পেলাম। সেখানকার হজরতগণ হুজরা শরীফে এসে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? কেউ একজন বললেন, আজ গাউছুল আজমের উরস। যাচ্ছেন তাতে অংশগ্রহণ করতে।

তিনি বলেছেন, সালেকের বাতেনের নেসবতে যখন ফানা প্রকাশ পায় তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও নিমজ্জন ঘটে। সে তখন কাশফ বা স্বপ্নে নিজেকে মৃত বলে দেখতে পায়। বিস্মৃতি ও অনুভূতিহীনতা তার হালের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। তিনি বলেন, হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে যখন আমার কলবের ফানা হাসিল হলো এবং দুনিয়াবী সম্পর্কেও আগ্রহ মিটে গেলো, তখন আমি দেখলাম, আমার শরীরটি মস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মুখে কলেমা তাইয়্যেবা জারী আছে। আমি আরও দেখতে পেলাম, আমার মৃত্যু হয়েছে। লোকেরা আমার কাফনের কাজে ব্যস্ত। আমার লাশ হজরত খাজা কুতুবউদ্দীনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাফনের উদ্দেশ্যে। আমার রূহও লাশের সঙ্গে যাত্রা করেছে। এমনকি লাশ কবরে রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। আমি কবরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। হাদিস শরীফে যেরকম উদ্ধৃত হয়েছে, মুনকির নকীর ফেরেশতাদ্বয় সে রকমভাবে আমার কবরে এসে তাদের দাঁতসমূহ কবরের মাটিতে ঘর্ষণের পর কবরের ভিতরে প্রবেশ করেছে। এরপর আমার দেহ ও রূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তারা সওয়াল জওয়াব করে চলে গেলো এবং আমি কবরের মধ্যে আরামের সাথে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আরেকদিন দেখি, আমার ইনতেকাল হয়ে গিয়েছে। লোকেরা কাফন পরানোর পর আমার লাশ ওঠাতে চাইলো। হঠাৎ করে আমার লাশ হাওয়ায় উড়ে গেলো।

লোকেরা তার পিছনে পিছনে রওয়ানা দিলো। আমার রূহও তার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলো। তখন আমার এই চতুর্পদী কবিতাটি মনে পড়ে গেলো।

মাযহারে চাকাবিশে চশ্‌মে গুশি নশভী
সরমায়া জুসী ওয়া খুব্‌শী নশভী
বাইয়াদকে বপায়ে খুদ রবিতাছেরগুর
আয়ে জাওহারে পাক বারদূশী নশভী

(হে মাযহার! চোখ এবং কানের জন্য বিভ্রান্ত হয়ো না। জোশ ও উত্তেজনার উপকরণ হয়ো না। তোমার উচিত পা দ্বারা হেঁটে কবরে যাওয়া। হে পবিত্র জাওহার (মূল বস্তু অর্থাৎ আত্মা)! তুমি কারও জন্য বোঝা হয়ো না)।

তিনি বলেছেন, আমীরুল মুমিনীন হজরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি এই ফকীরের বিশেষ মহব্বত ছিলো। আর তিনি ছিলেন নকশ্‌বন্দিয়া আলীয়া তরিকার মস্তক তুল্য। মানবীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বাতেনের নেসবতে যদি কখনও কোনো আবরণ পড়ে যেতো, তখন আামি আপনাআপনি হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এর প্রতি রুজু করতাম। তখন তাঁর দৃষ্টিপাতের ওসিলায় আমার সেই ময়লা দূর হয়ে যেতো। একবার আমি তাঁর শানে একটি কাসীদা পড়লাম। তিনি আমার হালের প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানি করলেন। বিনয়বশতঃ বললেন, 'আমি এ প্রশংসার যোগ্য নই।' মির্জা মাযহার আরও বলেছেন, আমার নসব (বংশধারা) আমীরুল মুমিনীন হজরত আলী পর্যন্ত, বিধায় তাঁর খেদমতে আমার নেয়ামত হাসিল ছিলো। শারীরিক কোনো সমস্যার কালে আমি তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতাম এবং নিরাময় লাভ করতাম। একবার আমি তাঁর খেদমতে একটি কাসীদা পাঠ করেছিলাম, যার প্রথম পঙক্তি ছিলো এরকম–

ফরুগে চশমে আগাহি আমীরুল মু'মিনীন হায়দার
তরঙ্গশত ইয়াদুল্লাহি আমীরুল মু'মিনীনা হায়দার

(আমীরুল মুমিনীন আলী, হুঁশিয়ার চক্ষুর জ্যোতি। সুতরাং তোমার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র হাত (রহমত) হবেন না কেনো)?

তিনি খুশি হয়ে আমার প্রতি অনেক দয়া করলেন। তিনি বলতেন, আহলে বাইতগণের প্রতি মহব্বত ইমানের কারণ এবং বিশ্বাস ও একীনের উপকরণ। আমাদের জন্য তো তাঁদেরকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো আমল ও নাজাতের ওসীলা নেই। তখন তিনি তাঁর পবিত্র মুখে এই শেরটি পাঠ করেছিলেন–

না করদ মাযহার মাত্বআতি ও রফত বখাক
নাজাতে খুদ বতুলায়ে গু তুরাবে গুজাশত্‌

(আমাদের মাযহার বন্দেগী না করে কবরে চলে গেছে। তবে হজরত আলীর প্রতি ভালোবাসা তার নাজাতের ওসীলা সাব্যস্ত করেছে)।

মির্জা মাযহার র. আরও বলেছেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর মারেফতসমূহ কিতাব ও সুন্নতের অনুকূলে ছিলো। যে সকল মাকামের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তিনি তার জবাব নিজেই লিখে গিয়েছেন, যা ইনসাফকারীগণের নিকট যথেষ্ট।[২] তরিকতের পরিভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে, যে বিষয়ে জাহেরী আলেমগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। এ জাতীয় শব্দের ব্যাখ্যা হালের প্রাবল্যের ভিত্তিতে করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। অথবা আল্লাহ্‌পাকের হুকুম ছাড়াও এগুলোর অর্থ প্রকাশ করা যাবে না। হজরত মোজাদ্দেদ র. এর কালাম থেকেও তা সুসাব্যস্ত।

শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী র. তাঁর হালের প্রথম দিকে মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর কোনো কোনো মারেফতের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।[৩] কিন্তু শেষ দিকে প্রশ্নপ্রবণতা থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে খাজা বাকী বিল্লাহ র.এর খলীফা খাজা হোসামউদ্দীনের[৪] কাছে লিখেছিলেন, এ মুহূর্তে মিয়া শায়েখ আহমদ সাল্লামাহুল্লাহ সম্পর্কে আমার ধারণা যা পরিষ্কার হয়েছে, তা সীমাহীন। মূলতঃ বাশারিয়াতের পর্দা এবং সৃষ্টিগত আবরণ এখন অপসৃত। তরিকত ও ইনসাফের লক্ষ্য এবং বিবেকের বিধান ও সকল প্রিয় বুজুর্গগণের ব্যাপারে কখনও মন্দ হতে পারে না। যওক, বিজদান (আত্মিক প্রাপ্তি) ও হালের প্রাবল্যের কারণে এমন কিছু এ সব বুজুর্গগণের বাতেন জগতে পতিত হয়, যা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। পবিত্র ওই সত্তা যিনি অন্তর্জগতে পরিবর্তন আনয়ন করেন এবং হালের পরিবর্তন এনে দেন। সম্ভবতঃ আহলে জাহেরগণ তা থেকে দূরে থাকবেন। আমি তো জানি না হাল কী এবং তা কোন পথে[৫]।

এই পুস্তকের লেখক শাহ গোলাম আলী বলেন, শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী যে বলেছেন, 'মানবীয় পর্দা ও অন্তরায় এখন অপসৃত' এ কথার ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম– তিনি যে মোজাদ্দেদ র. এর মারেফতের পরিভাষার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তা নফসানিয়াতের কারণে ছিলো না। ছিলো সত্য ও ইনসাফের মানদণ্ডের ভিত্তিতে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা ও সত্যাসত্য নির্ণয় করা ছাড়া প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাঁদের অবস্থাও তথৈবচ। তাঁর কালাম যদি ইনসাফের সাথে পাঠ করা হয়, তাহলে কোনো প্রশ্নের উদয় হয় না। শায়েখ আব্দুল হক র. তাঁর পুস্তিকা 'এতেরাযাত' এর শেষে লিখেছেন, আমি আপনার বিষয়ে যে সমস্ত মারেফত ও মাকাম সম্পর্কে লিখেছি, তা আমলে হক

নাকি কেবলমাত্র বাগাড়ম্বর? এ বিষয়ে আলেমুল গায়েবের প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বাতেন জগতে এই আয়াতে করীমা এলকা হলো– 'ওয়া ইনইয়াকুন কাযিবান ফা আ'লাইহি কাযিবুহু'[৬] (সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা তার উপরই পতিত হবে)। প্রকাশ থাকে যে, এই আয়াত ফেরআউন ও তার অনুসারীদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং হজরত মুসা আ. এর সত্যতা সাব্যস্ত করণার্থে অবতীর্ণ হয়েছিলো। সুতরাং শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী যে মোজাদ্দেদে আলফেসানির উপর প্রশ্ন আরোপ করেছিলেন, তা থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং তাঁর বাতেন জগতে যে আয়াতে করীমা এলকা হয়েছিলো, এ সকল কিছু প্রমাণ করে যে, তাঁর উপর শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর উত্থাপিত প্রশ্ন দূর হয়ে গিয়েছিলো।[৭]

মির্জা মাযহার বলেছেন, বাদশাহের তরফ থেকে[৮] হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. যে কষ্ট পেয়েছেন, তা আম্বিয়া কেরামের পূর্ণ অনুসরণেরই প্রমাণ। হজরত ইউসুফ আ. কয়েদখানায় এতেকাফ করেছিলেন। আর হজরত সাইয়্যেদুল মুরসালীন স. হেরা গুহায় নির্জনতা গ্রহণ করেছিলেন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির বিষয়ে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিলো এবং যে সকল সন্দেহের অবতারণা হয়েছিলো, সে সব খণ্ডন করার জন্য তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তগণ বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছেন।[৯] এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তিকা রচনা করেছেন[১০] মির্জা মোহাম্মদ বেগ বদখশী।[১১] যা মক্কা শরীফে রচনা করা হয়েছিলো। ওই পুস্তিকায় চার মাযহাবের মুফতীগণের প্রামাণিক স্বাক্ষর রয়েছে।

তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার ফয়েজ সীমাহীন। প্রত্যেক ওলীর উপরে তাঁর যোগ্যতা অনুসারে তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর পূর্ণ হেকমত অনুসারে শেষ যুগের ওলীগণের মধ্যে এমন সব পূর্ণতা দান করেছেন, যা পূর্ববর্তীগণ পেয়েছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। নবীগণ একে অপরের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তেমনই ওলীগণও একে অপরের উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। এসব মাকামের কারণে মোজাদ্দেদে আলফেসানির বিশেষত্ব রয়েছে। তাঁর তরিকার বহু উপকার লাভকারীগণ এ সমস্ত স্তর ও হাল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁরা এ সকল এলেম ও কাইফিয়তের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুতরাং এই তরিকার মাকামসমূহের নেসবতের বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। কেনোনা মোতাওয়াতির (ধারাবাহিক) এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত সংবাদ– সত্যতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য উপকারী। যারা ওই সকল মাকামে

পৌঁছতে সক্ষম হননি, তাঁরাই তা মেনে নেননি। সে জন্য সে ব্যক্তি তার মূর্খতার কারণে মাযুর। সর্বোচ্চ কামালাতের জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া শর্ত নয়। রসুলেপাক স. এর আসহাবে কেরাম এমন উচ্চতর মাকামে পৌঁছেছিলেন, যেখানে কোনো ওলীর পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়। তৎসত্ত্বেও অলৌকিক ঘটনা, যওক–শওকের নেসবত, জযবা এবং এস্তেগ্রাক (নিমজ্জিত থাকা) তাঁদের মধ্যে তেমন প্রকাশিত হয়নি।

এক ব্যক্তি একবার হজরত মির্জা মাযহারের নিকট জিজ্ঞেস করলো, হজরত বড়পীর সাহেব এবং হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মধ্যে কে উত্তম? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জনই আমার পীর এবং পথপ্রদর্শক। তাঁরা দু'জনই আল্লাহ্‌র রহমতের বৃষ্টি, যা আমার উপর বর্ষিত হয়। তবে আমার পথপ্রদর্শনের জন্য একজনই যথেষ্ট। আমি জানি না আকাশের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী কে?

মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর পীর হজরত হাফেজ মোহাম্মদ মহসিন ফায়দা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমার বুজুর্গগণ আমার বুজুর্গগণকে অস্বীকার করতেন। এখন তুমি কি অস্বীকার করার জন্য এসেছো? নাকি স্বীকার করার জন্য?[১২] হাফেজ মোহাম্মদ মহসিন বলেছিলেন, ওই অস্বীকারের ওজরখাহী করার জন্য এসেছি। তারপর হাফেজ সাহেব তাঁর সোহবত গ্রহণ করে কামেলে ও মোকাম্মেলের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

এই কিতাবের লেখক হজরত শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী বলছেন, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির পক্ষ থেকে নিস্পত্তিকারী হজরত শায়েখ মোহাম্মদ ফরখ[১৩] যিনি অধিক আমলকারী একজন আলেম ছিলেন– তিনি হজ করতে গিয়েছিলেন। তখন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বরজঞ্জী[১৪] যিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির কঠোর সমালোচনা করতেন, তিনি শায়েখ মোহাম্মদ ফরখকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে আসতে চাইলেন। তিনি তখন দোয়া করলেন, ইয়া এলাহী। আমি আজমী ব্যক্তি। আর তিনি হচ্ছেন আরবী। হেরেম শরীফে বাকবিতণ্ডা করাও সমীচীন নয়। তুমি আমাকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। তাঁর দোয়া কবুল হলো এবং সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বরজঞ্জী কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি তখন হজরত রসুল করীম স. এর রওজাশরীফ জিয়ারত করার পর হিন্দুস্তানের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন তিনি জাহাজে আরোহণ করলেন, তখন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বরজঞ্জী সুস্থ হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে আসতে লাগলেন। তিনি একটি ছোট নৌকায় চড়ে আসছিলেন। উদ্দেশ্য, জাহাজে বসে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির মারেফতের বিষয়াদী নিয়ে বহছ করবেন।

শায়েখ মোহাম্মদ ফরখ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। হঠাৎ নৌকাটি সাগরে ডুবে গেলো এবং আওলিয়াগণের অস্বীকারকারী ও সমালোচনাকারী তার কৃতকর্মের সাজা পেলো।

মির্জা মাযহার বলেছেন, শায়েখ আব্দুল আহাদ তাঁর পিতা এবং চাচা[১৫] উভয়ের কাছ থেকেই ফায়দা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওই দু'জনের নেসবতকেই সমান মনে করতেন। খাজা মোহাম্মদ সাঈদ ও খাজা মোহাম্মদ মাসুম উভয়ের নেসবতকে তিনি কোনো ফরক করতেন না। বলতেন, আমার দৃষ্টিতে তাঁরা দুজনেই সমান। যেমন ইমামে তসবীহ'র সঙ্গে দু'টি সাক্ষী দানা থাকে। মির্জা মাযহার বলেন, তবে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে ওই দু'জনের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা দান করেছেন। খাজা মোহাম্মদ সাঈদের নেসবতের মধ্যে বেশী আছে আত্মবিস্মৃতি ও নিরবতা– যা খিল্লতের মাকামের উপযোগী। আর খাজা মোহাম্মদ মাসুমের নেসবতে বেশী আছে পরিচ্ছন্নতা এবং চাকচিক্য, যা মাহবুবিয়াতের মাকামের উপযোগী। নেসবতে সাঈদীতে কামালতে নবুওয়াত মাকাম ও অন্যান্য মাকামের শক্তি বেশী। আর নেসবতে মাসুমীতে বেলায়েতের শক্তি বেশী। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির বিশেষ মাকামসমূহ ছাড়া অন্য কোনো কিছু এ দুই সাহেবজাদার মধ্যে ছিলো না।

মির্জা মাযহার বলেছেন, প্রথম দিকে আমি তালেবগণকে তওবার শিক্ষা এভাবে দিতাম, যাতে তওবায়ে নসুহার মতো তাকিদ থাকতো। একরাতে আমি আমার শায়েখকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার হালের প্রতি মেহেরবানি করলেন। সেখানে এক কাওয়ালী গায়ক ছিলো। তিনি তার প্রতিও তাওয়াজ্জোহ দিলেন। তখন তার মধ্যে এক আজীব হাল হলো। সে তার কাজটি ছেড়ে দিলো এবং শরীয়তবিরোধী কার্যসমূহ থেকে তওবা করলো। তখন আমার শায়েখ আমাকে বলতে লাগলেন, তওবার তরীকা এমন হওয়া উচিত। তালেবের বাতেন জগতে যখন নেসবত প্রবল হবে, তখন সে তার কাজ নিজেই স্বত:স্ফুর্তভাবে করবে। সে দিন থেকে আমি তওবার বিষয়ে কঠোরতা করা থেকে বিরত হলাম। তওবায়ে মুজমালই (সংক্ষিপ্ত তওবা) যথেষ্ট। এরপর তওবায়ে নসুহা কোনো এক বিশেষ সময়ে হাসিল হয়ে যায়।

মির্জা মাযহার বলেছেন, বুদ্ধিমানদের একদল লোক আমাকে প্রশ্ন করলো, নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে এমন কি মর্যাদা দেখলেন যে, অন্যান্য তরিকা বাদ দিয়ে আপনি এই তরিকা গ্রহণ করলেন? আমি বললাম, এ তরিকা কিতাব ও সুন্নতের দ্বারা সাজানো, যার অকাট্য প্রমাণ আছে। কিতাব ও সুন্নত যেহেতু অকাট্য, কাজেই তার দ্বারা সাব্যস্ত এই তরিকাও অকাট্য। এ তরিকার ওজিফাসমূহের ওসিলায় সুন্নত অনুসরণ করার তৌফিক লাভ হয়। শরীয়ত পালন করার ফলে এ তরিকার নূর বৃদ্ধি পায়।

একবার শয়তান এক কাঠ মোল্লার সুরত ধরে এসে আমাকে বললো, আপনার মেজাজে তো এশকের প্রাধান্য আছে। আপনার স্বভাব প্রেমের কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট। তা সত্ত্বেও আপনি কাইফিয়তবিহীন তরিকা কেনো গ্রহণ করেছেন? যার মধ্যে সেমার কোনো দখল নেই, উচ্চ স্বরে জিকির করারও কোনো বিধান নেই। আমি বললাম, আকীদা এবং মহব্বত জনাব বারীতাআলার পূর্ণ হেকমতের চাহিদা অনুসারে হয়ে থাকে। সে বললো, তা তো কেবল মজবুরীর আলামত। তার এ ধরনের বেপরোয়া প্রশ্নের কারণে আমি রাগান্বিত হলাম এবং তার দাড়ি ধরে প্রহার করতে উদ্যত হলাম। অকস্মাৎ সে গায়েব হয়ে গেলো।

মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত সাঈয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর পীর হজরত শায়েখ সাইফুদ্দীন সেরহিন্দী র. এক রাতে তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠলেন। তখন কোনো এক স্থান থেকে তাঁর কানে বাঁশির আওয়াজ ভেসে এলো। তিনি অস্থির হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাতে তাঁর হাতে আঘাত পেলেন। বলতে লাগলেন, লোকেরা আমাকে দরদহীন বলে। দরদহীন তো ওই ব্যক্তি, সেমা যার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন, এই তরিকার এক বুজুর্গ কোনো এক স্থানে যাচ্ছিলেন। তাঁর কানের মধ্যে সেমার আওয়াজ এলো। সহ্য করতে না পেরে তিনি সেখানে বসে পড়লেন। অন্তর্জ্বালা দমন করলেন। কিন্তু অন্তর্জ্বালার অগ্নি তাঁকে রেহাই দিলো না। গরমের চোটে তাঁর মাথার খুলি বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, সেমা ধ্বংসাত্মক কাজ, তাই তাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।[১৬]

তিনি আরও বলেছেন, হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর পীর হজরত শায়েখ সাইফুদ্দীনের খানকায় প্রতিদিন চার শত[১৭] ফকীর দরবেশ ফায়দা গ্রহণার্থে জমা হতেন। হজরত শায়েখ সাইফুদ্দীন তাদের প্রত্যেকের ফরমাইশ মোতাবেক ভিন্ন ভিন্ন খানা প্রস্তুত করাতেন। এরকম নাজ ও নেয়ামত থাকা সত্ত্বেও তাঁর সালেকগণ সমুচ্চ মাকামসমূহ অর্জন করতেন। কেনোনা এই তরিকার ভিত্তি মোর্শেদের হিম্মত ও তাওয়াজ্জোহের উপর। এই তরিকার এক ব্যক্তি তার আহার কমিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলো। তখন তার পীর বললেন, এই তরিকার ফয়েজ হাসিল করার জন্য এ ধরনের আমলের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেনোনা আমাদের বুজুর্গগণ এই কাজের ভিত্তি সার্বক্ষণিকভাবে কলবের চৈতন্য এবং মোর্শেদের সোহবতের উপর নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মকসুদ হাসিল হয় সার্বক্ষণিক জিকির, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, সুন্নতের অনুসরণ এবং নূর ও বরকতের আধিক্যের দ্বারা। বাহ্যিক দর্শনকারী সর্বসাধারণ নজর করে অলৌকিকতা দর্শনের প্রতি। কিন্তু খাস ব্যক্তিগণ, যাঁরা হাকীকতের বিষয়ে

সচেতন, তাঁদের দৃষ্টি থাকে কেবল কলবের সাফায়ী এবং আল্লাহ্‌র সাথে নেসবতের প্রতি। মির্জা মাযহার বলেছেন, হজরত হাফেজ সাদুল্লাহর পীর হজরত সিদ্দীক একবার বড়পীর সাহেবের বংশধরদের মধ্য থেকে এক সাহেবজাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তিনি সাহেবজাদা হওয়ার কারণে এবং বাহ্যিক চাকচিক্যের অহংকারে তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাড়াননি। এতে করে তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ এহেন বেআদবীতে নাখোশ হলেন। তাঁরা তাঁদের অসন্তুষ্টির বিষয়ে হজরত সিদ্দীককে অবহিত করলেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে না দিয়ে তাঁর নিজস্ব হিম্মত কাজে লাগালেন এবং তাঁর ওই হিম্মতের জোরে উক্ত সাহেবজাদা নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তাঁর অবস্থা ভালো হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর প্রিয়জনগণ এ তরিকা পছন্দ করতে পারলো না। তারা বললো, আপনি আপনার পিতা-পিতামহগণের তরিকা ছেড়ে দিয়ে অন্যদের তরিকা গ্রহণ করলেন কেনো? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কাদেরীও নন চিশতীও নন। আমি যেখানে আমার মকসুদ দেখতে পেয়েছি সেখানে পৌঁছে গিয়েছি।

তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরকম– হজরত হাফেজ মোহাম্মদ সিদ্দীকের জানাযা দাফনের উদ্দেশ্যে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সেরহিন্দে। পথিমধ্যে আজানের সময় হলো। তখন তাঁর জানাযার ভিতর থেকে আজানের জবাব শোনা গেলো।

তিনি আরেকটি ঘটনা বলেছেন এভাবে– একবার এক বেআদব মহিলা হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদকে গালমন্দ করলো। তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন। তখন মনে হলো তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার রোষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি তখন সেখানে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে বললেন, ওকে একটি থাপ্পড় মারো। লোকেরা থাপ্পড় মারতে ইতস্ততঃ করলো। হঠাৎ মহিলাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পরক্ষণেই মৃত্যুবরণ করলো। তিনি তখন ইতস্ত তঃকারীদেরকে তিরস্কার করে বললেন, এই মেয়েটির রক্ত তোমাদের গর্দানের উপর। যদি আমার নির্দেশের উপর আমল করা হতো, তাহলে সে এভাবে মরতো না। মির্জা মাযহার এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, মাশায়েখগণের হুকুম বিনা দ্বিধায় পালন করা উচিত। তার মধ্যে অনেক হেকমত লুক্কায়িত থাকে।

মির্জা মাযহার আরো বলেছেন, শাহ্ গোলশান হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদের অন্যতম খলিফা ছিলেন। তিনি পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততার অধিকারী এবং কঠোর সাধক ছিলেন। বলা যায়, হজরত জুনায়দ বাগদাদীর খানকার সালেকগণও তাঁর দরবারের প্রতি ঈর্ষা করতে পারে। তিনি বলেছেন, তিনদিন পর আমার ক্ষুধার উদ্রেক হতো। তীব্র ক্ষুধা অনুভব করলে গাছের পাতা, খিরা ও খরবুজার খোসা

পানিতে সিদ্ধ করে খেয়ে নিতাম। তিনি একটি পুরাতন তালি দেয়া জামা তিরিশ বছর পর্যন্ত পরিধান করেছিলেন। একদিন তিনি রোজা রেখে ইফতার করার জন্য গরমের তীব্রতা লাঘবের উদ্দেশ্যে হাউজের পানি চাইলেন। সেখানকার কেউ একজন বললো, এখানে একটি কূপ আছে, যার পানি ঠাণ্ডা ও মিষ্টি। তিনি বললেন, আমি কতো বছর যাবত এই মসজিদে আছি! কখনও আমার খেয়ালেই আসেনি যে, এখানে একটি কূপ আছে। তীব্র গরমের সময় এই হাউজের পানিই পান করেছি।

একবার এক লোক দীনার ভর্তি একটি থলে এনে হাদিয়া স্বরূপ তাঁকে দান করলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার উপর হজ্ব ফরজ হয়ে গিয়েছে। তারপর এক মুহূর্তও অতিবাহিত হলো না। ফিরে এসে তিনি বললেন, একজন ভিখারী এসে আমার কাছে সওয়াল করেছিলো। আমি তাকে থলেটি দান করে ফেলেছি। কাজেই হজ্ব ফরজ হওয়ার দায়িত্ব আমার উপরে আর নেই। একবার তিনি জাকাত আদায় করতে চাইলেন। কেনোনা প্রত্যেক ফরজ আদায়ের মাধ্যমে বিশেষ নৈকট্য হাসিল হয়ে থাকে। জাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে মাল ক্রয় করতে লাগলেন। মালের নেসাব যখন পুরো হয়ে গেলো, তখন তিনি জাকাত ও নেসাব উভয়ই আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলেন। কেনোনা মকসুদ যখন হাসিল হয়ে গেলো, তখন ওই মাল আর কী কাজে আসবে? ফকীর দরবেশদের খাজানা তো কেবল আল্লাহ্র দরবার।

তিনি বলেছেন, একদা মাদারিয়া সিলসিলার[১৮] কতিপয় ফকীর নাচানাচি ও আনন্দ করছিলো। সেখানে দাঁড়িয়ে যারা তামাশা দেখছিলো, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির মনে এই খেয়াল জাগলো যে, এই বেদাতীদের মধ্যেও কি কোনো কামেল ব্যক্তি থাকতে পারে? তখন সেই ফকীরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো—

খাকছারানে জাঁহারাব হেকারত মুঙ্গের
তু চে দানী কে দরীঁইঁ কর্দ চওয়ারী বাশাদ

(এ দুনিয়ার অধমদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখো না। তোমার কি সবকিছু জানা আছে? এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো ছওয়ারীও তো থাকতে পারে)।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, কাউকে অস্বীকার করা উচিত নয়। কেনোনা হতে পারে, এই সুরতের মধ্যে হাকীকতের তাৎপর্য উদ্ভাসিত হচ্ছে)।

তিনি বলেছেন, নওয়াব মোকাররম খান[১৯] খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. থেকে বাতেনী কামালাতের ফায়দা হাসিল করেছিলেন। একদিন তাঁকে বাদশাহ্

আলমগীর প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স কতো? তিনি উত্তর দিলেন, চার বছর। জীবনের যে সময়গুলো আমি আমার পীরের খেদমতে অতিবাহিত করেছি, তাই আমার বয়স। বাকী সময়গুলো শুধুই আখেরাতের ঝন্ঝাট।

আওকাতে হাঁমা বুদ কে বা ইয়ারে বছর ওয়াকত
বাকীহামা বে হাসেল ওরেব খবরী বুদ।

(উত্তম সময় ছিলো, যা আমার বন্ধুর সাহচর্যে অতিবাহিত হয়েছে। তাছাড়া সমস্ত সময়ই অর্জনহীন এবং তত্ত্ববিহীন)।

তিনি বলেছেন, নওয়াব মোকাররম খান তাঁর খানাপিনার ব্যাপারে এতো অধিক আড়ম্বর করতেন যে, মনে হতো তিনি অপব্যয় করছেন। কিন্তু নওয়াব সাহেবের সতর্কতা ও তাকওয়ার কারণে খাজা মোহাম্মদ মাসুম র.[২০] তাঁর খানা গ্রহণ করতেন। বলতেন, তাঁর খানার বরকতে বাতেন জগতে এতোই নূর বৃদ্ধি পায় যে, মনে হয় খানা খাওয়াই হয়নি।

হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের প্রতি তাঁর মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে তাঁর সবকিছুই নূরানী হয়ে গিয়েছিলো। একথা বলে তিনি শোকরানা স্বরূপ দু'রাকাত নামাজ আদায় করেছিলেন।

আয মহব্বত মছহাযারীন শোওয়াদ
আয মহব্বত তলখেহা শিরীন শোওয়াদ
আয মহব্বত রেকে হামেল মী শোওয়াদ
আয মহব্বত খারে হাগোল মী শোওয়াদ।

(মহব্বতের কারণে তামা স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়। মহব্বত তিক্ত জিনিসকে মিষ্টি বানিয়ে দেয়। মহব্বতের কারণে সিরকা শরাব আঙ্গুরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মহব্বতের কারণে কাঁটাও হয়ে যায় ফুল)।

তিনি বলেছেন, নওয়াব মোকাররম খান একবার তাঁর পীরের কাছে নিবেদন[২১] করলেন, আমার নিকট আপনার মহব্বত আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মহব্বতের উপর গালেব হয়ে গিয়েছে– যা অত্যন্ত লজ্জার কারণ। উত্তরে তাঁর পীর খাজা মোহাম্মদ মাসুম বললেন, পীরের মহব্বতের মধ্যেই আল্লাহ্ ও রসুলের মহব্বত নিহিত। আর মুরিদের মধ্যে এই মহব্বত পয়দা হয় কামালাতে এলাহীর জযবার কারণে, পীরের বাতেন জগতে যার আবির্ভাব হয়ে থাকে।[২২]

চুঁ দীদায়ে আকল আমদ আহওয়াল
মাবুদে তু সের তসতে আওয়াল

(যখন আকলের চক্ষু বক্র হয়ে যাবে, তখন তোমার মাবুদই হবেন তোমার মস্তক)।

মির্জা মাযহার বলেছেন, নওয়াব মোকাররম খানের ইনতেকালের সময় তাঁর মাথায় হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরারের বরকতময় টুপী রাখা হলো। তিনি তখন মুমুর্ষ অবস্থায় ফেরাসতের নূর দ্বারা বুঝতে পারলেন, আমার মাথায় রয়েছে বরকতময় টুপী। তিনি চোখ খুললেন এবং এমতো প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন যে, হজরত খাজার পবিত্র সত্তা আল্লাহ্পাকের দরবারে আমার জন্য ওসিলা হবে।

তিনি বলেছেন, প্রাচীন নকশবন্দী বুজুর্গগণের নেসবত এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নেসবতের মধ্যে ব্যবধান আছে। তাছাড়া তাঁদের হাল ও কাইফিয়তও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেনোনা পীর তাঁর মুরিদানের হালের উপর তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করেন, যা তাঁর পীরের পীর থেকে কম প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় পীর ও মুরিদ উভয়ের নৈকট্যের কারণে 'মাঈয়াত' (সঙ্গতা) এর নেসবতটি সুদৃঢ় ও বাস্তবায়িত হয়।

তিনি বলেছেন, একদিন তিনি হজরত শায়েখ আবেদ সুনামী, হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী এবং নওয়াব মোকাররম খানের মাজার জিয়ারতে গেলেন। তাঁদের মাজারসমূহ একই জায়গায় অবস্থিত। তিনি তাঁদের দু'জনের মাজারের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করার পর বললেন, এই দুই বুজুর্গের নেসবত একই। কিন্তু হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর মাজারের নেসবত দারিদ্র ও পরহেজগারীর নূরানিয়াতের কারণে স্বতন্ত্র।

তিনি বলেছেন, দুই ব্যক্তি হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলো। একজন কাদেরিয়া তরিকা, আর অপর জন নকশ্বন্দিয়া তরিকা। হজরত শায়েখ আব্দুল আহাদ বলেছেন, তখন হজরত গাউছুল আজমের পবিত্র রূহ আগমন করলো এবং তিনি মিছালী সুরতে আপন খান্দানের মুরিদের সঙ্গী হয়ে রওয়ানা দিলেন। আর হজরত খাজা নকশ্বন্দও মিছালী সুরতে তাঁর তরিকার অনুসারীর সঙ্গে রওয়ানা দিলেন।

তিনি বলেছেন, আল্লাহ্তায়ালার দরবারে প্রত্যেক তরিকার শায়েখের তাওয়াস্সুল (মধ্যস্থতা) হচ্ছে হাবলুল মতীন (সুদৃঢ় রশি) স্বরূপ। কেনোনা শায়েখ হচ্ছেন নৈকট্যের স্তরসমূহে সফলকাম। ফায়দা গ্রহণকারী যদি তাঁর কাছ থেকে ফয়েজ হাসিল করে নিতে পারে, তাহলে সেও তাঁর স্তরে চলে যায়। শুধু তাই নয়, বরং যে সুসংবাদ আকাবেরগণের জন্য রয়েছে, সে তার মধ্যে শরীক হয়ে যেতে পারে। তখন বুজুর্গগণের সহযোগিতা তার অবস্থার সঙ্গে শামিল হয়ে যায়।

তিনি বলেছেন, হজরত গাউছে পাকের তাওয়াজ্জোহ তাঁর তরিকায় যুক্তদের প্রতি খুব বেশী বলে মনে হয়। এই তরিকার এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি দেখিনি, যার প্রতি তাঁর তাওযাজ্জোহ ব্যবহৃত হয়নি। এভাবে আমার তরিকার অনুসারীদের প্রতিও খাজা নকশ্‌বন্দের তাওয়াজ্জোহ রয়েছে।

মোগল সৈন্যরা ময়দানে ঘুমানোর কালে তাদের ছামান ও অশ্বসমূহ হজরত খাজা নকশ্‌বন্দের হাওলায় দিয়ে দিতো। তাঁর গায়েবী মদদও তাদের সঙ্গে থাকতো। এ প্রসেঙ্গ বহু ঘটনা আছে, যা বর্ণনা করলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেছেন, হজরত সুলতান নিজামুদ্দীন আওলিয়া তাঁর মাজার জিয়ারতকারীদের প্রতি খুব মেহেরবানি করেন। শায়েখ জালাল পানিপথিও জিয়ারতকারীদের প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করেন। হজরত খাজা কুতুব উদ্দীনের শুহুদ (আত্মিক দর্শন) এর মধ্যে নিমজ্জিত থাকার শান খুব উঁচু। হজরত খাজা শামসুদ্দীন তুর্ক পানিপথি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনোকিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এই কিতাবের লেখক শাহ গোলাম আলী বলেন, পানি পথ থেকে রওয়ানা দেয়ার সময় এই ফকীর চক্ষুদ্বয়কে পা বানিয়েছিলো এবং অত্যন্ত আদবের সাথে হজরত শামসুদ্দীন তুর্কের মাজার জিয়ারত করতে গিয়েছিলো এ জন্য যে, তিনি আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই তরক করেছিলেন। তিনি আমার প্রতি খুবই মেহেরবানি করেছিলেন। ফলে আমার মধ্যে যে কাইফিয়ত সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তিনি যে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেছিলেন, তাতে আমার দিল এমনভাবে ভরপুর হয়েছিলো যে, দিল্লীতে পৌঁছা পর্যন্ত আমি তা অনুভব করেছিলাম এবং কয়েকদিন পর্যন্ত আমার মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া বিরাজমান ছিলো।

তিনি বলেছেন, আকাবের মাশায়েখগণের নেসবতের শক্তি এবং আবরু এমন পর্যায়ের হয়ে থাকে, রসনা যার বর্ণনা করতে অক্ষম। আমাদের তরিকার প্রিয় ব্যক্তিগণ এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পূর্বের সুফিয়ানে কেরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আমরা তাঁদের তুলনায় কিছুই নই। মির্জা মাযহার একদিন তাঁর সাথীগণকে সঙ্গে নিয়ে হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ র. এর রূহ মোবারকের প্রতি তাওয়াজ্জোহ করার পর বললেন, সুবহানাল্লাহ! খাজা নকশ্‌বন্দ থেকে বিস্ময়কর ও শক্তিশালী জযবাবিশিষ্ট নেসবত প্রকাশিত হয়েছে। হবে না কেনো? হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ তো এই তরিকার মহান বুজুর্গ। এই কিতাবের লেখক শাহ্ গোলাম আলী আরও বলছেন, ওই সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। হজরত খাজা নকশ্‌বন্দের কাছ থেকে এমন নেসবত পাওয়া যাচ্ছিলো যে, আমাদের বক্ষের পরিসরে যতটুকু শূন্য স্থান ছিলো, তাঁর নেসবতের নূর দ্বারা তা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। মির্জা মাযহার মোরাকাবা থেকে যখন মাথা ওঠালেন, তখন খাজা

নকশ্‌বন্দের দৃষ্টিপাত শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি যখন তাঁর দৃষ্টিপাত উঠিয়ে নিলেন, তখন আমাদের ভরপুর দিল আবার শূন্য এবং নূরবিহীন হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের বাতেন জগতে যে নূর ও কাইফিয়ত উদ্ভাসিত হয়, তার আগমন ঘটে হাকীকতের আসমানসমূহের মধ্যমনি সূর্যসদৃশ বুজুর্গগণের রূহ থেকে। আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমিন।

তিনি বলেছেন, পানিপথে ইমাম বদরুদ্দীনের মাজার শরীফের শিয়রে বসে আমি মোরাকাবা করেছিলাম। যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ ও মনোনিবেশও করেছিলাম। কিন্তু তাঁর নেসবতের আছর প্রকাশ পেলো না। তবে দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর নেসবত নেহায়েত নম্রতার সাথে প্রকাশ পেলো। তখন আমার মনে হলো, তাঁর সুলুক সুফিয়ানে কেরামের নির্ধারিত তরিকা মোতাবেক হয়নি। তিনি আল্লাহ্‌র পথে শাহাদতের মাধ্যমে পৌঁছেছেন। আর অকস্মাৎ তিনি এজতেবা (মনোনিত করা) এর তরিকায় সফলকাম হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র পথে যাঁরা জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকেন, তাঁদের হাল এরকমই হয়ে থাকে। তাঁরা অকস্মাৎ জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকেন। আর সে কারণেই তাঁরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আকর্ষণে অকস্মাৎ নৈকট্যের মাকাম লাভ করেন।

তিনি বলেছেন, শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী নতুন তরিকার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি মারেফতের রহস্যের বিষয় সাব্যস্ত করেছিলেন এবং বিভিন্ন এলেমের গভীরতায় বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। বিভিন্ন এলেম ও পূর্ণতার কারণে তিনি ওলামায়ে রব্বানীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো মোহাক্কেক সুফী তিনিই ছিলেন, যিনি জাহেরী ও বাতেনী এলেমের সমন্বয় সাধন করে এক নতুন এলেমের আবিষ্কার করেছিলেন। এমন আলেম সম্ভবতঃ একজনই অতিবাহিত হয়েছেন।

তিনি বলেছেন, যে সকল আওলিয়া খেদমতে খালকের দায়িত্বে নিয়োজিত, আমি তাঁদেরকে চিনি। তাঁদের সঙ্গে আমার মোলাকাতও হয়েছে। তবে আল্লাহ্‌তায়ালার মর্জি নেই যে, আমি তা প্রকাশ করি। নাদিরশাহের সেনাবাহিনীতে একজন কুতুব ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। কোনো এক কারণে লাহোরের কাযীর সীলমোহরের প্রয়োজন পড়েছিলো। আমি একথা তাঁকে বললাম। তিনি এক প্রহরের মধ্যে কাযী সাহেবের সীলমোহর লাগিয়ে আনলেন এবং বললেন, কাযী সাহেব কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আমার আসতে কিছু বিলম্ব হলো। তা নাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসতে পারতাম।

একবার কোনো এক দরবেশের কন্যার বিয়ের জন্য কিছু অর্থের প্রয়োজন পড়লো। এক কুতুব অর্ধ রাত্রিতে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করলেন। সেখানে মোহাম্মদ শাহ বাদশাহ্‌র একটি থলে রাখা হয়েছিলো। বাদশাহ্‌ প্রতি রাতে

গোপনে নির্জনতা অবলম্বনকারী ফকীরদের জন্য খরচ করার উদ্দেশ্যে ওই থলেতে এক হাজার রুপিয়া করে রেখে দিতেন। ওই কুতুব বাদশাহ্‌র কক্ষে প্রবেশ করে থলেটি উঠিয়ে নিলেন। বাদশাহ্ তা টের পেলেন। তিনি তাঁকে চোর মনে করলেন। কুতুব তাঁকে বললেন, আমি ওই ব্যক্তি, যার মাধ্যমে তোমার জান রক্ষা পাচ্ছে।

বাদশাহ্ বললেন, আরও কিছু অর্থ নিন। তিনি বললেন, বাস। এতোটুকুই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন, সেই কুতুব গোপনে এসে আমাদের হালকায় বসে যেতেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেতো না। সমাজে বসবাসকারী ওলিগণের জন্য শোহরত অপরিহার্য, যাতে করে মানুষ তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে পারে। তবে জনগণ থেকে পৃথক থাকেন যে সকল ওলি, তাঁদের গোপন থাকা অপরিহার্য, যেনো তাঁদের রহস্য জনসমক্ষে প্রকাশিত না হয়।

একবার এক লম্বা জওয়ান লোককে তীর ধনুক নিয়ে আমাদের সামনে আসতে দেখা গেলো। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো। লোকটি দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে তার পর চলে গেলেন। তখন মির্জা মাযহার বললেন, এই যুবক একজন আবদাল। সম্ভল শহরের হেফাজত করা তাঁর দায়িত্ব। আমাদেরকে দেখার জন্য তিনি এক কদমে সম্ভল থেকে দিল্লীতে এসেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, দিল্লী শহরের কুতুব হচ্ছেন এক কাশমিরী ব্যক্তি। তিনি ওমুক মহল্লায় বাস করেন। তখন মোহাম্মদ এহসান আরয করলেন, আমাকে তাঁর নাম ঠিকানা বলুন। তিনি বললেন, তুমি কি চাও তাঁর গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে যাক?

একবার এক সৈনিক বেশী যুবক হজরত মির্জা মাযহারের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছেন? যুবক জবাব দিলেন, আজমীর থেকে। এ মুহূর্তে আমাকে একটি দায়িত্ব দিয়ে আপনার এখানে পাঠানো হয়েছে। কাজটি হলো নজীবখানের[২৪] হেফাজতের জন্য আপনার সাথীদের মধ্যে সুরা এখলাসের আমল করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথীগণ সুরা এখলাসের আমল করেন এবং নজীব খান কাফেরদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পান।

হজরত মির্জা মাযহার কয়েকবার ফেরেশতা এবং বাতেনের নূর তাঁর বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা অবলোকন করেছেন। একবার আমি (শাহ গোলাম আলী) তাঁর খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি হঠাৎ বললেন, এখানে কে? কেনো এসেছো? আমি বললাম, এখানে তো কেউ নেই। তিনি বললেন, এখানে একজন আছে, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো না। একথা সত্য যে, গায়েবী বিষয়ের কাশফ্ অনেকের থাকে না। আলমে গায়েবের কোনো কিছু দর্শন করা তরিকার শর্ত নয়। আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি সার্বক্ষণিক মনোযোগ এবং মোস্তফা স. এর অনুসরণ।

তিনি বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে আশার আমল আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সার্বক্ষণিক মনোনিবেশ এবং মাশায়েখে কেরামের প্রতি মহব্বত ব্যতীত অন্যকিছু নয়।

তিনি বলেছেন, প্রত্যেক আমলের ভিন্ন ভিন্ন হাল থাকে। নামাজ সকল প্রকারের হালকে একত্রিতকারী। তেলাওয়াত, তসবীহ্, দরূদ এস্তেগফার ও জিকিরের নূরের উপর নামাজ প্রতিষ্ঠিত। তবে নামাজের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও মৌলিক হাল হচ্ছে করণ[২৫] (সংযুক্তি) এর হাল। এই হাল কেবল নামাজের মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে শর্ত হলো, আদবসমূহ পুরাপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা শাহ গোলাম আলী দেহলভী বলছেন, নামাজ হচ্ছে মুমিনগণের মেরাজ। নামাজের হালতে বাতেন জগতের উরুজ (উর্ধ্বারোহণ) হয়ে থাকে এবং লতীফাসমূহ উর্ধ্বজগতের নূরের অংশ লাভ করে থাকে। তবে রুকনসমূহের মধ্যে ভারসাম্য এবং খুশুখুজু (বিনয় ও একাগ্রতা) থাকা অপরিহার্য।

মির্জা মাযহার বলেছেন, কোরআন মজীদ তেলাওয়াত দ্বারা বাতেন জগতের সাফায়ী হাসিল হয় এবং কলবের কবজ (আবদ্ধতা) দূরীভূত হয়। কোরআন তেলাওয়াত হরফসমূহের তরতীল এবং খোশ আওয়াজে হওয়া উচিত। মধ্যম ধরনের আওয়াজে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করা উচিত, যাতে করে তার দ্বারা যওক (আত্মিক স্বাদ) পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন, রমজান মাসে বাতেনী নেসবতের উন্নতি সাধিত হয়। রোজা রাখা অবস্থায় গীবত ও মিথ্যা বর্জন করা ওয়াজিব। তা না হলে রোজা পালন দ্বারা উপবাস ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। এ মাসের সন্তুষ্টি অর্জন এবং রোজার হক আদায় করার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

তিনি বলেছেন, কোনো এক বুজুর্গ ব্যক্তি রমজান মাসকে দেখলেন একজন পুতপবিত্র মানুষের সুরতে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি রোজাদারদের রোজা পালনে সন্তুষ্ট? সে বললো, রোজাদাররা রোজার হক নষ্ট করে আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে। হজরত হুজ্জাতুল্লাহ মোহাম্মদ নকশ্বন্দ র. অসুস্থতার কারণে রোজা রাখতে পারতেন না। কিন্তু তিনি একারণে অনুতপ্ত থাকতেন। তাঁর রোজা না রেখে অনুতপ্ত হওয়া অন্যদের তুলনায় (যারা রোজা রেখে তার হক আদায় করে না) আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

তিনি বলেছেন, রমজান মাসের নূর ও বরকত শাবান মাস থেকেই শুরু হয়ে যায়। মনে হয় যেনো এ মাসের ফয়েজ ও বরকত শাবানের চন্দ্রই উদিত করে দেয়। অর্ধ শাবান থেকেই এ রকম মনে হয় যেনো পূর্ণিমার চন্দ্র এই মোবারক মাসের নূর দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছে। পূর্ণিমার রাত্রি থেকেই এরকম মনে হতে থাকে যেনো ফয়েজে এলাহীর সূর্য মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এজন্যই রমজান মাসে মুসলমানগণ বিভিন্ন দিক থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং বিস্ময়কর সোহবতের তাছীর অনুভূত হয়। তারাবীর নামাজে কোরআনে করীম শ্রবণের মাধ্যমে নতুন নতুন হাল পাওয়া যায়। মির্জা মাযহার কখনও কখনও তারাবীর নামাজের পর সাথীগণকে নিয়ে মোরাকাবা করতেন এবং তার মাধ্যমে সহী হাল অর্জিত হতো। যে রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা পেতেন, সে রাতে বলতেন, আজ রাতে বহুত ফয়েজ বরকত প্রবাহিত হচ্ছে এবং অধিক পরিমাণে তাজাল্লী প্রকাশিত হচ্ছে। সে রাতে তিনি অনেক দোয়া পাঠ করতেন এবং দোয়া করতেন। ওই হালের বর্ণনা দেয়ার ক্ষমতা লেখনীর নেই।

তিনি বলেছেন, শবে কদর প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়ে আসে। অর্থাৎ বেজোড় রাত্রিসমূহের মধ্যে কোনো এক রাত্রিতে হয়ে থাকে। এর জন্য সাতাশ তারিখ নির্ধারিত নয়। অবশ্য সাতাশ তারিখে অধিক পরিমাণে দোয়া করা এবং নফল নামাজ পড়ার জন্য মানুষের রাত্রি জাগরণ রীতি হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেও অনেক বরকত পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় উল্লিখিত তারিখেও শবে কদর হয়ে থাকে।

তিনি বলেছেন, রমজান মাসের দিবসকালে অন্তরে যে খাতিরজমা ও একাগ্রতা আসে, তা পুরো বছরের জন্য সম্পদ হয়ে থাকে। এটি একটি অভিজ্ঞতার বিষয় যে, এ মাসে যদি কখনও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি অথবা অলসতা পাওয়া যায়, তাহলে তার আছর পুরো বছরব্যাপী পড়তে থাকে। আমি মির্জা মাযহার আমার উস্তাদের মুখে শুনেছি, হাদিস শরীফে এসেছে, মাসটি যদি খাতিরজমা ও বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত হয়, তাহলে পুরো বছর নেক আমলের তৌফিক ও খাতিরজমার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে।

তিনি বলেছেন, আমার শায়েখ প্রতি রমজান মাসের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। কেউ যদি তরিকার এজাযতের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে যেতো এবং সে সময়ে যদি খেরকা প্রদান করার অবস্থায় আসতো, তাহলে তিনি তাকিদ করতেন, সে সময় যেনো লোকেরা হালকায় হাজির থাকে। যেনো তাদের বাতেনী উন্নতি সাধিত হয়। রমজান শরীফ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, রোজার বরকতে প্রিয়জনদের নেসবত অধিক রওশন হয়ে গিয়েছে। আফসোস! সারা বছর রমজান থাকে না কেনো? রোজা বছরের যে কোনো সময় রাখা হলেও, তার দ্বারা সাফায়ী হাসিল হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদা "আনা আজযী বিহি" (আমি তার প্রতিদান দিবো)[২৬] থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে সে রোজার মধ্যে রমজান শরীফের হাল পাওয়া যাবে না। এই পুস্তক প্রণেতা শাহ গোলাম আলী আহমদী বলছেন, হাদিসটির প্রকৃত অর্থ হবে– 'আস্ সাওমুলী ওয়া আনা আজ্যিবিহী'

(রোজা আমার জন্য, আমি তার প্রতিদান দিবো)।[২৭] কারও কারও মতে আজযী এর স্থলে উজযা ফেলে মজহুল (কর্মকারক ক্রিয়া) হবে। এখন অর্থ হবে, আমি নিজে তার প্রতিদান হবো। অর্থাৎ রোজার ওসিলায় আল্লাহ্তায়ালার দীদার হাসিল হবে আখেরাতে। সুতরাং রোজাদারদের জন্য কতোই না শুভসংবাদ।

তথ্যপঞ্জি

১. মোজাদ্দেদে আলফেসানি, মকতুব ২/১

২. ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদি আলফে সানি, মকতুবাত প্রথম খণ্ড, মকতুব ২০৯। তৃতীয় খণ্ড, মাকতুব ৮৮, ৯২, ১২১।

৩. হজরত শায়েখ মোহাদ্দেছের একটি পুরো মকতুব হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির মারেফতসমূহের সমালোচনা করে লেখা হয়েছিলো। মকতুবটি আব্দুল্লাহ খেশগী কুসুরী কর্তৃক রচিত "মাআরেজুন বেলায়েত" পুস্তকে উদ্ধৃত আছে। অধ্যাপক খলীল আহমদ নিজামী শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর জীবনীতে সংকলন করেছেন। পৃষ্ঠা ৩১২, ৩৪৪।

৪. খাজা হোসামউদ্দীন আহমদ বাদশাহ আকবরের নৈকট্যভাজন এবং আবুল ফজলের ভগ্নিপতি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমিরী ছেড়ে দিয়ে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহর খেদমতে দিন রাত অতিবাহিত করে ১০৪৩ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

৫. শায়েখ মোহাদ্দেছের এই মকতুবটি 'আখবারুল আখইয়ার' এর শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরা হজরত মোহাদ্দেছের এই মকতুবটিকে অস্ত্র বানিয়ে তাদের বিরোধিতাকে শানিত করে থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, হজরত শায়েখ মোহাদ্দেছ র. বিরোধিতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। উভয় হজরতের আওলাদগণের মধ্যে পরবর্তীতে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিলো। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ ইয়াহইয়া হজরত শায়খ মোহাদ্দেছের হাদিসের সনদ গ্রহণ করেছিলেন। হজরত শায়েখ মোহাদ্দেছের আওলাদগণের মধ্য থেকে অনেক ব্যক্তি হজরত মোজাদ্দেদ র. এর আওলাদ থেকে বায়াত গ্রহণ করে হেদায়েত পেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

হজরত মির্জা মাযহারের সঙ্গে হজরত শায়েখ মোহাদ্দেছের বেশ কয়েকজন সাহেবজাদা তরিকায় যুক্ত ছিলো। এই পুস্তকে মির্জা মাযহারের খলিফাবৃন্দের তালিকায় তাঁদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

৬. আল কোরআন সুরা আল মুমিন ২৮/৪০।

৭. এই কিতাবের লেখক শাহ গোলাম আলী দেহলভী হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর উত্থাপিত অভিযোগসমূহের উত্তর দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছিলেন, যার শিরোনাম ছিলো 'রিসালা দার ই'তিরাদ্বাত শায়েখ আবদুল হক বর হজরত মোজাদ্দেদ র.' (পুস্তিকা মোজাদ্দেদ র. এর প্রতি শায়েখ আব্দুল হক র. এর অভিযোগসমূহ) তাছাড়া বিভিন্নজন শায়েখ মোহাদ্দেছের জবাব দিয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা লিখেছেন।

৮. বাদশাহ্ নূরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গির মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. কে তাজিমী সেজদা না করার অপরাধে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করেছিলেন। তিনি সেখানে ১৬১৯ খৃঃ থেকে ১৬২১ খৃঃ পর্যন্ত বন্দী ছিলেন। তারপর মুক্ত হয়ে কিছু দিন বাদশাহ্ জাহাঙ্গিরের সঙ্গে তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৯. ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর জীবদ্দশায়ই তাঁর বিরুদ্ধে প্রশ্নবান শুরু হয়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেক যুগেই বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর উপর অনর্থক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিলো। আমরা এমন কিছু প্রশ্নবোধক লেখা চিহ্নিত করেছি, যা হজরত মোজাদ্দেদ র. কে প্রত্যাখ্যানকল্পে লেখা হয়েছিলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দ্রষ্টব্য আহওয়াল ও আছারে আব্দুল্লাহ খেশগী, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬২। তাঁর ভক্তগণও বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিউত্তরে অগণিত পুস্তিকা লিখেছেন।

১০. এই পুস্তিকার নাম 'আতিয়াতুল ওয়াহ্হাব আলফাসেলা বাইনাল খাতা ওয়াস্সওয়াব'। এটি আরবী ভাষায় লিখিত, রচনা কাল ১০৯৪ হিজরী। এটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে, অতঃপর মোজাদ্দেদে আলফেসানির মকতুবাত শরীফের আরবী তরজমার সংকলন, যা প্রস্তুত করেছেন মোহাম্মদ মুরাদ তাঁর তৃতীয় খণ্ডের টীকায়।

১১. শায়েখ মোহাম্মদ বেগ মক্কীর জীবনবৃত্তান্ত খুব বেশী পাওয়া যায় না। তিনি কতিপয় পুস্তকের রচয়িতা ছিলেন।

১২. এখানে এনকার ও একরার (অস্বীকার ও স্বীকৃতি) বলতে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি এবং শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর মধ্যে উদ্ভূত মতভেদকে বুঝানো হয়েছে, যার আলোচনা করা হয়েছে তথ্যপঞ্জি ৭, ৮ ও ৯ নম্বরে। হাফেজ মোহাম্মদ মহসিনের জীবনবৃত্তান্ত জানতে হলে পাঠ করতে হবে এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়।

১৩. শায়েখ মোহাম্মদ ফরখ পিতা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ, পিতা হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র.। তিনি একজন বিখ্যাত আলেম এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। আল্লামা ও মৌলভী তাঁর লকব ছিলো। তিনি সনদ ও মতন সহকারে সত্তর হাজার হাদিসের হাফেজ ছিলেন। হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির পরিচয়ে বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন। বিরুদ্ধবাদীদের জবাবে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন, যার নাম 'কাশফুলগেতা আন আযহানেল আগবিয়া'।

১৪. মধ্যযুগে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানির বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আব্দুর রসুল বরজঞ্জী। তখনকার মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বিরোধিতাকারীদের অধিকাংশের সম্পর্ক ছিলো এই বরজঞ্জীর সাথে। তিনি এ বিষয়ে অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু কিছুর ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে 'আব্দুল্লাহ খেশগীর জীবন ও তার কর্ম' শিরোনামে। পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬৪।

১৫. হজরত খাজা আব্দুল আহাদের পিতা হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ এবং চাচা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম। উভয়েই হজরত মোজদ্দেদে আলফেসানির ফরজন্দ। তিনি সাঈদী ও মাসুমী দুই নেসবতেই যুক্ত ছিলেন।

১৬. সেমার বিষয়ে সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে এখতেলাফ আছে। নকশ্বন্দী মাশায়েগণও এ বিষয়ে পৃথক কিতাবসমূহ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে হজরত মির্জা মাযহারের জলীলুলকদর খলীফা হজরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি র. রচিত রেসালায়ে সেমা বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য।

১৭. এই গ্রন্থের রচয়িতা শাহ্ গোলাম আলী তাঁর রচিত 'রেসালায়ে আহওয়ালে বুজুর্গান' পুস্তকে বলেছেন, হজরত খাজা সাইফুদ্দীন র. চৌদ্দশ' ছাত্রকে তাদের খাওয়া পরার জন্য বৃত্তি প্রদান করতেন।

১৮. সিলসিলায়ে মাদারিয়া শাহ বদিউদ্দীন মাদার র. এর সাথে সম্পৃক্ত। প্রাচ্যের সুলতানগণের আমলে এই সিলসিলার প্রসার ঘটেছিলো। বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করা যেতে পারে 'আখবারুল আখইয়ার' পৃষ্ঠা ১৫৪।

Sharqi Sultanat of Jaunpur, P. 274-77

Sufi Orders in Islam. P. 97

১৯. নওয়াব মোকাররম খানের নাম ছিলো মীর মোহাম্মদ ইসহাক ইবনে শায়েখ মীর। আওরঙ্গজেব আলমগীরের বিশেষ নৈকট্যভাজনদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের বেশ কিছু রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১১২৯ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তাঁর পুরো খান্দান হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুমের ভক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা, চাচা শায়েখ মুনীর, ভাই মোহতাশেম খান (মীর ইব্রাহীম) এবং ভাই শমশের খানও (মীর ইয়াকুব) এই সিলসিলার ভক্ত ছিলেন। মোকাররম খান তাঁর ভাই বেরাদর সকলকে নিয়ে সেরহিন্দ শরীফে গিয়ে খাজা মোহাম্মদ মাসুমের খেদমতে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন।

২০. মাক্বামাতে মাযহারীর (পূর্বের) দু'টি প্রকাশনায় এখানে হজরত সাইয়্যেদ অর্থাৎ শায়েখ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী ছাপা হয়েছে। তা ছিলো ছাপার ভুল।

২১. মকতুবাতে হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম ২য় খণ্ডে মকতুব নং ১৫৩ ও ১৫৪তে তাঁর নাম আছে। যদিও সেখানে সম্বোধনে মোকাররম খান লেখা হয়নি। তার কারণ তিনি এই উপাধি পেয়েছিলেন খাজা মোহাম্মদ মাসুমের পরলোকগমনের পর।

২২. মকতুব নং ১৫৩, প্রথম খণ্ডে বলেছেন, বান্দা যখন মোত্লাক ফানা (সাধারণ ফানা) লাভ করে তখন তার দিলের আয়না থেকে গায়রুল্লাহর নকশা দূর হয়ে যায়। তখন তার জ্ঞানগত এবং দৈহিক সম্পর্ক অন্য কোনো বস্তুর সাথে থাকে না। আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত ছাড়া আর অন্য কিছু তার মকসুদ থাকে না। এ মাকাম অর্জন করা ছাড়া গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে নাজাত পাওয়ার কল্পনা করা কাঁটাদার বৃক্ষের উপর হাত রাখারই নামান্তর। এহেন দৌলত অর্জিত হয় প্রথমে পীর ও মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে।

২৩. ১১২৯ হিজরী, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ।

২৪. নজীব খান বলতে বুঝানো হয়েছে নজীবুদ্দৌলা। তিনি রোহিলা সরদার নামে খ্যাত ছিলেন।

২৫. আহওয়ালে করণ অর্থাৎ এমন অবস্থা যাতে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। যার মধ্যে পূর্ণ খাতিরজমা বিদ্যমান থাকে।

২৬. বোখারী, রোজা অধ্যায়–২।

২৭. আরও দেখা যেতে পারে মুসলিম– রোজা অধ্যায় পৃষ্ঠা ১৬৪। নাসায়ী রোজা অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪১-৪৩। ইবনে মাজা, আদব অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৭। মোওয়াত্তা, রোজা অধ্যায় পৃষ্ঠা ৫৭। মসনদে আহমদ ইবনে হাম্বল ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৬।

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

মির্জা মাযহারের কাশফ ও কারামতসমূহ

আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নিছক অনুগ্রহে বিশুদ্ধ কাশফের মর্যাদা দান করেছিলেন শায়েখ মির্জা মাযহারকে। তাঁর জ্ঞানসমূহ ছিলো সঠিক ও মূলানুগ। তাঁর সম্পর্কে তাঁর শায়েখ র. এর মন্তব্য ছিলো এ রকম– তোমার শরীয়তের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অর্জন বিশুদ্ধ। এর মধ্যে চুল পরিমাণ ন্যূনতা নেই। তাঁর সাথীগণের (মুরিদগণের) মধ্য থেকে কারও কোনো বিষয়ে কাশফ হলে তাঁরা তাঁদের সুলুকের মাকামে 'আইন' (মূল বস্তু) দেখতে পেতেন না। হালের প্রত্যেক মাকামে আপন মাকামের উপযোগী বিষয় নিজের বাতেন জগতে অনুভব করতেন, যেমন মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. বলেছেন।

তিনি বলেছেন, আমার কাশ্ফ (আত্মিক দর্শন) ও আধ্যাত্মিক অর্জন আমার পীরানে কেরামের অনুরূপ। তবে একবার আমার ভুল হয়েছিলো। আমার শায়েখ হজরত একদিন এক বুজুর্গ সম্পর্কে বললেন, তিনি আপনাদের ওসিলায় কামালতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছেন। আমি বাস্তবের খেলাফ আরয করলাম। তিনি বললেন, তোমার মোশাহাদায় (আত্মিক দর্শনে) ভুল হয়েছে। আমি যা কিছু বলেছি তা ঠিক। কিছু দিন পর তিনি আমার হালের প্রতি গুরুত্ব দিলেন এবং বললেন, তোমার দেখাই ঠিক ছিলো। ভুল হয়েছে আমারই।

মির্জা মাযহার র. বলেছেন, আমি কারও মাকামের সুসংবাদ বর্ণনাকালে খুব চিন্তাভাবনা করে বলতাম। এমন কি সালেকের বাতেন জগতে মাকামের নূর পরিষ্কারভাবে দেখে নিতাম। তারপরও আমি এলহামের অপেক্ষায় থাকতাম। অতঃপর আমি তার হালের পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন করতাম। তার প্রশ্নের উত্তর যদি এলহাম মোতাবেক পেতাম এবং তার বাতেন জগতে নতুন হাল ও কাইফিয়ত দেখতে পেতাম, তবেই আমি তার মাকামের বিষয়ে সুসংবাদ দিতাম যে, তোমার এই মাকামের সঙ্গে নেসবত রয়েছে। এই নেসবত তোমার অবগতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। ওই রকম নেসবত নয়, যা পূর্ববর্তী বুজুর্গানের হাসিল হতো। আমি এভাবে বলতাম এ জন্য, যেনো উভয়ের নেসবত সমান ধারণা করা না হয়। তুমি যদি সব সময় জিকির মোরাকাবা করো এবং আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তে তুষ্ট থাকো, তাহলে এই মাকাম থেকে ফায়দা লাভ করতে পারবে।

মুরিদের আল্লাহ্তায়ালার প্রতি মনোযোগ এবং গায়রুল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে মোর্শেদের সোহবতে আস্বাদ ও হাল লাভ হয়ে থাকে। মুরিদ তখন

নির্জনে বসে নিজের সময় ওজিফা ও ইবাদতের দ্বারা নিজকে আবাদ করে আল্লাহ্তায়ালার প্রদত্ত মাকামে উন্নতি করতে পারে। ফয়েজের উৎসস্থলে যদি তাজাল্লী না হয়, তাহলে সালেকের হিম্মতের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে মনে করতে হবে। এই গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, প্রাচীনকালের বুজুর্গগণ সাধনা, বিস্তারিত মাকাম এবং সুলুকের মাধ্যমে বেলায়েতের পথে পৌঁছেছিলেন এবং বহু বছরের কঠোর সাধনা দ্বারা তাঁরা শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। সে জন্য সুদৃঢ় হাল এবং বেলায়েতের প্রতিক্রিয়া তাঁদের মধ্যে ভালোভাবে প্রকাশিত হতো। কিন্তু এই নকশ্বন্দিয়া তরিকায় জযবা (আকর্ষণ) এবং মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে মাকাম অতিবাহিত হওয়ায় আল্লাহ্তায়ালার সাথে সালেকের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই মাকামসমূহের নূর ও বরকত সালেকের মধ্যে তার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ পায়। তারপরও এই তরিকার সাথীগণ জিকির ও ইবাদতে নিজের জীবন অতিবাহিত করে কলবের পরিচ্ছন্নতা এবং গায়রুল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ ছিন্ন করে নিকৃষ্টতা থেকে নফসকে পবিত্র করতে সক্ষম হয়। তখন হাল ও কাইফিয়তের সাথে সাথে আত্মিক প্রশান্তিও পেয়ে থাকে। কারামত বা আলৌকিকতা প্রদর্শন কঠোর সাধনার উপর নির্ভরশীল। তা বেলায়েতের জন্য শর্ত নয়।

তিনি বলেছেন, আমার উপর আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে বড় নেয়ামত যার শুকরিয়া আদায় করার মতো ভাষা এবং শক্তি আমার নেই, তা হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তাঁর দেয়া মাকামসমূহের কাশ্ফ (আত্মিক দর্শন) বাস্তবসম্মতভাবে আমাকে দান করেছেন। এই খান্দানের যে সকল বুজুর্গকে আল্লাহ্তায়ালা এ সময় তালেবে মাওলাগণের হেদায়েতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, তিনি আমাকে তাঁদের মধ্যে বিশেষত্ব দান করেছেন। আমি এই তরিকার সালেকগণকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সুলুক করাতে পারি।

কতিপয় আফগানী তাঁর এহেন সুসংবাদ বাণী শুনে তা অস্বীকার করলো। তিনি ফেরাসতের নূর দ্বারা তা বুঝে নিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমার কথা স্বীকার না করো, তাহলে দীনের পূর্ববর্তী কোনো এক বুজুর্গকে নির্ধারণ করো। তাঁর রূহ জাহির হয়ে এই সুসংবাদ দিয়ে যাবেন। তারা বললো, সরওয়ারে আলম স. যদি তার প্রত্যয়ন করেন, তাহলে এর সত্যতা নিকটবর্তী হবে। পয়গম্বরে খোদা স. এর রূহ মোবারকের উপর ফাতেহা পাঠ করে তাঁর সাথী সঙ্গীগণকে সঙ্গে নিয়ে রসুলেপাক স. এর প্রতি মোতাওয়াজ্জোহ হয়ে বসলেন। মোরাকাবাকারীগণের মধ্যে অদৃশ্য বার্তা জারী হলো। হজরত রসুলে করীম স. জাহের হয়ে অস্বীকারকারীদেরকে তাগিদ করে বললেন, মির্জার সকল সুসংবাদ বিশুদ্ধ।

শাহ্ আব্দুল হাফীজ হজরত শায়েখ মাযহারের খেদমতে থেকে উচ্চ মাকামসমূহে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি শায়েখ র. থেকে ফায়দা হাসিল করেছি। একদিন তিনি বললেন, শক্তি অর্জনের জন্য আমি তোমাকে প্রত্যেক মাকামে দু'বার করে তাওয়াজ্জোহ দিয়ে থাকি। তার কিছুক্ষণ পর আমাকে বেলায়েতে কালবীর তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। আমি তখন পরীক্ষামূলকভাবে সেই মাকাম ছেড়ে অন্য এক মাকামে মনোসংযোগ করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কলবের প্রতি মোতাওয়াজ্জোহ হয়ে থাকতে বলেছিলাম। তুমি অন্য মাকামে সরে গেলে কেনো? সেদিন থেকে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হলো যে, তাঁর কাশ্ফ অত্যন্ত বিশুদ্ধ।

শাহ্ মাযুদ্দীন র. আহমদ খান যুবায়রীর খলীফা ছিলেন। তিনি একবার তাঁর পীরের নির্দেশে মাকামসমূহ সহীহ্ করার জন্য মির্জা মাযহারের খেদমতে হাজির হলেন। তিনি তাঁর হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দেয়ার পর বললেন, তোমার কোন্ মাকামের নেসবত হাসিল হয়েছে? তোমার পীর কী সুসংবাদ দিয়েছেন? শাহ্ মাযুদ্দীন তখন মির্জা সাহেবের কাশফের বিশুদ্ধতা স্বীকার করে নিলেন।

মীর বাহাদুর হজরত শায়েখ মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. থেকে তরিকার মাকামসমূহ শিখেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদা আমি হজরতের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর নির্দেশিত মাকাম বাদ দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে অন্য মাকামে খেয়াল করে মোরাকাবা করছিলাম। তিনি আমাকে নিষেধ করে বললেন, হিম্মতের মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত কোরো না। আমার নির্দেশিত মাকামে মনোযোগ গেঁথে রেখো। তোমার নিম্নতর মাকামের দিকে সম্বন্ধ দেখা যাচ্ছে। তারপরও উন্নতির জন্য হিম্মত করা উচিত।

শায়েখ মোহাম্মদ এহসান হজরত সাইয়্যেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনীর পীর হজরত হাফেজ মোহাম্মদ মহসিনের মাজার শরীফে মোরাকাবা করেন। তখন তাঁর মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে একথা বেরিয়ে গেলো– আপনি মির্জা সাহেবের সুসংবাদের সত্যতার বিষয়ে কী বলেন? তিনি মাজার শরীফের বাইরে এসে বলে দিলেন, তিনি যা বলেন সবই ঠিক।

মির্জা মাযহারের কাশ্ফের বিশুদ্ধতার বিষয়ে এরকম অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সুসংবাদের সত্যতার মজবুত দলিল হচ্ছে সালেকগণের প্রত্যেক মাকামে তাদের হালের পরিবর্তন হওয়া, যা এ তরিকার ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানির অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর সাথীগণ বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা আপন আপন বাতেন জগতে স্ব স্ব হাল লাভ করতেন। তিনি তাঁর সাথীগণকে কাশফে কওনী (জগতবিষয়ক কাশফ) কাশফে কুলুব (কলব সংক্রান্ত কাশফ) এবং কাশফে কুবুর (কবর জগতের কাশফ) বিষয়ে যা বলতেন, তা হতো বাস্তবসম্মত।

একবার মোহাম্মদ কাসেম নামক এক ব্যক্তির ভাই তাঁর দরবারে এসে বললো, মোহাম্মদ কাসেম আজীমাবাদ বন্দী। এই মোখলেছ ব্যক্তির জন্য আপনি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন। অল্পসময় চুপ থাকার পর তিনি বললেন, সে বন্দী হয়নি। দালালদের সঙ্গে তার মৃদু বচসা হয়েছিলো। এখন সে ভালোই আছে। সে তার বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছে। কাল পরশু নাগাদ চিঠি পৌঁছে যাবে।

এ কিতাবের লেখক বলেন, একদিন আমি (গোলাম আলী) তাঁর খেদমতে হাজির ছিলাম। শায়েখ মির্জা মাযহার তখন শায়েখ গোলাম হাসানকে তাওয়াজ্জোহ দেয়ার পর বললেন, তুমি কি কাফেরদের পূজার খাবার খেয়েছো? তোমার বাতেন জগত থেকে কুফরের তমসা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি হিন্দুর হাত থেকে কিছু খেয়েছিলাম। আমার বাতেন জগতে এজন্যই কালিমা পড়েছে। মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীনকে বিদায় দেয়ার কালে তিনি বললেন, তোমার পথে দেয়াল দেখা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ তুমি রাস্তা থেকেই ফিরে আসবে। অতঃপর কয়েকমাস পর সে ফিরে এসেছিলো।

মোল্লা নাসীমের বিদায় কালে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তোমার সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে বলে দেখা যাচ্ছে না। পরবর্তীতে তাই হয়েছিলো। তিনি বলতেন, সাথীগণের মনের গোপন বিষয় আমার এতো বেশী জানা যে, তাদের অন্তরে কখন কী খটকা সৃষ্টি হয়, তাও আমি বুঝতে পারি। এই কিতাবের লেখক বলেন, আমি তখন নিবেদন করলাম, হজরত! এ সব তাহলে বলেন না কেনো? তিনি বললেন, দোষ গোপন রাখা আল্লাহ্তায়ালার ছাত্তার সিফতের প্রতিবিম্ব।

এই কিতাবের লেখক বলেন, একদিন আমি তাঁর সাহচর্যে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক বেআদব বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলো। বললো, আমি এজন্য এসেছি যে, আমি দেখতে চাই জানে জানার কর্তৃত্ব প্রদর্শন আল্লাহ্প্রদত্ত, না শয়তানপ্রদত্ত। এ কথা শুনে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। আমি মনে মনে বললাম, অসন্তুষ্ট হওয়া তো দরবেশীর পরিপন্থী। তিনি এ বিষয়টি মনে মনে অপছন্দ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বললেন, দূর হয়ে যাও। আমাকে এনকার করছো?

মীর আলী আসগর বলেছেন, আমার তখনও দাড়ি গোঁফ গজায়নি। তখন একদিন আমি হজরতকে কদমবুছি করেছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করে দু'হাতে ধরে আমার মাথা ওঠালেন। তখন আমার মনে একটি বাজে চিন্তা দাঁনা বেঁধেছিলো যে, সম্ভবতঃ আমার দাড়ি গোঁফ না হওয়ার কারণে তিনি আমার মুখমণ্ডলে হাত রাখলেন। এমতো অসৎ ধারণার কারণে আমার বাতেন জগতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। বারো বছর পর তিনি আমার মনের বদ ধারণা সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম দু'টি কারণে- প্রথমতঃ তিনি অন্তরের গুপ্ত রহস্য অবগত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী।

মোহাম্মদ এহসান বলেছেন, আমি আমার সন্তানের নাম রাখার জন্য হজরতের নিকটে আবেদন করলাম। মনে মনে বললাম, ছেলের নাম যদি মোহাম্মদ হাসান রাখা হতো। তিনি বললেন, আমি তোমার ছেলের নাম রাখলাম মোহাম্মদ হাসান। এমনিভাবে গোলাম আসকারী খান[১] তাঁর ছেলের নাম গোলাম কাদের খান রাখার কথা মনে মনে ভেবেছিলেন। হজরত তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে তাঁর ছেলের জন্য ওই নামই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

একদিন হজরত মির্জা মাযহার এক ভ্রষ্টা নারীর কবরের দিকে মনোযোগ দিয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন, মেয়েটির কবরে আগুন জ্বলছে। আর সে ওই আগুনের মধ্যে একবার শিয়রের দিকে আর একবার পায়ের দিকে যাচ্ছে। তার ইমানের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হলো। লেখক বলেন, অতঃপর তিনি কলেমা তাইয়্যেবার খতমের ছওয়াব তার রূহের উপর বখশে দিলেন। বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! কলেমা তাইয়্যেবা কাজ করেছে। সে আজাব থেকে নাজাত পেয়ে গেছে। লেখক শাহ গোলাম আলী বলছেন, হাদিস শরীফে এসেছে, কোনো ব্যক্তি যদি সত্তুর হাজার বার কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য, তাহলে তার গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

একদিন নওয়াব আমীর খানের কবরে মোরাকাবা করে তিনি বললেন, তাকে মাফ করে দেয়ার কারণ হচ্ছে তার সরদারী এবং সরদারী করার কারণে মানুষের নিন্দাবাদ ও অপমান। রসুলে করীম স. এর খান্দানের সাথে সম্পর্ক করা এই দুনিয়ায় মর্যাদা লাভের কারণ। দোষারোপকারীদের আমলের ছওয়াব দোষারোপ কৃতদের আমলনামায় লিখে দেয়া হয়।

এই কিতাবের লেখক বলছেন, এক ব্যক্তি হজরত শায়েখ আকবর মহিউদ্দীন র. কে স্বপ্নে দেখলো, তিনি মিম্বরে বসে ওয়াজ করছেন। অনেক নবী ও ওলিআল্লাহ্ সেখানে উপস্থিত। সেই ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনার মজলিশে আম্বিয়া কেরামের উপস্থিতি! এতো আশ্চর্যের ব্যাপার। তিনি বললেন, আমার এহেন সম্মান ও মর্যাদা তোমার কারণে অর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে তোমার গীবত ও সমালোচনাই আমার ছওয়াব ও ধারাবাহিক রহমতপ্রাপ্তির কারণ হয়েছে।

একবার এক বেআদব ব্যক্তি মির্জা সাহেবের কাশফকে অস্বীকার করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বললো, কবরটি আমার এক বন্ধুর। আপনি তার কবরের হাল একটু দেখুন। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, মিথ্যা কথা কেনো বলছো? কবরটি তো এক মেয়ে মানুষের। লোকটি বললো, আপনার কাশফের পরীক্ষা করার জন্যই আমি এরূপ করেছি।

এক লোক তাঁর খেদমতে এসে বললো, আমার ওমুক আত্মীয় হাল থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। এখন মনে হচ্ছে, তার হাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আপনি তার গোনাহ্ মাফের জন্য দোয়া করুন। তিনি ওই মাইয়্যেতের জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এস্তেগফার করে একাগ্রতার সাথে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। পরে তার এক প্রিয় ব্যক্তি স্বপ্নে তাকে দেখলো। সে বললো, হজরতের দোয়ার বরকতে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

তাঁর দোয়া এবং হিম্মতে বহু লোকের হাজত পূর্ণ হয়েছে এবং চরম রোগাক্রান্ত ব্যক্তিও আরোগ্যলাভ করেছে। তিনি বলতেন, আমরাতো ফকীর দরবেশ লোক। মানুষকে সাহায্য করার কীইবা ক্ষমতা আমাদের আছে। পীরানে কেরামের ওসিলায় রোগব্যাধি দূর হয় এবং আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে তারা আরোগ্য লাভ করে।

মীর আলী আসগরের মাতা অসুস্থ ছিলেন। তার ব্যাধি দূর করণার্থে তিনি তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। এলহাম হলো, এখনও রোগমুক্তির সময় হয়নি। কিছুদিন পর তিনি স্বীয় দৌলতখানায় ছিলেন। রোগিনী ছিলেন অনেক দূরে। গায়েব থেকে এলহাম হলো, রোগিনীটির রোগমুক্তির সময় হয়েছে। তিনি তার জন্য গায়েবানা দোয়া করলেন এবং রোগিনী তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলো।

তাঁর এক প্রতিবেশি মরণোন্মুখ ছিলো। তিনি দোয়া করলেন, ইয়া এলাহী! তার তিরোধানের কষ্ট সহ্য করার মতো শক্তি আমার নেই, তুমি তাকে নিরাময় করে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হলো। তিন দিনের মধ্যে লোকটি সুস্থ হয়ে গেলো। তার সেবাকারীগণ এই ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে বললো, মৃত্যুকে জীবিত করাতো হজরত ঈসা আ. এর মোজেযা ছিলো।

এই কিতাবের লেখক বলেছেন, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে সুস্থতায় নিয়ে আসা এ আর তেমন কী বিস্ময়ের ব্যাপার? রূহানী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে শেফাদান করার বিষয়টি তো তাঁর জন্য সর্বস্বীকৃত ছিলো। তাঁর অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করেছিলো। গায়রুল্লাহ্ থেকে ফানা লাভ করে আল্লাহ্র গুণাবলীতে বাকা লাভ করেছিলো। 'আশ্শায়খু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু' (শায়েখ জীবিত করতে পারেন এবং মৃত্যুও ঘটাতে পারেন) কথাটি তাঁর বেলায় প্রযোজ্য ছিলো। তিনি সুন্নতে নববী উজ্জীবিতকারী এবং বেদাতে সাইয়্যেআ বিনাশকারী ছিলেন। অন্তর থেকে মন্দ স্বভাব ধ্বংস করতেন এবং সৌন্দর্যসমূহ অন্তরে ঢেলে দিতেন।

গোলাম মোস্তফা খানের মৃত্যুর সময় দুর্বলতার কারণে তাঁর ঘাড় বুকের দিকে ঝুলে গিয়েছিলো। তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর নিকটাত্মীয়গণ তাঁর সুস্থতার জন্য হজরতের নিকট আবেদন জানালেন। দেখা গেলো, তাঁর শারীরিক দুর্বলতা কেটে গিয়ে শরীরে শক্তি ও হুঁশ ফিরে এসেছে। তিনি লোকজনের সাথে কথা বলতে শুরু করে দিলেন।

আসকারী খানের মাতা মহোদয়া, যিনি তাঁর তরিকায় দাখেল ছিলেন, একদিন মোরাকাবার পর তিনি হজরত মাযহারের জামা ধরে বললেন, আপনি আমার কন্যার সন্তান হওয়ার সুসংবাদ আমাকে যতোক্ষণ না শোনাবেন, আমি আপনার জামা ছাড়বো না। হজরত মাযহার সামান্য সময় চুপ থেকে বললেন, নিশ্চিন্ত থাকো। আল্লাহ্তায়ালা তোমার কন্যাকে সন্তান দান করবেন। পরবর্তীতে তাই হয়েছিলো।

এ কিতাবের লেখক শাহ গোলাম আলী দেহলভী বলছেন, এই ফরজন্দ (আমি) প্রথমে চিশতিয়া তরিকায় বায়াত গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখি, খাজা নকশ্বন্দ তশরীফ আনলেন এবং তিনি আমাকে বলেন, বৎস! আমার ঘর ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছো? তিনি আমার হালের উপর তাওয়াজ্জোহ্ দিলেন। তখন আমার কলবে জিকির জারী হয়ে গেলো। তারপর আমি মির্জা মাযহারের খেদমতে এসে নকশ্বন্দিয়া তরিকায় বায়াত গ্রহণ করলাম।

মির্জা মাযহার বলেছেন, একবার আমি সফরের সরঞ্জাম জোগাড় না করেই সফরে বের হলাম। আল্লাহ্তায়ালা সকল স্থানেই অপরিচিত লোকদের দ্বারা আমার সফরের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলেন। পথিমধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। ঠাণ্ডাও ছিলো প্রকট। সাথীসঙ্গীগণের খুব কষ্ট হচ্ছিলো। আমি দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি দিন এবং আমরা যেনো শুকনো অবস্থায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারি। বাস্তবে তাই হয়েছিলো। তাঁর রাগ ও আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ্তায়ালার কাহ্হারিয়াত সিফতের বহিঃপ্রকাশ ও তার নমুনা ছিলো।

তিনি বলেছেন, প্রথম দিকে যারা আমার কাছ থেকে তরিকার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো, আমি তাদেরকে আমার নাম বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, তোমরা সবার সামনে আমার নাম বলবে না। একদিন হজরত হাফেজ সাদুল্লাহ র. মোহাম্মদ রাফীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই তরিকা কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছো? সে বললো, আমার বুজুর্গগণ থেকে। তাঁর উচিত ছিলো তাঁর সামনে এই ফকীরের নাম বলা। এতে আমার খুব রাগ হলো– আমি তার প্রতি অসন্তুস্ট হলাম। দেখলাম, এই তরিকার মাশায়েখগণ হজরত আবু বকর সিদ্দীক পর্যন্ত সবাই তার প্রতি বিরূপ। তার দু'তিন দিন পর সে হালাক হয়ে গেলো। তাছাড়া আরও কিছু বেআদবের এ রকম শাস্তি হয়েছিলো।

তিনি বলতেন, আমার মেজাজ খুব নরম এবং আমার রাগ অত্যন্ত শক্ত। কিন্তু এরূপ স্বভাব হেদায়েত এরশাদের কাজের জন্য উপযুক্ত নয়। সে জন্য আমি কয়েক বছর পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করেছি। তারপর তিনি আমার রাগের তলোয়ারকে ভোঁতা করে দিয়েছেন। কিন্তু রাগের কঠোরতা কমেনি। যার উপর আমার রাগ হয়, তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়। তার বাতেনী নেসবত

ধ্বংস হয়ে যায়। আমি অসন্তুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে তার নেসবত শেহাবে ছাকেবের কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো যথা মাকাম থেকে নিচে নেমে আসে। আর আমার সন্তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার নেসবত আতশী হাওয়ার মতো উপরে উঠে যথাস্থানে স্থিত হয়।

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর কাশফ ও কারামত অনেক ছিলো। এখানে শুধু দু'তিনটি বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কেনোনা তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট কারামত ছিলো হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর অনুসরণের উপর দৃঢ়তা এবং তালেবগণকে পথপ্রদর্শন। তাদেরকে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। তাঁর থেকে এ প্রকারের কারামত প্রকাশিত হওয়া দিবালোকের চেয়ে সুস্পষ্ট এবং অতীতের চেয়ে সমুজ্জ্বল ছিলো।

তথ্যপঞ্জি

১. গোলাম আসকারী খান ছিলেন মিয়া মোহাম্মদ এহসানের ভাই। তিনি হজরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর আওলাদ এবং এমাদুল মুলকের সিলসিলাভুক্ত ছিলেন।

২. উমদাতুল্‌মুলক আমীর খান আঞ্জাম মোহাম্মদ শাহীর শাসনামলে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তিনি এলাহাবাদের গর্ভনরও ছিলেন। মোগল শাসনামলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইরান অঞ্চলের প্রতিনিধি ছিলেন।

৩. পীর আলী হজরত মাযহারের স্ত্রীর পালকপুত্র ছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়

মির্জা মাযহারের নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে যাত্রা

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদের ইনতেকালের কিছু কাল পূর্বে রফীকে আলার সাথে মোলাকাতের বাসনা প্রবল হয়ে গিয়েছিলো। তখন থেকেই এ জগতবাসীর প্রতি তাঁর দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছিলো। দিব্যসত্তার দীদারের নিমজ্জন মুহুর্মুহু বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তিনি ওজিফা ও ইবাদত-বন্দেগী বাড়িয়ে দিলেন। ক্রমশ তরিকাপন্থীদের ভীড় বাড়তে লাগলো। দলে দলে লোক এসে এই তরিকায় দাখেল হতে লাগলো। জিকিরের হালকা ও মোরাকাবার মধ্যে পূর্ণ খাতিরজমা থাকার কারণে মোখলেছ লোকদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলো। দু'বেলায়ই একশ' লোকের অধিক তাঁর সোহবতে হাজির থাকতো এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে পূর্ণ নূর ও বরকতের দ্বারা উন্নতি করতো। তিনি মোল্লা নাসীমকে বিদায় দান কালে বলেছিলেন, এখন থেকে আমার ও তোমার মোলাকাতের তরিকা আমার অজানা। বিদায়কালে তাঁর এই কথাগুলো, যা তাঁর ইনতেকালের পূর্বাভাস ছিলো, তা অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো। তা শুনে মানুষের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো।

মোল্লা আব্দুর রাজ্জাককে লিখেছিলেন, আমার বয়স এখন আশি বছরের ঊর্ধ্বে। সময় নিকটবর্তী। তোমাদের দোয়া খায়েরের মধ্যে আমাকে স্মরণ রাখা উচিত। অন্যান্য প্রিয়জনদের কাছেও তিনি এরকম কথা লিখেছিলেন, যা ছিলো অপ্রিয় ঘটনার নিদর্শন। একদিন বললেন, আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতসমূহ প্রকাশের জন্য শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য। আরও বললেন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে আমার যাবতীয় বাসনা পূর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে প্রকৃত ইসলামের দীক্ষাদানে ধন্য করেছেন। এলেমের বহুত বড় অংশ দান করেছেন। নেক আমল করার উপর দৃঢ়তা দান করেছেন। তরিকার আনুষঙ্গিকতা অর্থাৎ কাশফ, পরিবর্তনক্ষমতা ও কারামত দান করেছেন। সালেহ বান্দাগণকে ফয়েজ হাসিলের জন্য আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে তরিকার মাকামসমূহে পৌঁছে দিয়ে তাঁর পথের হেদায়েতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাদেরকে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের থেকে পৃথক রেখেছেন। অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর বাসনা আসতে দেননি। তবে এখানে আমার একটি বাসনা এখনও বাকি আছে। তা হচ্ছে, বাহ্যিক শাহাদত। এ বাহ্যিক শাহাদত নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর। আমার বুজুর্গগণের মধ্য থেকে অধিকাংশজনই শাহাদতের শরবত পান করেছেন। তবে আমি খুবই দুর্বল। আমার দুর্বলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এহেন অবস্থায়

জেহাদ করার মতো শক্তি আমার নেই। বাহ্যিকভাবে এই মযার্দা লাভ করা আমার জন্য কঠিন বলে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আমি ওই ব্যক্তির উপর আশ্চর্যান্বিত হই, যে মৃত্যুকে পছন্দ করে না। এই মৃত্যুই একমাত্র মাধ্যমে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার সঙ্গে মোলাকাত হতে পারে। এই মৃত্যুই একমাত্র ওসিলা, যার দ্বারা রসুল স. এর জিয়ারত লাভ হয়। আওলিয়া কেরামের দীদার হাসিল হয়। প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ পাওয়া যায়। আমি দ্বীনের মহান ব্যক্তিবর্গের পবিত্র আত্মাসমূহের জিয়ারতপ্রত্যাশী। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এবং হজরত ইব্রাহীম খলীল আ. এর দীদার লাভের প্রবল প্রত্যাশী। আমীরুল মুমিনীন হজরত সিদ্দীকে আকবর, হজরত ইমাম হাসান, সাইয়্যেদুত্তায়েফা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী, হজরত খাজা নকশ্‌বন্দ, হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি প্রমুখ বুজুর্গানের জিয়ারত লাভের মাধ্যমে ফয়েজপ্রাপ্ত হওয়ার আকাংখা পোষণ করি। আমার অন্তরে ওই মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর অন্তরের সেই বাসনাকে জালওয়াগার করে দিলেন এবং তাঁকে শাহাদতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বাতেনী শাহাদত সুফীগণের পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ বলা হয়, তার সাথে জাহেরী শাহাদতকে সন্নিবেশিত করে দিলেন। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর নৈকট্যের স্তরসমূহ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিলেন।

১১৯৫ হিজরী মহররম মাসের ৭ তারিখ মঙ্গলবার।[১] দিবস অতিক্রান্ত হলো। রাতের কিছু অংশও অতিবাহিত হলো। এমন সময় কয়েকজন লোক হজরতের দরজায় করাঘাত করলো। খাদেম তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলেন, কয়েকজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। তিনি বললেন, তাদেরকে আসতে দাও। দরোজা খুলে দিতেই তিনজন লোক ভিতরে প্রবেশ করলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলো ইরানী। তিনি শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের মাঝখানে বসে গেলেন। লোকটি বললো, মির্জা জানে জানান কি আপনি? তিনি বললেন, হাঁ। অপর দু'জনও তাঁর একথা সমর্থন করে বললো, হাঁ, ইনিই মির্জা জানে জানান। সেই বদ্‌বখত্ তৎক্ষণাৎ পিস্তল দিয়ে তাঁকে গুলি করলো। গুলিটি তাঁর বুকের বাম পাশে কলবের কাছে বিদ্ধ হলো। বার্ধক্য ও চরম দুর্বলতার কারণে তাঁর পবিত্র দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

মানুষের মধ্যে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচারকারী আনা হলো। সকাল বেলা নওয়াব নজফ খান এক ইংরেজ চিকিৎসকের মাধ্যমে এই ঘোষণা জানিয়ে দিলেন যে, কোন বদ্‌বখত্‌রা এরকম কবীরা গোনাহ্ করেছে তা জানা গেলো না। যদি কোনো তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই এর বদলা নেয়া হবে।

মির্জা মাযহার র. বললেন, শেফা দেয়া যদি আল্লাহ্তায়ালার মর্জি হয়, তাহলে যে কোনো অবস্থায়ই জখম শুকিয়ে যাবে। এর জন্য কোনো অস্ত্রোপচারকারীর প্রয়োজন নেই। যে এ কাজ করেছে, যদি জানাও যায়, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। তোমরাও তাকে ক্ষমা করে দিয়ো।[২]

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তিন দিন তিনি জাগতিক হায়াতে আবদ্ধ ছিলেন। প্রতিদিন শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তৃতীয় দিন শুক্রবার ফজরের নামাজের পর আমাকে (লেখক শাহ গোলাম আলী দেহলভী) বললেন, আমার তো এগারো ওয়াক্তের নামাজ কাযা হয়েছে। সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত। মাথা উঠানোর মতো শক্তি নেই। এমতোক্ষেত্রে মাসআলা তো হচ্ছে, রোগের কারণে মাথা তুলতে না পারলে নামাজ মওকুফ হবে। চোখের পাতা দ্বারা ইশারা করে নামাজ পড়লে আদায় হবে না। এ মাসআলা সম্পর্কে তোমার কি জানা আছে? আমি বললাম, এক্ষেত্রে মাসআলা ওরকমই, যে রকম আপনি বললেন।

অর্ধ দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ ফাতেহা পাঠ করলেন। হজরত খাজা নকশ্বন্দও এরকমভাবে ফাতেহা পাঠ করেছিলেন। আসরের সময় আমি (লেখক) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, বেলা আর কতোটুকু বাকি আছে? আমি বললাম, চার ঘন্টা। তিনি বললেন, মাগরিবের তো এখনও দেরী। মহররমের দশ তারিখ মাগরিবের নামাজের সময় দু'তিনবার ভারী শ্বাসনিশ্বাস নিতে দেখা গেলো। এভাবে তাঁর পবিত্র রূহ এই নশ্বর জগত ছেড়ে অবিনশ্বর জগতের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো।[৩]

রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ওয়াজাযাহুল্লাহু অজন্না খইরল জাযা (আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন)।

তাঁর ওফাতের তারিখ নিয়ে বহু বর্ণনা রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে আয়াতে কারীমা– 'ফাউলাইকা মাআ'ল লাজীনা আনআ'মাল্লাহু আ'লাইহিম' (ওই সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন)[৪] এই আয়াতের হরফসমূহের আবজদী হিসাব অনুসারে সংখ্যা হয় ১১৯৫ হিজরী। আর অপরটি হচ্ছে রসুলেপাক স. এর বাণী যা তিনি তাঁর কোনো এক প্রিয় সাহাবীর শানে বলেছিলেন– 'আশা হামীদান মাতা শাহীদান' (সে প্রশংসনীয় জীবন যাপন করেছে এবং শাহাদতের মৃত্যু বরণ করেছে)[৫] এই বাণীর হরফসমূহের আবজদী সংখ্যাও ১১৯৫ হিজরী।

তাঁর পরলোকযাত্রার রাতে তাঁর কোনো এক প্রিয়ভাজন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন, কোরআন মজীদের অর্ধেক আকাশের দিকে উড়ে গেলো এবং দ্বীন ইসলামের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেলো। লেখক বলেন, এই স্বপ্নের তাবীর হজরতের বাণীরই প্রমাণ

স্বরূপ। তিনি বলতেন, আমার ইনতেকালের পর তরিকার মাকামসমূহ স্থগিত হয়ে যাবে। এই খান্দানের লোকদের মধ্যে নেসবত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও তা কেবলমাত্র বেলায়েত পর্যন্ত পৌঁছবে। তাঁর ইনতেকালের পর ষোল বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে (কিতাব রচনা কালে)।[৬] হজরতের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যারা দূর দূরান্তের শহরে বাস করেন, সে সকল সাথীর হালের বর্ণনাও শুনেছি। তাঁদের হাল ও কাইফিয়ত বেলায়েতে কলবী পর্যন্তও যদি পৌঁছে থাকে, তাহলে তা গনিমত তুল্য। উচ্চতর হাল অর্জন সে তো অনেক দূরের বিষয়। সে পর্যন্ত পৌঁছা খুবই কঠিন কাজ। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

আর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন, সূর্য আকাশের দিক থেকে পৃথিবীর দিকে চলে আসছে এবং পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। একথা সত্য যে, তাঁর অবস্থান পৃথিবীবাসীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ ছিলো। তাঁর ইনতেকালের পর বিভিন্ন প্রকারের বালা মুসিবতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর ইনতেকালের পর পুরো তিন বছর দুর্ভিক্ষের থাবা পৃথিবীবাসীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলো। উন্মত্ততা, চর্মরোগ ও বসন্তরোগে ভারত ছেয়ে গিয়েছিলো। কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থা ছিলো এরকম। এরকম অবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। নজফখান যে মির্জা সাহেবের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলো, সে এ কাজে গাফেলতি করে তার বাস্তবায়ন করেনি। ফলে খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করেছিলো সে। তার সাথী-সঙ্গীরা পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, যদিও মির্জা সাহেব তাঁর খুনের বদলা মাফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার গজব তাঁর বন্ধুর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি।

হীচে কওমী রা খোদা রেছওয়া না কার্দ
তা দেলে সাহেব দেলে নামদ বদবদ

(আল্লাহ্‌তায়ালা কোনো কাওমকে ওই সময় পর্যন্ত অপদস্থ করেন না, যতক্ষণ না তারা কোনো সাহেবে দিলকে অসন্তুষ্ট করে)।

নিঃসন্দেহে মির্জা মাযহারের নিকট তাঁর জীবনের এই ঘটনার বিষয়ে এলেম ছিলো। তাই তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন–

বলওহে তুরবতে মান ইয়াফতান্দ আয গায়র তাহরীরে
কে ই মকতুল রা জুস বে গোনাহী নিস্ত তাকসীরে

(আমার মাজারের ফলকে গায়েব থেকে লেখা হয়েছে, এই মাকতুলের (নিহত ব্যক্তির) বে-গোনাহ্ হওয়া ছাড়া আর কোনো অপরাধ নেই)।

যে রাতে তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো, সেদিন অর্ধ দিবস পর্যন্ত বৃষ্টি পড়েছিলো। ছয়মাস পর্যন্ত সে বৃষ্টিপাত বন্ধ ছিলো। তারপর এতো বৃষ্টি হয়েছিলো

যেনো চতুর্দিকে রহমতের পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর মাজার শরীফে নূর ও বরকতের এমন প্রবাহ জারী হয়েছিলো, যার দ্বারা জিয়ারতকারীদের দিল আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাজার শরীফ থেকে তাঁর রূহানী তাওয়াজ্জোহ ও নূর সংগ্রহকারীদের হালের সাথে সন্নিবেশিত হয়ে গিয়েছিলো। তারা আপন আপন বাতেন জগতে উন্নতি অনুভব করেছিলো।

মির্জা ইব্রাহীম বেগ, যে আমার (লেখকের) কাছ থেকে কলবের স্তরের তাওয়াজ্জোহ্ নিয়েছিলো, সে মির্জা সাহেবের মাজার শরীফ জিয়ারত করতে গিয়েছিলো। তিনি তখন তাকে লতীফায়ে দেমাগী (মস্তিস্কের লতিফায়) তাওয়াজ্জোহ দিয়েছিলেন, যার প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে তিনমাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো।

এসালত খান বিভিন্ন সন্দেহ ও উদ্বেগের কারণে তার বাতেনী হালসমূহ নষ্ট করে ফেলেছিলো। কয়েক বছর পর সে তাঁর মাজার শরীফে এসে তাওয়াজ্জোহের জন্য নিবেদন করলো। অর্ধ দিবসের চেয়ে বেশী সময় ধরে সে তাঁর পবিত্ররূহের প্রতি মনোযোগ দিয়ে বসে রইলো। ফলে তার পূর্বের হালসমূহ এমনভাবে পুনরায় ফিরে এলো, যেনো তার মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো ত্রুটিই ছিলো না।

জনৈক দরবেশ বলেছেন, তাঁর মাজার শরীফ থেকে ফয়েজ প্রত্যাশী জিয়ারতকারীগণ অনেক ফায়দা হাসিল করতে পেরেছে। একদিন আমি বললাম, আমার হালের প্রতি আপনি পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ প্রদান করুন। তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করলেন। আমি অনেক রূহানী উন্নতি অনুভব করলাম। জিয়ারত করে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমার এক বন্ধু যিনি বাতেনী হাল খুব ভালোভাবে চিনতে পারতেন, তিনি বললেন, আজ তো তোমার হালসমূহের বিশেষ উন্নতি মনে হচ্ছে। আমি বললাম, কেনো হবে না ? হজরত তো আমার হালের প্রতি পূর্ণ তাওয়াজ্জোহ প্রদান করেছেন।

এ তরিকার মাকামধারীগণ যারা আপন আপন মাকামে কামিয়াব হয়েছেন, তাঁরা তাঁর মোবারক মাজার জিয়ারত করে বাতেনের নূরসমূহে উন্নতি অনুভব করে থাকেন। কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন, মির্জা সাহেবের মাজার শরীফের ফয়েজ বাতেন জগতে পূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কেনোনা এ শহরে (দিল্লীতে) মোজাদ্দেদিয়া তরিকার কোনো মাজার এ রকম উচ্চ শান এবং নেসবত জারী করার শক্তি রাখে না।

এক ব্যক্তি তাঁর মাজার শরীফে অবস্থান করছিলো। এক রাতে সে জাগ্রত হতে অলসতা করেছিলো। তখন তিনি মাজার শরীফ থেকে বাইরে এসে তাকে জাগ্রত করে বললেন, তুমি কি আমাকে মৃত মনে করেছো? তোমার সমস্ত অবস্থা আমার জানা আছে। ওঠো। নামাজ আদায় করো।

মোখলেছ সালেকগণের প্রতি তাঁর খুব লক্ষ্য থাকতো। কাযী ছানাউল্লাহ পানি পথি একদিন স্বপ্নে দেখেন, তিনি তাঁকে বলছেন, স্বস্থানে অবস্থান করো। এ ফকীর তোমার সঙ্গে আছে। আমার ইনতেকালের পর তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

তাঁর কোনো এক প্রিয় ব্যক্তি জীবিকার চিন্তায় চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে তাঁকে বললেন, জীবিকার জন্য তুমি কোনো চিন্তা কোরোনা। আমি তোমার জীবিকার জন্য পূর্বের চেয়ে আরও অধিক উত্তম তদবীর করবো। ফল তাই হয়েছিলো।

মৌলভী নাঈমুল্লাহ কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য ছামান প্রস্তুত করছিলেন। স্বপ্নে হাজির হয়ে তিনি তাঁকে বললেন, এ কাজ আঞ্জাম দেয়া আমার দায়িত্ব। সকাল বেলা দেখা গেলো, সে কাজ সুন্দরভাবে সমাধা হয়ে গিয়েছে।

মির্জা মাযহারের পূতপবিত্রা স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে তরিকার তালীম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর সোহবতের মাধ্যমে হুজুর ও চৈতন্য লাভ করেছিলেন। নেক্‌কার রমণীদের পথপ্রদর্শনের জন্য তাঁকে এজাযত দেয়া হয়েছিলো। তাঁর মাধ্যমে রমণীগণ কলবে উত্তাপের তাছীর অনুভব করতেন। তিনিও মির্জা সাহেবের ইনতেকালের পর সুসংবাদমূলক স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, রসুলেপাক স. অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর হালের প্রতি মেহেরবানি করছেন। যার ফলে তাঁর বাতেনী হাল বৃদ্ধি পেয়েছিলো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সেখানে খুশবু ছড়িয়েছিলো। মোজাদ্দেদে আলফেসানিও তাঁর হালের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাঁর উচ্চস্তরের রূহানী তাওয়াজ্জোহের বরকত তিনি তাঁর অন্তর্জগতে অনুভব করতেন।

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর উন্মাদনা রোগ দেখা দিয়েছিলো। পাগলামী এতো প্রবল আকার ধারণ করেছিলো যে, স্বাভাবিক আকল আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিলো। তখন থেকে তাঁর সাথে তাঁর বনি বনা খুব কম হতো। সে কারণে তাঁর বাতেনের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিলো। তাঁর বাতেনী নেসবতে যে প্রতিক্রিয়া এবং উত্তাপ ছিলো, তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি তার উন্মাদনা সুলভ আচরণ মাফ করে দিয়েছি। কেনোনা উন্মাদগণ মাযুর। আমার কাছে আগমনকারী মোখলেছ ব্যক্তিগণ তার সাথে বিনম্র আচরণ করতো। আমি তার বিরুদ্ধবাদিতার উপর ধৈর্য ধারণ করেছি। যার ফলে আমার অনেক উপকার হয়েছিলো। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কেনোনা আমার উপর তার অনেক এহসান আছে।

তথ্যপঞ্জি

১. কুদরতুল্লাহ গোপামভী বর্ণনা করেছেন, হজরত মাযহার শহীদ হওয়ার রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য উঠেছিলেন। তখনই ঘটনাটি সংঘটিত হয়। গোপামভীর এই বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেনোনা আমি (এই কিতাবের লেখক) ওই ঘটনার সময় খানকায় উপস্থিত ছিলাম। আমার দর্শন ইন্দ্রীয়ই তার সাক্ষী।

২. মামুলাতে মাযহারিয়া কিতাবে নজফখান ছাড়াও সে সময়ের বাদশাহ্ শাহ্ আলম সানী মির্জা মাযহারের শাহাদতের ঘটনার সময় অপরাধীদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিলেন। বাদশাহ্ সব সময়ই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি। অবশেষে তিনি বলেছিলেন, আপনারা যদি অপরাধীদের ব্যাপারে কোনো তথ্য পান তাহলে অবগত করাবেন, যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মির্জা মাযহার উত্তরে বলেছিলেন, কেসাস তো শরীয়তের বিধান অনুসারে জীবিত লোকের জন্য গ্রহণ করা হয়। আমি তো মৃতদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এক্ষেত্রে কেসাস জায়েয হবে না। বাদশাহ্ যদি অপরাধীদের খোঁজ পান, তাহলে তিনি যেনো তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, যাতে করে তাদের সাথে তরিকত মোতাবেক আচরণ করা যায়। অর্থাৎ তাদেরকে যেনো মাফ করে দেয়া যায়। আফতাব রায় লখনৌভী সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, নজফ খানের জনৈক বন্ধু হজরত মাযহারের উপর হামলা করেছিলো।

তাযকেরা রিয়াযুল আরেফীন, কৃত হুছামুদ্দীন রাশেদী, রাওয়াল পিণ্ডি, প্রকাশকাল ১৯৮২, ২১/২১৪।

৩. হজরত মাযহারের এক খলীফা ছিলেন মীর আব্দুল বাকী। তিনি ওই বৎসর ১১৯৫ হিজরী হজরতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আকবরাবাদ রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি জানতে পারলেন, হজরতকে কোনো এক রাফেজী পিস্তল দিয়ে গুলি করে শহীদ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লীতে ফিরে আসেন। বিস্তারিত জানার পর ঘটনাপ্রবাহ তাঁর রচিত মাআলুল কামাল কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেছেন, দাফনের ফয়সালা উত্তরাধিকারীগণের উপর ন্যস্ত ছিলো। যখন দাফনের সময় হলো, তখন তাঁরা মুরিদগণের সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাঁকে তাঁর বসতবাড়িতে দাফন করেন। কেউই সুরতহাল ঠিক করার ইচ্ছা করেননি। অবশেষে সেখানেই তাঁর জন্য কবর খনন করা হলো। কাফন মোবারকের সঙ্গে যে সবুজ চাদর ছিলো তা সরিয়ে দেয়া হলো এবং তদস্থলে সাদা চাদর রাখা হলো।

৪. আল কোরআন, সুরা নিসা–৪/৬৯। এখানে উলাইকা শব্দের হামযাতে দশ সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

৫. আশা হামীদান মাতা শাহীদান– ইবনে মাজা, লেবাস অধ্যায়-২, ও মসনদে হাম্বল ২/৮৯ থেকে নেয়া হয়েছে।

৬. মাক্বামাতে মাযহারীর রচনাকাল ১২১১ হিজরী, ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

৭. হজরত মির্জা মাযহারের স্ত্রীর নাম ছিলো মোর্দেলমহল। আব্দুর রাজ্জাক কুরাইশীর সম্পাদনায় 'মাকাতিবে হজরত মাযহার' এর বিভিন্ন স্থানে এই নাম পাওয়া যায়।

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

মির্জা মাযহারের আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভকারী খলীফাবৃন্দ

তাঁর খলীফা অনেক ছিলেন। এ পুস্তকে তাঁদের সকলের জীবনধারা বর্ণনা করার সুযোগ নেই। শুধুমাত্র একস্তরের কতিপয় খলীফার জীবনধারা বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। তাও তাঁদের জীবনের সকল দিক নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের জীবনের ওই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করতে চাই, যা মির্জা মাযহারের সোহবতে থেকে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি এবং তাঁর দেয়া সুসংবাদ অনুসারে তাঁদের মাকাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই আকাবেরগণের বাতেনী কাইফিয়ত ও নূর আমার অনুভূতি দ্বারা জানতে পেরেছি, তাই কেবল সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। বিস্তারিত লেখার প্রয়োজনও নেই।

কোনো ব্যক্তির বাতেনী হাল, নিমজ্জন, উন্মত্ততা, আস্বাদ, প্রেরণা এবং তৌহিদের অবস্থা প্রকাশিত হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ নয়। তাছাড়া এসব সাথীগণ থেকে সেধরনের হাল ও কারামতও অধিক পরিমাণে ছিলো বলেও বর্ণনা নেই। তাঁরা নৈকট্যের মাকামসমূহে অন্যান্য আউলিয়া কেরামের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। ফলে এ সকল আকাবেরগণের বাতেন জগতে যে সকল হাল পতিত হতো, অনুভূতি তা ধারণ করতে অক্ষম। এ তরিকার সাথীগণের মাকামের বিভিন্নতার কারণে হালের মধ্যে তারতম্য ছিলো। কিন্তু তাঁরা প্রশান্তি অর্জন, হুজুরীর যোগ্যতার দৃঢ়তা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে নেসবত, চরিত্র সজ্জিতকরণ এবং সুন্নতের অনুসরণের দিক দিয়ে সকলেই সমান ছিলেন। তাঁদের প্রসিদ্ধ হালসমূহ অর্থাৎ উন্মত্ততা, আস্বাদ-প্রেরণা, নিমজ্জন, আত্মহারা হওয়া ইত্যাদি তৌহিদের সত্যতা অনুসারেই ছিলো। এ সমস্ত বিষয়ে সালেকগণের জ্ঞান কলব লতীফা অনুসারেই হয়ে থাকে। অন্যান্য লতীফার এলেম ও হাল অর্জন ভিন্ন বিষয়। সেই সকল মাকামে পৌঁছা ব্যতীত তা বিশ্বাসের কল্পনাই করা যায় না। কেনোনা সেসব হাল ও কাইফিয়ত নতুন। আয়াতে কারীমা 'ওয়ালা ইউহীতূনা বিহী ইলমান' (তারা এলেম দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না)[১] সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

১. হজরত মীর মুসলমান

তিনি একজন খাঁটি বংশের নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। তিনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার আসবাব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। জাহেরী ও বাতেনী এলেম অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি আমার

সহপাঠী ছিলেন। তিনি তাঁর মাশায়েখে কেরামের সোহবতে থেকে তরিকার মাকামসমূহ হাসিল করেছিলেন এবং হজরত মাযহারের কাছ থেকেও ফায়দা হাসিল করেছিলেন। তিনি তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। কেনোনা পীরানে কেরামের দৃষ্টি সব সময় তাঁর প্রতি নিবদ্ধ থাকতো। তরিকতের পথে বুজুর্গগণের জিয়ারত এবং তাঁদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করাতে সালেকগণের মর্যাদা লাভ হয়। শায়েখ ও সালেকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ সুদৃঢ় ইত্তেহাদ (একাত্মতা) এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, পুরানো দিনগুলোর কথা মনে হলে আমার হৃদয়ে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, নিজের একাকিত্বের জন্য নিজের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়, যা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। এই মর্মে তিনি তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন−

সাকাল্লাহু ওয়াকতান কুন্তু আখলু বিওয়াজহিকুম
ওয়াতাগযুল হাওয়া ফী রাওযাতিল উনসি যাহেকু
আক্বামনা যামানা ওয়াল উয়ুনু কারীরা
আসবাহাত ইয়াউমান ওয়াল জুফুনু সাওয়াফিকু

(আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রচুর সময় দান করেছিলেন, যাতে তোমাদের তুষ্টি নিয়ে আমি ব্যস্ত ছিলাম। তাঁর প্রেম কাননে আমার প্রবৃত্তি ছিলো হাস্যোজ্জ্বল। সে সময় আমি এমনভাবে অবস্থান করেছিলাম যে, চক্ষুগুলো ছিলো শীতল। আর সেই চক্ষুর পাতাগুলো একদিন হয়ে গেলো অশ্রুবিসর্জনকারী)।

শায়েখ আহমদের দরবারের খাদেম তার কাজে নিয়োজিত। তার কলব লতীফা কালেব (দেহ কাঠামো) এর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছে। এ ব্যক্তির যোগ্যতা দুর্বল। পতনোন্মুখ অবস্থায় সে তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ্তায়ালা যেনো তাকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দেন। কলব ও কালেবের ব্যাধিসমূহ দূর করা আমার হজরতের নিয়ম-নীতি। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে এই শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন। তারপরও তিনি তাঁর অযোগ্যতা প্রকাশার্থে নিজেকে মাযুর মনে করেন।

হজরত মীর মুসলমান ফয়জুল্লাহ খানকে নিজের সামনে বসিয়ে প্রত্যেক দিন পাঁচশ' দম এর আমল দিয়ে এ ব্যাধি দূর করার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, হেজাজ সফর করার ইচ্ছা বরকতময়। কিন্তু এ ধরনের নেক আমলের জন্য চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। এমন যেনো না হয় যে, এর জন্য কারও শরীয়তসম্মত হক নষ্ট হয়ে যায়।

মীর মুসলমানের তিরোধানে মির্জা মাযহার র. খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি মীর মুবীন খানকে লিখেছিলেন, মীর মুসলমানের ওফাতের খবর শুনে আমার অবস্থা কী লিখবো, আমার উপর দিয়ে যে কী অতিবাহিত হচ্ছে তা আমি ভাষায়

প্রকাশ করতে অক্ষম। মির্জা সাহেব আরও লিখেছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমিও রাস্তার মাথায় বসে আছি। তাঁর ওফাতের অবস্থা ও দাফনের স্থান সম্পর্কে আমাকে লিখে জানিয়ো। কয়েক মাস আর বাকী আছে। আল্লাহ্তায়ালা যেনো এই অধমকে তাঁর রেজামন্দিতে রেখে এ সময়টুকু অতিবাহিত করিয়ে দেন।

২. কাযী মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথি

কাযী মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথি মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদের প্রথম দিকের খলীফা ছিলেন। তাঁর নসবনামা এগারো ওয়াসেতায় হজরত শায়েখ জালাল কবীর আওলিয়া চিশতী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর হজরত জালাল কবীরের নসব পৌঁছেছে আমীরুল মুমিনীন হজরত ওছমান রা. পর্যন্ত।

হজরত কাযী ছানাউল্লাহ উলামা রব্বানীগণের অন্যতম এবং আল্লাহ্তায়ালার দরবারের নৈকট্যভাজন বুজুর্গ ছিলেন। আকলী ও নকলী (জ্ঞানগত ও বর্ণনাগত) এলেমে তিনি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। এলমে ফেকাহ্ ও উসুলে তিনি মুজতাহিদের স্তরে পৌঁছেছিলেন।

তিনি এলমে ফেকাহ্র উপর একটি বিস্তারিত কিতাব লিখেছেন,[২] যার মধ্যে প্রত্যেক মাসআলার উৎস, দলীল এবং চার মাযহাবের মধ্যে মুজতাহিদগণের পছন্দনীয় দিক উল্লেখ করেছেন। এ সব মাসআলার মধ্যে যা তাঁর নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ সেগুলি একটি পৃথক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন। যার নাম– 'মাখাসুল আকওয়া'। উসুলে ফেকাহ্ বিষয়েও তাঁর পছন্দনীয় বিষয়গুলি লিখেছেন। তিনি একটি বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওই তাফসীর গ্রন্থে তিনি প্রাচীন মুফাস্সিরগণের উক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কোরআনে কারীমের নতুন নতুন তাবীল উপস্থাপন করেছেন, যা ফয়েজদানকারী আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর লতীফা রূহানীর উপর এলকা করেছিলেন।[৩] এলমে তাসাউফ বিষয়ে তাঁর বেশ কিছু পুস্তিকা ছিলো[৪] এবং তিনি মোজাদ্দেদে আলফেসানির মারেফতসমূহের উপর পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

তিনি প্রথমে তরিকা হাসিল করেছিলেন শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর কাছ থেকে। তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে কলবের ফানা স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। অতঃপর শায়েখের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর উন্নত তরবিয়তের বদৌলতে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মাকামসমূহ অর্জন করেন। নেহায়েত ক্ষিপ্রতা ও আগ্রহের সাথে সায়ের সুলুক করে এই তরিকার পরিপূর্ণ সুলুক পঞ্চাশ তাওয়াজ্জোহে সমাপ্ত করে নিয়েছিলেন।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি আঠারো বছর বয়সে জাহেরী এলেম হাসিল শেষে তরিকার খেলাফত লাভ করেছিলেন এবং এলেম প্রসার ও বাতেনের ফয়েজ প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তারপর তিনি হেদায়েত ও এরশাদের কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর পীর হজরত মির্জা মাযহারের কাছ থেকে 'আলামুল হুদা' উপাধি পেয়েছিলেন।[৫] তিনি বাল্যবেলায় স্বপ্নে তাঁর দাদা শায়েখ জালাল পানিপথির জিয়ারত লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর হালের উপর বহুত মেহেরবানি করেছিলেন এবং তাঁর পেশানী তাঁর পেশানীর সাথে ঘষে দিয়েছিলেন। ওই বয়সেই তিনি হজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী র. এর জিয়ারতও লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁকে তাজা খেজুর দান করেছিলেন। একবার তিনি আমীরুল মুমিনীন হজরত আলীকেও স্বপ্নে দেখেছিলেন। তিনি অতি আনন্দের সাথে কাযী সাহেবের ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'আন্তামিন্নী বিমানযিলাতি হারুনা মিন মুসা'[৬] (আমার সাথে তোমার ওই রকম সম্বন্ধ যেরকম সম্বন্ধ ছিলো মুসার সাথে নবী হারুনের)। তিনি এই স্বপ্নের তাবীর এভাবে করেছিলেন যে, এ ফকীরের দৈহিক আকৃতি আমার পিতামহ হজরত আলীর মতো। হজরত আলী ওই উক্তির মাধ্যমে তাঁকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই তরিকার খেলাফত সম্ভবতঃ তোমার দিকেই স্থানান্তরিত হবে। মির্জা মাযহারের পরলোকগমনের পর তিনি হজরত বড় পীর সাহেবকে স্বপ্নে দেখেন। দেখেন, তিনি তশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং হজরত মির্জা সাহেবের পরলোকগমণের উপর দুঃখপ্রকাশ করছেন। মির্জা মাযহার কাযী সাহেবের প্রশংসা করে বলতেন, আমার নেসবত এবং তার নেসবতের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে সমতা রয়েছে। তবে পরিবেশন ও শক্তির দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। সে আমার সাথে যুক্ত আর আমি আমার শায়েখের সাথে যুক্ত। আমার শায়েখ থেকে যে ফয়েজই আমার কাছে পৌঁছে, সেও তাতে শরীক। তার দোস্ত ও দুশমন আমারও দোস্ত দুশমন। জাহেরী ও বাতেনী কামালাত সমন্বিত করার কারণে সে বর্তমান বিশ্বে আমার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি। তার প্রতি আমার অন্তরে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কাযী ছানাউল্লাহ নেক আমল, খোদাভীতি ও ধর্মপরায়ণতার এক মূর্ত প্রতীক। সে শরীয়ত প্রচলনকারী ও তরিকতকে আলোকিতকারী ফেরেশতার গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি। ফলে ফেরেশতারাও তাকে সম্মান করে।

আমার (লেখকের) মির্জা মাযহারের জবানী শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি বলতেন, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ্তায়ালা আমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমার দরবারে কী নিয়ে এসেছো? আমি জবাব দিবো, ছানাউল্লাহ পানিপথিকে।

একদিন আমি (লেখক) হজরত মাযহারের খেদমতে হাজির ছিলাম। জিকির ও মোরাকাবার হালকা চলছিলো। হজরত কাযী সাহেবও এসেছিলেন। তিনি কাযী

সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী আমল করো যে ফেরেশতারা এই মহফিলে তোমার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছে? একথা সত্য যে, আমি হজরত মির্জা মাযহারের কামেল খলীফাগণের সাথে মিলিত হয়েছি। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ফয়েজ ও বরকত যা কাযী সাহেবের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিলো তা অন্যদের মধ্যে দেখিনি। যদিও কলবধারী সকলেই ওই সমস্ত হাল অনুভব করতে পারে না। সে জন্যই আমি বলি, আমার দৃষ্টিতে এই তরিকার বিশেষ কামালিয়াত তখন তার মতো উচ্চ নেসবতধারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও মধ্যে বিদ্যমান ছিলো না। সে জন্য তিনি শায়েখের খলীফাগণের মধ্যে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিলেন। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার তালেবগণকে এই তরিকার চূড়ান্তে পৌঁছে দেয়া, সহীহ্ মাকামের কাশফপ্রাপ্তি, হাল এবং আল্লাহ্র দরবারে নৈকট্য অর্জন ইত্যাদি, যা এই তরিকার বিশেষত্ব— এসব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। সে জন্য শায়েখ মাযহার বার বার আফসোস করে বলতেন, আমার সাথীগণের মধ্য থেকে কেউ উক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জনে আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারলো না। ফকীর (এ কিতাবের লেখক) বলেন, তরিকা গ্রহণ করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কলবের সাফায়ী অর্জন, গায়রুল্লাহ্র গ্রেফতার থেকে মুক্তি লাভ, সর্বদাই আল্লাহ্র পরিচয় জ্ঞান বিদ্যমান থাকা, বদ খাসলত থেকে দিলকে পবিত্র রাখা, চরিত্র সুসজ্জিত করণ, জিকির ও শোগলের বরকত লাভ, হাল, কাইফিয়ত ও নিমজ্জন লাভ ও মহব্বতের প্রাবল্যে মত্ত থাকা। আলহামদু লিল্লাহ! এ সব বিষয় মির্জা মাযহারের খলীফাগণের সোহবত লাভের মাধ্যমে সে সময় তাঁদের মুরিদগণ যথাযথভাবে হাসিল করতো, যা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ওই সকল মুরিদ তাঁদের সোহবতে থেকে কলবী যওক-শওকের সাথে খাতিরজমার উচ্চতর নূর অর্জন করেছিলো।

হজরত কাযী সাহেব জাহেরী ও বাতেনী কামালতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর জীবনের মুহূর্তগুলো ইবাদত বন্দেগীতে ভরপুর ছিলো। দৈনিক একশ' রাকাত নামাজ পড়াকে তিনি ওজিফা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাজে এক মনজিল কোরআন পাঠ করতেন তিনি। যেহেতু সে জমানায় সৎ ও ধর্মপরায়ণ আলেমের সংখ্যা কম ছিলো। সে জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করে মোকাদ্দমার সহী ফয়সালা দিবেন এবং এ পদের যথাযথ হক আদায় করবেন। বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোনো অনভিপ্রেত বিচারিক রোছম (সংস্কার) তাঁর কাছ থেকে কখনও প্রকাশ পায়নি।[৭]

কাযী সাহেবের সিলমোহর থাকতো এক ব্যক্তির কাছে। একদিন সে কোনো এক লোকের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলো। তিনি সে বিষয়ে জানতে পেরে

উক্ত মাল ফিরিয়ে দেন এবং তাকে শাস্তি প্রদান করেন। এই মহান পদের যে রকম বৈশিষ্ট্য, তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

কাযী সাহেবের নিকট মির্জা মাযহারের প্রেরিত অনেক মকতুব আছে। এখানে তার কিয়দাংশ উদ্ধৃত করা হলো–

শায়েখ আইনউদ্দীন আজীমাবাদের বাসিন্দা একজন নওজোয়ান। সে তার রোজগার ছেড়ে দিয়ে তরিকা গ্রহণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে তোমার খেদমতে হাজির হতে চায়। তার কলবে নূর হাসিল হয়েছে। রাস্তা অতিক্রমের কাজ এখনও শুরু হয়নি। সে একজন ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি। তুমি তার হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করো। আলী রেজা খান আমার কাছ থেকে তরিকা শিখছে। তার পাঁচ লতীফায় জিকির জারী হয়েছে। নফী ইসবাতের আমল শুরু করেছে। সে তোমার হালকায় শামিল হতে চায়। তুমি তার কলব লতীফায় তাওয়াজ্জোহ প্রদান কোরো। কেনোনা এ তরিকার জরুরী কাজ হচ্ছে কলব লতীফার আমল। শায়েখ মির্জা মাযহারের সাথীগণের মধ্যে পীর মোহাম্মদ ও সাইয়্যেদ মোহাম্মদ তাঁর সোহবত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে এই তরিকার বিভিন্ন নেসবত লাভ করেছিলেন।

৩. মৌলভী ফজলুল্লাহ

তিনি মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথির বড় ভাই ছিলেন। জাহেরী এলেমে তিনি একজন পরিপূর্ণ আলেম ছিলেন। তিনি হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে হজরত মাযহারের সোহবতের মাধ্যমে ফায়দা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তাওয়াজ্জোহে তিনি এ তরিকার মাকামসমূহ লাভ করেছিলেন। তিনি অধিক জিকিরকারী এবং আল্লাহ্র প্রতি দায়েমী মনোযোগী ছিলেন।

তাঁর ওফাতের পর মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথি অত্যন্ত মনঃকষ্টে ছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে এসে তাঁকে বলেন, ভাই এরূপ চিন্তা ও কষ্টের হেতু কী? 'আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহি লা খওফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানূন' (ওহে শুনে রাখো, আল্লাহ্র ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না)। এটা কোরআনের আয়াত। আখেরাতের জগতে আল্লাহ্তায়ালা আমাকে অনেক সুখ ও নেয়ামত দান করেছেন, যা বর্ণনা ও গণনার বহির্ভূত।

৪. মৌলভী আহমদুল্লাহ

তিনি মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি হজরত মাযহারের বিশেষ সাথী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এবং অন্যান্য আলেমগণ থেকে

জাহেরী এলেম শিখেছিলেন। এলেম শিক্ষার সময় সারা রাত অধ্যয়ন করতেন তিনি। পানাহারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো খুব কম। তাঁর কোরআন মজীদ হেফজ ছিলো। এলমে ক্বেরাতে ও তাজবীদে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। দৈনিক একুশ পারা কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন। তিনি তরিকা গ্রহণ করেছিলেন মির্জা মাযহারের কাছ থেকে। জিকির ও মোরাকাবা তো প্রথম থেকেই হাসিল ছিলো। দৈনিক পঁয়ত্রিশ হাজর বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' এর জিকির করতেন তিনি। চাশতের সময় পর্যন্ত মোরাকাবায় বসে থাকতেন।

তিনি শায়েখ মির্জা মাযহারের উচ্চ তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে অধিক জিকির, উচ্চতর মাকামের মোরাকাবা ও কারামতের যোগ্যতা হাসিল করে তরিকার এজাযত পেয়েছিলেন এবং মানুষকে জিকির, মোরাকাবা ও সুলুক শিক্ষা দেয়ায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। শায়েখ মির্জা মাযহার তাঁর হালের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তাঁর উন্নতির জন্য গায়েবানা তাওয়াজ্জোহ প্রদান করতেন। তিনি তাঁর এক মকতুবে লিখেছিলেন–

আজ পর্যন্ত আমি তোমাকে তাওয়াজ্জোহ দেয়ার ব্যাপারে কোনো অবহেলা করিনি এবং করবোও না। তুমি দৈনন্দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছো। কামালাতে রেসালাতের তাজাল্লীও কোনো কোনো সময় প্রকাশ পাচ্ছে। তুমি সকাল-সন্ধ্যায় পুরুষ ও নারীদের যে হালকা পরিচালনা করছো, তাতে আমি খুব আনন্দিত। পরিপূর্ণ আশা রাখি, আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে দু'জাহানেরই বিজয় দান করবেন। অপর এক মকতুবে লিখেছেন–

আহমদউল্লাহর উপর হাকীকতে কাবার তাওয়াজ্জোহ আছে। দু'তিন দিন পর সে হাকীকতে কোরআনে প্রবেশ করবে।

মৌলভী আহমদউল্লাহ জিকির ও ইবাদতের কঠোর সাধনা করে তরিকতের উচ্চতর মাকামসমূহে পৌঁছেছিলেন এবং উচ্চ শানের অধিকারী হয়েছিলেন। জাহেরী ও বাতেনী সমস্ত কামালাত অর্জন করে 'আলওয়ালাদু সিররুল্ লিআবীহি' (সন্তান তার পিতার গোপন রহস্য) কথাটির সার্থক প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি তিরিশ বছরের যুবক ছিলেন। এ বয়সেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো। তাঁর পিতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি বলেছেন, এই সন্তানের মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ ছিলো তার প্রতি আমার অসম্ভব ভালোবাসা। আল্লাহ্তায়ালা আপন ওলিগণের দিলের মধ্যে অন্যের ভালোবাসা থাকুক তা পছন্দ করেন না। সে কারণেই তিনি তাকে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আমার অন্তরে অন্যের ভালোবাসা থাকতে দেননি।

তিনি অত্যন্ত বাহাদুর ছিলেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে কয়েকবার জেহাদ করেছিলেন এবং গাজীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। একবার ডাকাতদের একটি দল তাঁর কাছে এসে গেলে তাঁরা খাদেমদের কাছ থেকে কিছু মাল ছিনিয়ে নিলো।

তিনি একাকী দৌড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ঢাল তলোয়ারবিশিষ্ট বিশজন ডাকাতকে হামলা করে তাদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত মাল ফিরিয়ে আনলেন। 'নিশ্চয় বীর পুরুষকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন' এই বাণী তাঁর মতো ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথির দ্বিতীয় সাহেবজাদা শায়েখ সিবগাতুল্লাহও এলেম হাসিল করেছিলেন। তিনিও মির্জা সাহেবের কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরও ইনতেকাল হয় যৌবনকালে।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথির তৃতীয় সাহেবজাদা মৌলভী দলীলুল্লাহ এলমে ফেকাহ্ শিখেছিলেন। উসুল ও অন্যান্য বিষয়ের এলেমও তাঁর ছিলো। তিনিও তরিকা ও কলবী শোগল মির্জা সাহেবের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ্তায়ালা সহী সালামতে রেখেছিলেন।

মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথির স্ত্রীও[৯] মির্জা মাযহারের বাতেনী ফয়েজ লাভ করেছিলেন এবং ফানা ও বাকার হাল অর্জন করেছিলেন। তিনি তরিকার তালীম দেয়ার এজাযতও পেয়েছিলেন। ওজিফা, বন্দেগী, জিকির ও মোরাকাবা ইত্যাদি নেক আমল তাঁকে আল্লাহর দরবারে মকবুল বানিয়েছিলো। হজরত মাযহার তাঁর এক মকতুবে এই পবিত্র রমণী সম্পর্কে বলেছেন–

মহিলাদের যদি তৌফিক হয় এবং তোমার নিকট থেকে তাওয়াজ্জোহ চায় তাহলে আমার পক্ষ থেকে এজাযত রইলো। হজরত পীরানে কেরামের ওসিলায় আমি দৃঢ় আশাবাদী, তাতে তাছীর হবে। নিজেকে আল্লাহ্র জিকির ও রসুল করীম স. এর এত্তেবার জন্য আবদ্ধ করে নাও। হকদারদের হক আদায় করা এবং উত্তম চরিত্র গঠন করা অপরিহার্য। তাই হবে সুনাম এবং কামিয়াবীর ওসিলা।[১০]

৫. শায়েখ মোহাম্মদ মুরাদ

তিনি মির্জা মাযহারের পুরনো সাথী ছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পয়ঁত্রিশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন শায়েখ মির্জা মাযহারের জিকিরের হালকায় হাজির থেকেছিলেন এবং তাঁর সোহবতের বরকতে তরিকার মাকামসমূহ অর্জন এবং উন্নত নেসবত লাভ করেছিলেন। হজরতের খেদমতে তাঁর এমন বিশেষত্ব ছিলো, যা অন্য সাথীদের ছিলো না। হজরত মির্জা মাযহারের গৃহস্থালীর বিষয়ের জিম্মাদারী তাঁর উপর ন্যস্ত ছিলো। তাঁর সম্পর্কে মির্জা মাযহার বলেছেন, আমার সাথীগণের মধ্যে উচ্চতর নেসবতের দিক দিয়ে তার সমতুল্য আর কেউ নেই। তাঁর সত্তায় অনেক কামালাত সন্নিবেশিত ছিলো। ব্যবসা যেহেতু তাঁর পেশা ছিলো, তাই তালেবগণ তাঁর দিকে ধাবিত হতো না।[১১] তাদের ধারণা

এমন ছিলো, যেনো একজন শায়েখের জন্য এলেম, আকলে সলীম, সুস্পষ্ট কাশফ, বিশুদ্ধ কারামত, বংশমর্যাদা, বাহ্যিক শান-শওকত, ফকিরীর দৌলত এবং স্বল্পেতুষ্টি অপরিহার্য।

মৌলভী নাঈমুল্লাহ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি মুসতাজাবুদ্দাওয়াত (যার দোয়া কবুল হয়) ছিলেন। বিষয়টি বহুবার পরীক্ষিত। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

ফকীর (লেখক) বলেন, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য বাতেনী কামালাত থাকা অপরিহার্য নয়। আল্লাহ্র মহত্বের সামনে আত্মসমর্পণ ছাড়া কোনো উপায় নেই। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, হালাল রিজিক, সত্যবাদিতা এবং এখলাস। দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই তিনটি বিষয় জরুরী। লেখক বলেন, তাঁর নেসতবতের হাল এ প্রকারের নয় যে, তা সকলের অনুভূতিতে আসতে পারে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সালামতের সাথে রাখুন।

৬. শায়েখ আবদুর রহমান

তিনি ছিলেন শায়েখ মোহাম্মদ মুরাদের ভাই। শায়েখ মির্জা মাযহারের তাওয়াজ্জোহে তিনি উচ্চতর হাল অর্জন করেছিলেন। নেসবত মাআল্লাহ্ মাইয়াতের হালে তিনি নিমজ্জিত ছিলেন। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর নেসবতের হাল প্রকাশ পেতো। তাই তাঁকে দেখা মাত্র দিল তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে বাধ্য হয়ে যেতো। হাদিসের বাণী– 'ইযা রুউ জুকিরাল্লহ' (তাদেরকে দেখামাত্র আল্লাহ্র স্মরণ এসে যায়) তাঁর হালের বেলায় প্রযোজ্য হতো।[১৭]

৭. মীর আলীমুল্লাহ গঙ্গুহী

তিনি মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদের আকাবের খলীফা ছিলেন। জামালী হালের মারেফত অর্জনকারী পুরনো সাথীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি হজরত আবেদ সুনামীর সোহবতও পেয়েছিলেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি হজরত মাযহারের খেদমতে গিয়ে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুক পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি উচ্চতর হাল ও কারামত লাভ করেছিলেন। তাঁর নেসবতে মত্ততা এতো প্রবল ছিলো যে, মোজাদ্দেদিয়া নেসবতের যে বৈশিষ্ট্য সুহু বা চৈতন্য, তা তাঁর মধ্যে প্রবল হতে পারতো না। তিনি মহব্বতে এলাহীর শরাবান তহুরায় মত্ত এবং হুজুরীর আস্বাদে বিভোর থাকতেন। তাঁর জবানে সর্বদাই আশেকগণের আলোচনা হতো। আশেকানা হেকায়েত শুনলে তিনি অশ্রুসজল হয়ে যেতেন। রোদন ছিলো তাঁর হালের আচ্ছাদন। সুরেলা সঙ্গীত তাঁর বুকের মধ্যে জ্বালা সৃষ্টি করতো। তাঁর সোহবতে অন্তরে আল্লাহপ্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হতো। তাঁর পেশানীতে নেসবত

মাআল্লাহ্ (মাইয়াত) এর নূর চমকাতো। তাঁর মধ্যে সুদৃঢ় নিমজ্জন এবং সুদীর্ঘ বেখোদী (আত্মহারা) অবস্থা বিরাজ করতো। শায়েখ মির্জা মাযহারের প্রতি তাঁর মহব্বত ছিলো প্রবল। মহব্বতের গালবার কারণে তিনি শায়েখের কাছে লিখিত পত্রে সালামের পরিবর্তে লিখেছিলেন কুরবানাত শোয়াম (আমি আপনার উপর কোরবান)।

স্বীয় জন্মভূমি থেকে তিনি যখন শায়েখের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসতেন, তখন পথ চলার কষ্টে ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তখন তাঁর শায়েখের মর্যাদা স্মরণ করে দেহ মনে জোশ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে নিতেন এবং পুনরায় পথ চলা শুরু করে দিতেন।

একবার তিনি হজরত বড় পীর সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাঁর পদচুম্বন করতে চাইলেন। হজরত বড় পীর সাহেব তাঁকে বললেন, এ কী রকম কাজ? তিনি বললেন, হে রসুলুল্লাহর পুত্র! এটাতো আমাদের মতো ফকীরদের সৌভাগ্য। একথা শুনে তিনি খুবই খুশি হলেন এবং তাঁর হালের প্রতি মেহেরবানি করলেন।

আরেক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, চিশতিয়া তরিকার আকাবেরগণ যেমন হজরত শায়েখ ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকর এবং শায়েখ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহি তশরিফ আনলেন এবং তাঁর বাতেন থেকে নকশ্বন্দিয়া তরিকার নেসবত সলব করে নিলেন। তারপর নিজের খান্দানের নেসবত ঢেলে দিলেন। তাঁদের চলে যাওয়ার পর নকশ্বন্দিয়া তরিকার বুজুর্গ যেমন মোজাদ্দেদে আলফেসানি এবং হজরত মির্জা মাযহার সেখানে তশরীফ আনলেন। তারপর তাঁরা তাঁর বাতেন থেকে চিশতিয়া তরিকার নেসবত কেটে দিয়ে নকশ্বন্দিয়া নেসবত দ্বারা তাঁর সীনাকে ভরপুর করে দিলেন। এমতো সলব ও এলকার আমলের উসিলায় আকাবের বুজুর্গগণের জিয়ারত নসীব হয়েছিলো তাঁর। যার ফলে তাঁর মধ্যে এমন এক হাল প্রকাশ পেয়েছিলো এবং দেহের মধ্যে এমন এক আসারতা প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, আকল প্রায় চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

সকাল বেলা তিনি হজরত মাযহারের খেদমতে এসে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি তাঁকে স্বীয় পীর হজরত আবেদ সুনামীর নিকটে নিয়ে গেলেন। তিনি নিজে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তার স্বপ্নের বিষয়ে তাঁর কাছে কিছুই প্রকাশ করিনি। কিন্তু হজরত শায়েখ তাঁর ফেরাসতের নূর দ্বারা সবকিছুই জেনে গেলেন। বললেন, বুজুর্গগণ তার হালের উপর হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং আপন আপন নেসবত এলকা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে নকশ্বন্দি হজরতগণ পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং আপন খান্দানের নেসবত পুনরায় তাকে দান করেছেন। সে তরিকার যে সকল মাকাম লাভ করেছে, তা সঠিক এবং যথাযথ।

মীর আলীমুল্লাহ গঙ্গুহির মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই উত্তপ্ততা ছিলো। উত্তাপের বহিঃপ্রকাশ এবং চিশতিয়া তরিকার নেসবতের তপ্ত ভাব তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। এ রকম হাল তালেবে মাওলার জন্য ঈর্ষণীয় ব্যাপার বটে। সারা জীবনই তিনি মহব্বতের উত্তাপে উত্তপ্ত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। শায়েখ মির্জা মাযহারের জীবদ্দশায়ই তিনি ইনতেকাল করেছিলেন।

তাঁর স্ত্রীও শায়েখ মির্জা সাহেবের কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও আল্লাহ্প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। মীর আলীমুল্লাহ তাঁর স্ত্রীর ইনতেকালের পর স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি স্বামীকে বলছেন, ফেরেশতারা আমাকে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে নিয়ে গিয়েছিলো। তখন আমি অসীম নূরের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত পেলাম। এমতাবস্থায়ই আমি আমার কাম্যসত্তার দিকে দৌড়াতে লাগলাম। তখন আমার জন্য মাগফেরাত ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলো। আলহামদু লিল্লাহ্!

৮. শায়েখ মুরাদুল্লাহ ওরফে গোলাম কাকী

তিনি হজরত মির্জা মাযহারের জলীলুল কদর খলীফা ছিলেন। এলেম ও আমলে উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ওই জমাতের অন্তর্গত সালেক ছিলেন, যাদেরকে হজরত শায়েখ আবেদ সুনামী তরবিয়তের জন্য মির্জা সাহেবের হাওলায় প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর তরবিয়তের বরকতে তরিকার শেষ মাকামসমূহ অর্জন করে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে বাংলা অঞ্চলে তালেবগণের প্রত্যাবর্তনস্থল হয়েছিলেন। তাঁর কামালতের সুখ্যাতি ওই অঞ্চলের লোকদের হৃদয় আকর্ষণ করতো। তাঁর উত্তম চরিত্র এবং পরিপূর্ণ গুণাবলীর খুশবু মস্তিককে সুবাসিত করতো। তাঁর মাধ্যমে বহু তালেব খাতিরজমা ও চৈতন্য লাভ করে আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছিলেন। তন্মধ্যে মোহাম্মদ গাউছের হাল ছিলো বিশুদ্ধ। তাঁর সাথীগণের মধ্যে মোহাম্মদ দানেশ ও মোহাম্মদ দরবেশ তাঁর কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করেছিলেন। মোহাম্মদ দানেশের বাতেনী নেসবত তাঁর অনুগ্রহে ফানায়ে কলব ও ফানায়ে নফসের ঊর্ধ্বে পৌঁছেছিলো। হুজুরী ও চৈতন্য, দৈহিক ও মানসিক অসারতা, যা ফানায়ে নফসের বৈশিষ্ট্য, তা তাঁর অর্জিত হয়েছিলো। মোহাম্মদ দরবেশ অনেক বাতেনী উন্নতি লাভ করেছিলেন এবং কামালাতের নেসবত লাভ করেছিলেন। শায়েখ মুরাদুল্লাহ তালেবগণের আছানীর জন্য উর্দুভাষায় কোরআন মজীদের তাফসীর লেখার ইচ্ছা করেছিলেন।[১৫] তখন তাঁর শায়েখ মির্জা মাযহার তাঁকে মানা করে দিলেন। বললেন, তরিকার নূর প্রসারিত করাই খলুসিয়াত ও এহসানের মর্তবা লাভের ওসিলা। সময় একাজেই ব্যয় করা উচিত। জিকির ও মোরাকাবা ছাড়া আর অন্য কোনো আমল করা উচিত নয়। শায়েখ মির্জা মাযহারের ওফাতের পূর্বেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো।

৯. শায়েখ মোহাম্মদ এহসান

তিনি মির্জা মাযহারের পুরানো সাথী এবং আফজল খলীফা ছিলেন। তিনি হাজী মোহাম্মদ মহসিনের আওলাদ ছিলেন।[১৭] তাঁর বংশসূত্র শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর সাথে মিলিত হয়। যৌবনকালের প্রারম্ভে তাঁর আকীদায় বক্রতা ছিলো। তখন একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, শায়েখ মির্জা মাযহার দুধ ও ভাত খাওয়ার পর অবশিষ্ট খাবার তাঁকে দান করছেন। তারপর তিনি তাঁর হাতে তওবা করে এ পথে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হন। এভাবে এক পর্যায়ে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার চূড়ান্ত মাকাম লাভ করেন। তাঁর বাতেন জগত নূর ও চৈতন্যের আধারে পরিণত হয়। তাঁর নেসবতে জযবা ছিলো সুদৃঢ়। কলবী বেলায়েতের সায়ের কালে অস্থিরতা ও আত্মহারা অবস্থায় থাকতেন তিনি। প্রেরণার উত্তাপের কারণে সর্বদাই উত্তপ্ত থাকতেন। তাই শীতকালেও তাঁর গরম পোশাকের প্রয়োজন পড়তো না।

মহব্বতের জযবার প্রাবল্যের কারণে ইসমে জাত ও সেমার আওয়াজ শোনা মাত্র তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। একদিন তিনি শায়েখ মির্জা মাযহারের খেদমতে এসে অস্থিরতা প্রকাশ করলেন। শায়েখ মির্জা মাযহার বললেন, তোমার নেসবতে যওক-শওক প্রবল হয়েছে। তুমি যদি এই উত্তপ্ত নেসবত, জযবা ও এশক মহব্বতকে যথেষ্ট মনে করো, তাহলে আমার সোহবত ত্যাগ করো। অন্যথায় এ রকম ফরিয়াদ ও চিৎকার তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ সময় জিকির ও মোরাকাবায় ফেরেশতাদের সমাগম হয়েছিলো। তোমার চিৎকারের আওয়াজে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে একজন তোমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। তোমার বাতেনের কাজ যদি আমার হাওলায় করাতে চাও, তাহলে আমি তোমার প্রতি এমন তাওয়াজ্জোহ প্রদান করবো, যার ফলে তুমি এরকম শোরগোলের মাকাম থেকে বেরিয়ে এসে প্রশান্তির স্তরে পৌঁছে যাবে। কেনোনা প্রশান্তির নেসবত ‘করন’ (যুক্ত থাকা) এর মতো, যা আত্মগৌরবের মিশ্রণ থেকে দূরবর্তী। শায়েখ মোহাম্মদ এহসান বললেন, আমার শোরগোল এবং প্রশান্তি কোনোটিই কাম্য নয়। আমার মকসুদ তো কেবল আপনার সন্তুষ্টি অর্জন। তখন তিনি তাঁকে পূর্বের মাকাম থেকে এক টানে মাকামহীনতায় পৌঁছে দেন এবং সেখানের হালের উপর কৃতকার্যতা দান করেন। যার ফলে তাঁর অস্থিরতা শান্তিময়তায় পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও তাঁর অস্থিরভাব বিদ্যমান ছিলো। তাই কখনও কখনও তিনি নিজের অজান্তে চিৎকার করে উঠতেন।

একদিন একলোক তাঁর সামনে বললো, মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীর রুজিতে সন্দেহযুক্ত মাল আছে। তিনি বললেন, হজরত মোজাদ্দেদ র. এর সীনা থেকে

এমন নূরের স্রোত প্রবাহিত হয় যে, সমস্ত ময়লা আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। একথা বলাতে তিনি অনেক ফয়েজ পেয়েছিলেন। একবার তিনি এই শেরটি শুনে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন–

রফতম আয মীকাদাহ আমা বদোয়া মী খাহাম
কে আযীঁ দর নরওম লগযশ মস্তাঁ মদদী

(যদিও আমি পানশালা থেকে চলে এসেছি, তবু প্রার্থনা করি হে মস্তানীর ভুলভ্রান্তি! আমি যেনো এর দরজা থেকে চলে যেতে না পারি)।

মহব্বতের বিশৃংখলা তাঁকে আন্দোলিত রাখতো। অনেক সময় ভালোবাসামূলক সঙ্গীত তাঁকে আত্মহারা বানিয়ে দিতো। এই এশক এমন এক বিষয়, যা তালেবদের অন্তরে জীবন সঞ্চার করে। এ প্রেম এমন এক জিনিস, যা সালেকদের জীবনকে স্থিতি দান করে।

হারগেজ নমীরদ আঁকে দেলেশ জিন্দা শোদ বেএশক
ছাবাত আস্ত বর জারীদা আলমে দাওয়ামে মা

(ওই ব্যক্তি কখনও মৃত্যুবরণ করে না, ভালোবাসায় যার দিল উজ্জীবিত। দফরে আলমে (লওহে মাহফুজে) আমাদের জিন্দেগীর উপর মহর মেরে দেয়া হয়েছে)।

গার এশক তোরা নিস্ত ব তাহকীক যে তাকলীদ
চাকী ব গরী বাঁ যন ও খাকী ব সরাফগন

(তোমার যদি এশকে হাকিকী ও এশকে মাজাযী হাসিল না হয়ে থাকে, তাহলে তোমার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলো এবং স্বীয় মস্তকে মাটি ঢেলে দাও)।

কারে মা এশক ও বার মা এশক আস্ত
হাসেলে রোজগার মা এশক আস্ত

(আমার কারবার হচ্ছে এশকের কারবার। আমার অর্জিত রোজগারও হচ্ছে এশক)।

শায়েখ মোহাম্মদ এহসান বলেছেন, তিনি আহমদ শাহ দূররানীর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় নিজের বাসস্থানের গলির মুখে পুরোপুরি হিম্মত নিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসেছিলেন, যাতে দাঙ্গাকারীরা কেউ গলিতে প্রবেশ করতে না পারে। আল্লাহ্‌র ফজলে সারা রাত সে গলিতে কেউ প্রবেশ করতে সাহস করেনি।

পাঁজরের ব্যথায় আক্রান্ত এক লোক একবার বললো, আমার ব্যাধি দূর করণার্থে হিম্মত করুন। ইসমে জাত 'আল্লাহ্' শোনা মাত্র তিনি চিৎকার করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যথা ভালো হয়ে গেলো। তিনি নিজে বলেছেন, মোল্লা রহীম দাদের সৈন্যবাহিনী যখন কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন আমিও ওই বাহিনীতে ছিলাম। সে কিয়ামততুল্য মুহূর্তেও আমার পরিপূর্ণ নেসবতের প্রাবল্য প্রকাশ পাচ্ছিলো। শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছিলো না এবং কাফেরদের হত্যা ও ধ্বংসলীলার কোনো খবরই ছিলো না। আমি তখন মাশায়েখে কেরামের তাওয়াজ্জোহের বদৌলতে পুরাপুরি হেফাজতে ছিলাম।

তিনি বলেছেন, সুলুকের সময় আমি দারিদ্রের জীবন গ্রহণ করেছিলাম। ওই সময় আমি তিন দরিদ্রকে (ভাত, কাপড়, বাসস্থান) এক মনে করতাম। একদিন আমার শায়েখ মির্জা মাযহার আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁর কাছে আমার সহায়সম্বলহীনতার কথা বললাম। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন এবং আমাকে সামান্য আটা এবং একখানা খাস কোর্তা দান করলেন। ওই তাবাররুকের বরকতে আমার দারিদ্র সচ্ছলতায় রূপান্তরিত হয়েছিলো।

তিনি বলেন, আমি দু'মাস আমার শায়েখের খেদমতে হাজির থাকার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। ফলে এতো বেশী ফয়েজ পেয়েছিলাম যে, রেয়াজত ও মোজাহাদা দ্বারা এরকম উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয় না।

১০. শায়েখ গোলাম হাসান

তিনি ছিলেন শায়েখ মোহাম্মদ এহসানের ভাই এবং শায়েখ মির্জা মাযহারের খাস সাথী ও বন্ধুগণের অন্যতম। তিনি শায়েখের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকেই তরিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই খান্দানের নেসবতের মাকামসমূহে পৌঁছেছিলেন। আল্লাহ্র জিকিরের মধ্যে থেকে আনন্দের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।[১৮]

১১. শায়েখ মোহাম্মদ মুনীর

তিনি হজরত শায়েখ ফরীদ শকর গঞ্জের আওলাদ ছিলেন। আর ছিলেন মির্জা মাযহারের জলীলুল কদর খলীফা। তিনি চিশতিয়া তরিকার শোগল করতেন। পরে তরিকা নকশবন্দিয়ার যওক-শওক গ্রহণের উদ্দেশ্যে মির্জা মাযহারের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তাঁর সোহবত গ্রহণ করে মাকামসমূহের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তরিকার এজাযত হাসিল করেন। তাঁর নেসবত সুদৃঢ় এবং হাল উচ্চ। অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল ছিলো তাঁর স্বভাব। আল্লাহ্র স্মরণে সর্বদাই নিয়োজিত থাকতেন তিনি।

শায়েখ মাযহার র. তাঁর সম্পর্কে বলতেন, শায়েখ মোহাম্মদ মুনীরের নেসবত খুব সুদৃঢ়। কেউ যদি এ সময়ের কুতুবও হয়, তবুও তার কাছ থেকে তাঁর ফায়দা গ্রহণ করা উচিত। সুলুকের প্রথম দিকে তিনি সারারাত মোরাকাবা করতেন। অধিক মোরাকাবার ফলে তাঁর কাশফ এবং প্রাপ্তি বিশুদ্ধ ছিলো। তালেবগণ তাঁর প্রতি ধাবিত হতো। তাঁর দরবারে জিকিরকারীদের হালকা খুব খাতিরজমার সাথে অনুষ্ঠিত হতো। হায়াত তাঁকে সহযোগিতা করেনি। তিনি তাঁর শায়েখের জীবদ্দশায়ই বুকের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে ইনতেকাল করেন।[১৯] তাঁর মৃত্যুতে তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন।

তিনি মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীর নিকট লিখেছিলেন– শায়েখ মোহাম্মদ মুনীর তরিকার বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি ছিলো। ১৯ যিলহজ্ব তারিখে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এতে করে আমি অন্তরে খুব ব্যথা পেয়েছি। স্বাভাবিক হায়াত অনুসারে আমার সময়ও নিকটবর্তী। এতেই সান্ত্বনা।[২০]

হজরত খাজা নকশবন্দের আওলাদগণের মধ্য থেকে খাজা এবাদুল্লাহ শায়েখ মোহাম্মদ মুনীর থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। শায়েখ মির্জা মাযহারের ইনতেকালের পর তিনি শায়েখ মোহাম্মদ মুনীরের সোহবত গ্রহণ করেন এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহে উচ্চতর মাকামে পৌঁছেন। তরিকার তালীম দেয়ার এজাযতও লাভ করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, তাঁর নেসবত খুবই শক্তিশালী। কয়েক বছর হলো তাঁর ইনতেকাল হয়ে গিয়েছে। হাজী জামালউদ্দীনও শায়েখ মোহাম্মদ মুনীরের সাথী ছিলেন। তাঁর মোবারক সোহবতে তরিকা মোজাদ্দেদিয়ার নেসবত লাভ করে হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। মাওলার স্মরণে স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন তিনি।

১২. মৌলভী কলন্দর বক্স

মৌলভী কলন্দর বক্স মির্জা মাযহারের নির্বাচিত সাথী এবং খলীফা ছিলেন। তিনি দ্বীনি এলেমের আলেম ছিলেন। জ্ঞানগত এলেমও তিনি অর্জন করেছিলেন। কোরআন মজীদ মুখস্থ ছিলো তাঁর। তিনি মির্জা মাযহারের কাছ থেকেই তরিকা হাসিল করেছিলেন। তাঁর উচ্চ মানের তাওয়াজ্জোহের বরকতে তরিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি তরিকার তালীম দেয়ার এজাযতও পেয়েছিলেন। এলমে দ্বীনের দরস দেয়া এবং বাতেনী এলেমের সুলুক শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর কাজ। চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁর দক্ষতা ছিলো। শারিরীক ও আত্মিক উভয় রোগের চিকিৎসা করতেন। শায়েখ মির্জা মাযহারের প্রতি তাঁর খাঁটি বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিলো। তিনি তাঁর খাস সহচর ছিলেন। রমজানুল মোবারকে তারাবীর নামাজে তিনি তাঁকে কোরআন মজীদ শোনাতেন। শায়েখ তাঁর সুললিত কণ্ঠে তারতীলের

সাথে কোরআন পাঠ শুনে খুব খুশি হতেন। প্রত্যেক বছর তিনি শায়েখের দর্শনের জন্য তাঁর শহর[২১] থেকে শায়েখের দরবার দিল্লীতে ছুটে আসতেন। এভাবে হুজুরীর নূর অর্জন করতেন। এ রকম আমল করতে করতেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান।

১৩. মীর নাঈমুল্লাহ

তিনি মির্জা মাযহারের আকাবের খলীফাগণের অন্যতম। হজরত হাজী মোহম্মদ আফজলের সোহবত হাসিল করেছিলেন তিনি।[২২] হজরত হাজী সাহেবের খলীফা শায়েখ মোহাম্মদ আজমের খেদমতেও ছিলেন। হজরত মাযহারের সোহবত গ্রহণ করে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার মাকামসমূহের সুলুক পূর্ণ করেছিলেন এবং তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পেয়েছিলেন। এলেম, আদব ও সৎচরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অন্তরে শায়েখের মহব্বত সুদৃঢ় ছিলো। তরিকার তালীম ও এলমে দ্বীনের দরস দান তাঁর কাজ ছিলো। তিনি কোরআন মজীদের হাফেজ ছিলেন। এলমে ক্বেরাত ও তাজবীদের সনদ নিয়েছিলেন ক্বারী আবদুল গফুর থেকে। তারাবীর নামাজে তাঁর থেকে কোরআন মজীদ শ্রবণ করে তাঁর শায়েখ মির্জা মাযহার খুব খুশি হতেন।

১৪. মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলী

তিনি মির্জা মাযহারের অন্যতম বড় খলীফা ছিলেন। তিনি জাহেরী এলেমও শিখেছিলেন। কোরআন ও হাদিসের এলেম শিখেছিলেন হজরত শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর কাছ থেকে। তরিকার তালীম নিয়েছিলেন মির্জা মাযহারের খলীফা খাজা মুসা খানের কাছ থেকে। জিকির ও মোরাকাবা তাঁর সার্বক্ষণিক আমল ছিলো। মির্জা সাহেবের হুকুমে তিনি মুসা খানের কাছ থেকে বাতেনী কামালাতে উপকার লাভ করেছিলেন। তরিকার শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পেয়েছিলেন। এজাযত পাওয়ার পর সম্ভল শহরে দীনী এলেম শিক্ষা দান ও আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে হেদায়েত করা ও সুলুকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এলেম, আমল, সবর ও দৃঢ়তা প্রভৃতি উত্তম আখলাকে ভূষিত ছিলেন। তিনি বলতেন, হাদিস ও তাফসীর পাঠে অন্তরে নূর ও পরিচ্ছন্নতা আসে এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নেসবতে শক্তি ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

তিনি বলেছেন, একদিন আমি কোনো এক আমীরের খানা খেয়েছিলাম। ফলে আমার বাতেনী হাল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আমি সব সময় তার জন্য তওবা করেছিলাম। কিন্তু পূর্বের সেই হাল আর ফিরে পাইনি। যদিও নেসবত আমার

মধ্যে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু হাল ও যওক (আস্বাদ) বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। 'নফহাত' গ্রন্থের লেখক বলেছেন, তরিকতপন্থী একদল লোক একদা প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর হয়ে সৈন্যবাহিনীর পানি পান করেছিলো। তখন তাদের সকলের বাতেনী হাল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিরিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর এখনও সে ময়লার আছর বিদ্যমান রয়েছে।

মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলী এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, রসুলুল্লাহ স. তাঁর হালের প্রতি যথেষ্ট মেহেরবানি করেছেন এবং দৈনিক খরচ বাবদ তাঁর জন্য এক টাকা নির্ধারণ করেছেন। বাস্তবে এ রকমই হয়েছিলো। এ স্বপ্নের পর কোনো এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর দৈনিক প্রয়োজনাদী মিটানোর জন্য এক টাকা ওজিফা নির্ধারণ করেছিলেন।

হজরত মাযহার তাঁর নিকটে প্রেরিত এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'ওয়া হুয়া মায়াকুম আয়না মা কুনতুম' (তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন)। তুমি যেখানে যাও, সেখানে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ করো। কেনোনা ওই জেলায় বুদ্ধিমান আলেম এবং নেসবতধারী দরবেশ কেউ নেই। খাতিরজমার সাথে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকো। অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। দীনের জাহেরী ও বাতেনী অর্জনের জন্য সময় ব্যয় করো। মহান পবিত্র সত্তা তোমাকে যে দৌলত দান করেছেন, তাই হবে তোমার প্রাপ্ত নেয়ামতের শুকরিয়া। হজরত জুনায়েদ বাগদাদী বলেছেন, নেয়ামত আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যয় করাই শুকরিয়া। ইনশাআল্লাহ্ অতিসত্বর দারিদ্র স্বচ্ছলতায় পরিবর্তিত হবে।

মুশকেলী নিস্ত কে আছাঁ না শোওয়াদ–
মরদে বায়েদ কে হর–আসাঁ না শোওয়াদ–

(এমন কোনো মুশকিল নেই, যা দূরীভূত হয় না। কাজেই মানুষের উচিত তা নিয়ে পেরেশান না হওয়া)।

গায়েব থেকে কোনো কিছু যদি এসে যায়, তাহলে তা বিনা চিন্তাভাবনায় গ্রহণ করা উচিত। কেনোনা অন্বেষণ ও সওয়াল করা ছাড়া যদি কোনো কিছু পাওয়া যায়, তবে তা গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, যদি তার উপর নির্ভর না করা হয়।[২৪] বিশেষ করে এ জমানায় তাওয়াক্কুল দিলের বিক্ষিপ্ততা দূরকরণে সহায়ক হয়। আর শুধুই তাওয়াক্কুল খাতিরজমাহীনতার কারণ হয়। মূলতঃ খাতিরজমাই হচ্ছে সুফিয়ানে কেরামের মূলধন। আল্লাহ্তায়ালা সুন্নতে নববীর অনুসারী এবং মোজাদ্দেদিয়া খানকার দরবেশদের খাতিরজমা অটুট রাখুন। তরিকার তালীম এবং কিতাবাদির দরস দানে নিজেকে পাবন্দ করে নাও। উক্ত আমলসমূহে সময় ব্যয় করার মধ্যেই দু'জাহানের কামিয়াবী নিহিত। সকালের পর প্রতিদিন খতমে

খাজেগান এবং মোজাদ্দেদে খতম অপরিহার্য। কেবল আল্লাহ্তায়ালার উপরই আশা রাখো। আর গায়রুল্লাহ থেকে নিরাশ হয়ে যাও। মারাঠা কাফেরদের বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে কোনো চিন্তা কোরো না। ইনশাআল্লাহ্ আমাদের বন্ধুদের কোনো ক্ষতি হবে না। আর আমাকে হাজিরই মনে করো।

হাজী মোহাম্মদ ইয়ার তাঁর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে তিনি হুজুরী ও আগাহীর নেসবত হাসিল করেছিলেন। তারপর তিনি মৌলভী নাঈমুল্লাহর সোহবত গ্রহণ করেছিলেন। মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীর অন্যতম সাথী আহমদ আলীও তাঁর কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করে কলবের নেসবত ও জযবায় মাগলুব হয়েছিলেন। তিনি জযবায় অস্থির হয়ে আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ সময় অস্থির ও উন্মাদনার হালে নিমজ্জিত থাকতেন। পরে তাঁর শায়েখ মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীর তরবিয়তে প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। স্বীয় বাতেনের কর্মকাণ্ড ফানায়ে নফস পর্যন্ত পৌঁছার পর তিনি তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পেয়েছিলেন। নেসবত মায়াল্লাহ (আল্লাহ্র সঙ্গতার নেসবত) এর হালে বিভোর থাকতেন তিনি।

১৫. মীর আব্দুল বাকী

তিনি মির্জা মাযহারের অন্যতম জলীলুল কদর খলীফা ছিলেন। জাহেরী এলেমেও তিনি প্রখ্যাত ছিলেন। অনেক বছর ব্যাপী তিনি শায়েখের সোহবতে থেকে ফয়েজ অর্জন করেছিলেন এবং তরিকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। পরিপূর্ণ এলেম ও আত্মমর্যাদায় ভূষিত ছিলেন। তিনি উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয়েছিলেন এবং আলমে মিছালের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর বন্ধুগণ কোনো বিষয়ে অবগতির জন্য তাঁর কাছে এস্তেখারার আবেদন করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে লব্ধজ্ঞান বাস্তব সম্মত হতো।

তাঁর পাঁচবার রসুলে করীম স. এর জিয়ারত নসীব হয়েছিলো এবং তাঁর মেহেরবানিতে তিনি বিশেষিত হয়েছিলেন।

১৬. খলীফা মোহাম্মদ জামীল

তিনি মির্জা মাযহারের সম্মানিত খলীফা ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে তাঁর দরবারে এসেছিলেন এবং তাওয়াজ্জোহ গ্রহণ করেছিলেন। এলমে দ্বীন শিক্ষাদান করতেন। আর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যাকে।

তিনি বলেছেন, এলমে দ্বীন হাসিলের পর আল্লাহ্তায়ালা আমাকে শায়েখ মির্জা মাযহারের তাওয়াজ্জোহের বরকতে তালেবে মাওলা হওয়ার স্পৃহা দান করেন। তখন থেকে আমার মকসুদের অন্বেষণে অসংখ্য দরবেশের খেদমতে হাজির হয়ে

অনেক কষ্ট-সাধনা করি। অবশেষে আমার মকসুদ হাসিল হয়। তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে তরিকার উচ্চতর মাকামসমূহে পৌঁছে এজাযত ও খেলাফত লাভ করি।

খলীফা সাহেব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শরীয়ত ও তরিকতের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শেষ মাকাম পর্যন্ত সুলুকে তিনি অত্যন্ত মজবুত ছিলেন। তিনি জাহেরী ও বাতেনী উভয় রোগের চিকিৎসায় বিশেষত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর শায়েখ মির্জা মাযহারের জীবদ্দশায় ইনতেকাল করেন।

১৭. শাহ্ ভেক

তিনি হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানী র. এর বংশধরগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।[২৮] শায়েখ মির্জা মাযহারের তাওয়াজ্জোহের বরকতে তাঁর পিতামহগণের নেসবতের খাস অংশ পেয়েছিলেন তিনি। বাতেনী কর্মকাণ্ডে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছে এজাযতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ্র পথে হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মোস্তফা স. এর সুন্নতের অনুসরণ এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকার উপর সুদৃঢ় ছিলেন। তাঁর ইনতেকালের পর শিখেরা সেরহিন্দ শরীফের মাজারসমূহ ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। তখন এক কাফেরের মাথার উপর তিনি এমন এক আঘাত করেছিলেন, যাতে সে সঙ্গে সঙ্গেই হালাক হয়ে গিয়েছিলো এবং তার সাথী-সঙ্গীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এমতো কারামত প্রকাশিত হওয়ার পর কাফেরেরা মাজারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত হয়েছিলো।

১৮. মৌলভী আব্দুল হক

তিনি হজরত শাহ্ ভেকের ভাই ছিলেন। মির্জা মাযহারের কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেসবত ও বাতেনের কর্মকাণ্ড ফানায়ে কলব পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। তাঁর হাল ছিলো বিশুদ্ধ। তিনি জাহেরী এলেমের পাঠদান করতেন। যৌবনকালেই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো।

১৯. শাহ্ মোহাম্মদ সালেম

তিনি মির্জা মাযহারের প্রবীণ খলীফাগণের অন্যতম ছিলেন। দশ বছর পর্যন্ত তিনি শায়েখের সোহবতে থেকে ফয়েজ গ্রহণ করে তরিকার সুলুকের মাকামসমূহ অতিক্রম করেছিলেন। তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পাওয়ার পর তালেবে মাওলাগণের হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

অনেক লোক তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে হুজুরীর স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো এবং তাঁরা তাঁর চাল-চলন ও আদব-শিষ্টাচারের উপর সুদৃঢ় ছিলো। মির্জা মাযহার তাঁর নিকট এক পত্রে লিখেছিলেন–

আমরা ভালো আছি। শরীয়ত পালন ও তরিকতের আমলসমূহ অপরিহার্য করা উচিত। মানুষের নিকট অধম ও হীন অবস্থায় থেকো। কেনোনা নফসের পূর্ণতা হচ্ছে নিস্তি বা অস্তিত্বহীনতা। আর আল্লাহ্তায়ালার হাস্তি বা অস্তিত্ব তো সুস্বীকৃত। ফকীর দরবেশ ও আলেমগণের সোহবতকে অপরিহার্য করে নিয়ো। সময়ের আপদ বিপদে ধৈর্যধারণ কোরো। কেনোনা এই দুনিয়া মুমিনদের জন্য কয়েদখানা। আখেরাতে শান্তিপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। কেউ যদি তরিকার দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তার খেদমত করা উচিত, যেনো তার কাছ থেকে খেদমত পাওয়া যায়। তবে মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে কেউ যদি নিজে থেকেই খেদমত করতে চায়, তাহলে তাতে দোষ নেই। তুমি যেখানেই থাকো না কেনো, মনে রেখো আল্লাহ্ তোমার সঙ্গে আছেন। অটল অবস্থায় থেকো এবং তরিকার পীরানে কেরামের প্রতি অন্তরে মহব্বত রেখো। ওয়াস্সালাম।

২০. শাহ্ রহমত উল্লাহ

তিনি মির্জা মাযহারের কামেল খলীফাগণের অন্যতম ছিলেন। পরিপূর্ণ মহব্বত এবং এখলাসের জন্য তিনি বিশেষিত ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশ থেকে তিনি আল্লাহ্র অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন। যেখানেই কোনো দরবেশ আছেন বলে শুনতেন, সেখানেই চলে যেতেন তিনি। শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে দেহলভীর সোহবতও পেয়েছিলেন।

তিনি বেলায়েতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং চার বছর পর্যন্ত মির্জা মাযহারের সোহবতে থেকে ফয়েজ হাসিল করেছিলেন। তরিকার সুলুকের কাজসমূহ শেষ মাকাম পর্যন্ত করেছিলেন এবং এজাযতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। নফসের কষ্টে রূহ শান্তি পায়– এ সমস্ত জালালী বিষয়াদি তাঁর কাছে প্রিয় ছিলো। সবর অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার ফয়সালাতে সন্তুষ্ট থাকা তাঁর স্বভাব ছিলো। আল্লাহ্র স্মরণের জন্য ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি এবং গায়রুল্লাহকে তরক করার উপর তিনি সুদৃঢ় ছিলেন। সমসাময়িক সরদারগণের ইচ্ছা ছিলো, তিনি যেনো তাদের দেয়া ভাতা কবুল করেন। কিন্তু তিনি তা কবুল করতেন না।

রাতের বেলায় তাঁর ঘরে আল্লাহ্র জিকিরের নূরের চেরাগ আর দিনের বেলায় মোস্তফা স. এর অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই থাকতো না। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি মাথায় একটি টুপী আর কোমরে একটি লুঙ্গি ছাড়া আর কোনো কাপড় পরিধান করেননি।

তাঁর সোহবতে তালেবগণের অনেক ভীড় হতো। পরিপূর্ণ খাতিরজমার সাথে মোরাকাবার হালকা অনুষ্ঠিত হতো। দুই ব্যক্তিকে তিনি তরিকার তালীম দেয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর সাথীগণের মধ্যে শাহ খোদা বক্সের হাল ছিলো খুবই ভালো। তিনি মির্জা মোজাফ্‌ফরের সোহবতও পেয়েছিলেন। তাঁর ইনতেকালের পর তিনিই মোরাকাবার হালকা পরিচালনা করতেন। মোহাম্মদ আকবরও তাঁর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি মির্জা মুজাফ্‌ফরের সোহবত থেকেও ফয়েজ গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের হজরত অর্থাৎ মির্জা মাযহার থেকেও তাওয়াজ্জোহ্‌ গ্রহণ করেছিলেন। আমার সঙ্গে (লেখক) তাঁর অনেকবার ওঠাবসা হয়েছিলো। তিনি অনেক সময় আমার কাছে তাঁর হারিয়ে যাওয়া হাল সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে ও আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি দান করুন।

২১. মোহাম্মদ শাহ্‌

তিনি হজরত শায়েখ খলীফা সুফী আবদুর রহমান থেকে তরিকা গ্রহণ করে শায়েখ মির্জা মাযহারের নিকটে আসেন। তিনি তাঁর তরবিয়তের বরকতে তরিকার শেষসীমা পর্যন্ত পৌঁছেন। তালেবে মাওলাদেরকে হেদায়েত করার এজাযত প্রাপ্ত হন। স্বীয় বাসস্থানে খাতিরজমার সাথে জিকির ও মোরাকাবার হালকা পরিচালনায় নিয়োজিত থাকতেন তিনি।

২২. মীর মুবীন খান

তিনি মির্জা মাযহারের উত্তম সাথী ও পছন্দনীয় বন্ধু ছিলেন। জাহেরী ও বাতেনী এলেমের পূর্ণতায় ছিলেন সুসজ্জিত। তিনি তাঁর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করে শেষ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তরিকার তালীম দেয়ার এজাযতপ্রাপ্ত হয়ে তালেবগণের হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

অনেক তালেব তাঁর সোহবতের বরকতে হুজুরী এবং খাতিরজমা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রতি তাদের খুব মহব্বত ছিলো। তারা সকলেই তাঁর আচার আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁর সম্পর্কে মির্জা মাযহার বলেছেন–

মীর মুবীন আল্লাহ্‌র একজন বড় ওলী এবং সে হচ্ছে ছোট জানে জানান। এর চেয়ে অধিক তো আর বলা যায় না।

তাঁর সাথীগণের মধ্যে মীর মোহাম্মদ বাতেনী নেসবতে নফস লতীফার ফানা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তাঁর বিশুদ্ধ কাশফে কওনী অর্জিত ছিলো এবং আগত দিনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি দাবি করে বলতে পারতেন এবং সেরূপই প্রতিফলিত হতো। তিনি ফেরেশতা এবং আত্মা জাহেরীভাবে দেখতে পেতেন। পীর মোহাম্মদ বলেন, একদা শীতের দিনে আমি নদীতে গোসল করছিলাম। এমন সময় সেখানে

উপস্থিত হলো একটি বাঘ। আমার সাঁতার জানা ছিলো না। আমি তখন হজরত মুবীন খানের প্রতি তাওয়াজ্জোহ করলাম। দেখলাম, মীর মুবীন খান সাহেব হাতে একটি লাঠি নিয়ে এসে বাঘটিকে পিটিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

২৩. মীর মোহাম্মদ মুঈন খান

তিনি মীর মুবীন খানের ভাই ছিলেন। এখলাস ও মহব্বতের দিক দিয়ে মির্জা মাযহারের সাথীগণের মধ্যে অনেকের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তরিকার তালীম গ্রহণ করেছিলেন শায়েখ মির্জা মাযহারের কাছ থেকেই। তিনি তরিকার এজাযতের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। উন্নত আদব ও মার্জিত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শায়েখ মির্জা মাযহার তাঁর কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

মানবতার আদব যা হওয়া উচিত, তা তোমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে অন্যকে শরীক করা অন্যায়। আল্লাহ্তায়ালা তোমার আচার-আচরণ আরও উত্তম বানিয়ে দিন।

আজ শাওয়াল মাসের দশ তারিখ। তোমার পিতা যিনি হাজারো গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, যিনি অন্তরে জায়গা দখল করে এ দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁর ওফাত দিবস। আমি তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে আনুলা এসেছি। শোকবানী লেখা অবশ্য ভনিতামুক্ত নয়। তবু লিখছি। আমি এবং তিনি এ দুনিয়ায় আগমন করার দিক দিয়ে সামান্য অগ্রপশ্চাত সাপেক্ষে আমরা সফরসঙ্গী ছিলাম। এখন আসল বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেছে। এখনও আমরা কয়েক নিঃশ্বাস দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে একই কাফেলার সঙ্গী।

ইমরোজগার আয রফতা হারীফাঁ খবরী নিস্ত
ফরদাস্ত দঁরী বজম কে আযমা আদুরী নিস্ত

(আজ অতীতের সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কোনো খবর নেই। আর আগামী কাল এই মহফিলে আমাদেরও কোনো নাম নিশানা থাকবে না)।

দুর্বলতা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এক পাশে হেলান দিয়ে হালকা পরিচালনা করে থাকি। যদিও এ মুহূর্তে জীবনের কোনো স্বাদ নেই, কিন্তু তার পরও সুফীগণের জীবন গনিমত তুল্য। এক তো তা নিজের জন্য। আর দ্বিতীয়তঃ অন্যের জন্যও। তোমার স্ত্রীকে আল্লাহ্তায়ালা বেলায়েতে কোবরা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। ওই অসাধারণ পুতঃপবিত্র রমণীটি ভালো যোগ্যতা রাখে। আকীদা ও এখলাসের দিক দিয়ে সে পুরুষদেরও পেশোয়া হওয়ার যোগ্যতা রাখে। মীর মাক্ষু কামালাতে নবুওয়াতের প্রাথমিক মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মীর মুবীন খানকে শায়েখ নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজকাল সকাল-সন্ধ্যায় খুব জমজমাট হালকা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা এসে গেছে। আল্লাহ্তায়ালা সুযোগ দান করুন, যেনো পরিভাষাগত সুলুকের সায়ের পরিপূর্ণ করতে পারি। তোমার স্থানটি কিন্তু খালি রয়ে গেছে। জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নের ফয়েজ ও বরকত এতো বেশী পরিমাণ হচ্ছে যে, লেখনী তা প্রকাশ করতে অপারগ।

আলহামদু লিল্লাহি আ'লা নাওয়ালিহী
ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিহী ওয়া আলিহী

২৪. মীর আলী আসগর ওরফে মীর মাক্ষু

তিনি মীর মোহাম্মদ মুবীন খানের নিকটাত্মীয় এবং মির্জা মাযহারের মনোনীত খলীফা ছিলেন। তিনি জাহেরী সৌন্দর্য, বাতেনী আস্বাদন এবং পরিপূর্ণ আদবে ভূষিত ছিলেন। তরিকার তালীম শায়েখ মির্জা মাযহার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সুলুক ও বাতেনের কর্মকাণ্ড শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। তিনি তরিকার মাকামসমূহের হাল পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যন্ত এখলাসের সাথে রাবেতার জিকির ও দাওয়াম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তাছাড়া তিনি মির্জা মাযহারের উন্নত প্রাপ্তির বিকীরণ থেকেও ফায়দা গ্রহণ করে আলোকিত হয়েছিলেন। বুজুর্গগণ বলেছেন, হাল ও কাইফিয়ত অর্জনের জন্য শায়েখের প্রতি মহব্বত ও রাবেতার জিকিরই শক্তিশালী শিকড়। আর এই পদ্ধতি জিকির ও মোরাকাবার দু'টি পদ্ধতি থেকে উত্তম। মীর সাহেব ফয়েজে এলাহীর সমন্বয়স্থল এবং চৈতন্যের নূরের প্রকাশস্থল ছিলেন। বাতেনের তরিকার এজাযত তাঁর অর্জিত হয়ে ছিলো। তালেবগণকে জিকির এবং মোরাকাবার শিক্ষা দিতেন। মুর্শিদাবাদে বহু লোক তাঁর মুরিদ হয়েছিলো। ফলে সেখানে সাহেবে দিল লোকদের মজমা (সভা) অনুষ্ঠিত হতো। হালাল রিজিক অর্জন করার জন্য তিনি ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ ব্যবসা তাঁর ওজিফা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো না। যেমন এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে– 'ওই সকল লোক, যাদেরকে কোনো ব্যবসা এবং ক্রয়বিক্রয় আল্লাহ্র জিকির থেকে গাফেল করতে পারে না'।[২৯] এই আয়াতের অনুরূপ ছিলো তাঁর হাল। কিছুকাল হলো তাঁর ইনতেকাল হয়েছে।[৩০]

২৫. মোহাম্মদ হাসান আরব

তিনি মির্জা মাযহারের পুরানো সাথী ছিলেন। তাঁর সাধনা ছিলো মজবুত। সর্বদাই তিনি রোজা রাখতেন। আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে তিনি চল্লিশ হাজার বার কলেমা তাইয়্যেবার জবানী জিকির করতেন এবং দশ হাজার হাবছে দম নফী

ইসবাতের কলবী জিকির করতেন। হাজার বার সুরা এখলাস, দরূদ, এস্তেগফার ইত্যাদি দৈনিক ওজিফা ছিলো। তাঁর হাল ছিলো এই আয়াতে কারীমার অনুগামী 'তোমরা বেশী বেশী আল্লাহ্র জিকির করো, তাহলে সফল হতে পারবে'।[৩১] তিনি রাত জেগে থাকতেন এবং দিনে শায়েখের খেদমত করতেন। রোজা, রাত্রি জাগরণ এবং অধিক জিকিরের ফলে তাঁর সহীহ্ কাশফ্ হাসিল হয়েছিলো। তিন বছরের মধ্যে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুক সমাপ্ত করে খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে তালেবগণের প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হন। মির্জা মাযহার বলতেন, আমার সারা জীবনে কেবল একজন তালেবে মাওলা এবং মুজাহিদ আমার কাছে এসেছে। আর সে হচ্ছে মোহাম্মদ হাসান আরব। শায়েখের এই উক্তি তাঁর গুণ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট।

২৬. মোহাম্মদ কায়েম কাশমিরী

তিনি খাজা মুসা খানের সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মকসুদ হাসিল করার জন্য সফরের অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অনেক ফকীর দরবেশের নিকট গমন করেছেন। রোজা এবং রাত-জাগরণ তাঁর স্থায়ী আমল ছিলো। হজরত খাজা মুসার নির্দেশেই তিনি মির্জা মাযহারের নিকটে এসেছিলেন এবং তাঁর সুন্দর প্রতিপালনের বদৌলতে তিন বছরের মধ্যে তরিকার চূড়ান্ত মাকামসমূহে পৌঁছে তরিকার তালীমের এজাযত লাভ করেছিলেন।

তিনি হজরত মুসা খানের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বোখারায় গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত দেখতে পান। হজরত মুসা খানের ওফাতের পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, আমাদের শায়েখ হজরত মির্জা মাযহার তাঁর (খাজা মোহাম্মদ কায়েম) হালের উপর তাওয়াজ্জোহ দিচ্ছেন। সুতরাং তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে সেখানে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায় এবং অনেক তালেব তরিকা গ্রহণের জন্য তাঁর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু তাঁর অন্তর বোখারায় স্থির হলো না। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন, মদীনা মোনাওয়ারায় তাঁর একটি বাগান আছে। আর সেখানে আমাদের শায়েখ হজরত মাযহারের একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। ওই ঝর্ণার পানি সেই বাগানে আসছে এবং বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে আছে। এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর মনে রসুলেপাক স. এর রওজা শরীফ জিয়ারত করার প্রবল আকাংক্ষা জাগলো এবং তিনি হজ্বব্রত পালনের সুদৃঢ় এরাদা করলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার দু'টি পুত্রসন্তান আছে। আমি মান্নত করেছি, তাদের একজনকে খানায়ে খোদার প্রতিবেশী বানাবো। আর অপরজনকে বানাবো মসজিদে নববীর খাদেম।

২৭. হাফেজ মোহাম্মদ

তিনি হজরত মুসা খানের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই তিনি আমাদের শায়েখ মির্জা মাযহারের খেদমতে আসেন। একবার তিনি শক্ত কবজের হালের মুখোমুখি হন। কোনোক্রমেই বসতের হাল পাচ্ছিলেন না। তিনি তখন নফসের ফানার কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি খাজা নকশবন্দকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে বলছেন, হে বৎস! তোমার আসল কাজ তো যাবতীয় অনিষ্ট থেকে দিলকে পাক করা। আর নিকৃষ্ট কাজ থেকে নফসকে পবিত্র করা। আর মহাদৌলত তো তোমার অর্জিতই হয়েছে। দীর্ঘদিন পর তাঁর খেদমতের ফলাফল প্রকাশিত হলো। যার ফলে শায়েখ তাঁর হালের উপর মেহেরবানি করলেন। তাঁকে বললেন, এখন তোমার কবজের হাল অপসারিত হওয়ার সময় এসে গেছে। শায়েখ তাঁর বাতেনের প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন এবং যে বন্ধন বছর বছর ধরে বিদ্যমান ছিলো, তা একটি হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গেলো এবং তাঁর সংকীর্ণ দিলে ফয়েজ জারী হলো। সংকীর্ণতার রহস্য একথার মধ্যে নিহিত আছে– 'খেদমতে তোরা ব কংগরাহ কিবরিয়া কুশাদ' (খেদমত তোমাকে উচ্চতার চূড়ান্ত মাকামে পৌঁছে দিবে)।

হজরত খাজা আহরার বলেছেন, আমার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা মাশায়েখগণের খেদমতের দ্বারাই হয়েছে। হাম্মামখানায় বিশজনের অধিক দরবেশের শরীর মর্দন করে দিয়েছি। ওই দরবেশগণের সন্তুষ্টির বদৌলতে আমার অন্তরে মারেফতের সলিল প্রবাহিত হয়েছে এবং গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত করার নাপাকি থেকে আমার হৃদয় পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

হাফেজ মোহাম্মদ ওই সময়ের এমন এক মোহদ্দেছ থেকে এলমে হাদিসের সনদ নিয়েছিলেন, যিনি হজরত মোজাদ্দেদকে অস্বীকার করতেন। হজরত মোজাদ্দেদের পবিত্র রূহ এসে মির্জা মাযহারকে তাঁর হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিতে নিষেধ করলো। তিনি তাঁর হালকাতে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন না। বললেন, আমার সঙ্গে তোমার বহু দিনের পুরানো সোহবত রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে। কিন্তু পীরানে কেরামের ইচ্ছে নেই যে, আমি তোমাকে তাওয়াজ্জোহ দেই। সে দিন থেকেই তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হতো। তিনি উন্মাদনার জোশে সর্বদাই এ শের পড়তেন–

নকশবন্দিয়া আজব কাফেলা সালার আন্দ
কে বরন্দ আয রাহে পেনহাঁ ব হেরমে কাফেলা রা

(নকশবন্দী মাশায়েখগণ কাফেলার এমন সব সিপাহসালার, যারা গোপন পথে বিচরণ করে হেরেমে পৌঁছে যায়)।

এমনি অবস্থায় তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো।

২৮. মৌলভী কুতুবুদ্দীন

তিনি জাহেরী এলেমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি এই তরিকার মাশায়েখগণের সোহবত গ্রহণ করেছিলেন। এই খান্দানের কোনো এক বুজুর্গের কাছ থেকে তিনি জিকিরের ছবক গ্রহণ করেছিলেন। হজরত খাজা মুসা খানের সোহবতও পেয়েছিলেন এবং সাত বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করেছিলেন। তাঁর বাতেনী সুলুকের কাজ ফানায়ে কলব ও ফানায়ে নফসের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। হজরত মোহাম্মদ যোবায়ের র. এর খলীফাগণের মধ্যে খাজা জিয়াউল্লাহ এবং শাহ্ আব্দুল আদেল, শায়েখ মোহাম্মদ আবেদের খলীফা শাহ্ আব্দুল হাফীজের সোহবত পেয়েছিলেন এবং স্বীয় নেসবতকে শক্তিশালী করেছিলেন। আমাদের শায়েখ হজরত মির্জা মাযহারের সোহবতও গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর কাছ থেকেই মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুকের শেষ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেন।

ফানা ও নিস্তির হাল তাঁর উপর গালেব হয়ে গিয়েছিলো। তিনি মার্জিত ও কোমল মনের লোক ছিলেন। শেষ জীবনে বাতেনী নেসবতে এস্তেহলাক ও এজমেহলাল (ক্ষয় ও লয় প্রাপ্তি) এর হাল গালেব হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। এমনি অবস্থায়ই তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো।

২৯. মৌলভী গোলাম ইয়াহইয়া

তিনি একজন বুদ্ধিমান আলেম ও সুবক্তা ছিলেন। ছিলেন উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন। কোরআন মজীদ হেফজ ছিলো। জাহেরী এলেমের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাহেরী এলেমের বিভিন্ন কিতাবের অনেক উপকারী টীকাভাষ্য লিখেছেন। তিনি স্বভাবজাত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাদেরিয়া তরিকা এই খান্দানের কোনো এক বুজুর্গ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত বাতেনী জিকির ও শোগলে নিয়োজিত ছিলেন। সবর, অল্পে তুষ্টি, আমীর ওমরাদের থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। যার ফলে তিনি এ পথে এক উচ্চ আসন লাভ করেছিলেন।

মির্জা মাযহারের কামালাতের সুখ্যাতি শোনার পর তাঁর অন্তরে জযবা সৃষ্টি হলো এবং তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে দিল্লীতে তাঁর আস্তানায় এসে হাজির হলেন এবং তাঁকে দর্শন করার পর তাঁর কাছ থেকে নকশবন্দিয়া তরিকা দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তরিকার মাকামসমূহের সুলুক করার ক্ষেত্রে হিম্মতের সাথে কাজ করেছেন। দু'মাস পর্যন্ত তিনি কোনো কাইফিয়ত অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বাতেনী শোগলসমূহে অগ্রসর হতে থাকেন। কেনোনা প্রথমতঃ

তৌফিকে এলাহী হচ্ছে তাঁর স্মরণ। হাল ও কাইফিয়ত অনুভব করা আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলস্বরূপ, যা যথাসময়ে অর্জিত হয়ে থাকে। কোনো সুফীর ইহজগতে যদি কোনো কিছু না মিলে তাহলে আখেরাতে প্রতিদানের জগতে অবশ্যই তার আমল ও এখলাসের কাইফিয়ত প্রকাশিত হবে।

তুনন্দেনী চুঁ গদায়া বশরতে মযদ মকুন
কে খাজা খোদ রুশ বান্দা পরওয়ারী দান্দ

(ভিক্ষুকের মতো প্রতিদান পাওয়ার আশায় বন্দেগী কোরো না। কেনোনা তোমার মালিক বান্দাদের প্রতিপালনের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে খুবই অবগত আছেন)।

কোনো এক বুজুর্গ বলেছেন– ক্রন্দনের স্বাদই হচ্ছে ক্রন্দনের মূল্য। আরেকজন বলেছেন, নামাজের মধ্যে মজা পাওয়া (গোপন) শিরক। আল্লাহ্তায়ালার বিধান এরকম যে, কাউকে জিকিরের কাইফিয়ত দান করেন, কাউকে এলেমের রহস্য দান করেন, আবার কাউকে নিছক স্মরণ ও ইবাদতের তৌফিক দান করেন। এই তিন নেয়ামতের যে কোনো একটিই আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। সে জন্যই কোনো এক বুজুর্গ বলেছেন, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে পেরেছে আবার কেউ কেউ রয়েছে অজ্ঞ। যেমন এলমে আসরার ও এলমে হাকীকত এবং তাজাল্লিয়াতে এলাহীর তফসিলী দর্শন ইত্যাদি দুর্লভ বিষয়। এভাবে বাতেনী হালসমূহ জানা তাও অনেক কম হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে এলেম লাভ করাটাই মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হচ্ছে মহব্বত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক লাভ। 'আল্লাহুম্মা ওয়াক্বফাক্বানা লিমা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা' (হে আল্লাহ্! তুমি যা ভালো বাসো ও পছন্দ করো তার তৌফিক আমাকে দান করো)।

আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে তাঁর উপর তরিকার হাল ও কাইফিয়তসমূহ প্রতিফলিত হওয়া শুরু করে দিলো। নকশবন্দী জযবায় সফলকাম হলেন। তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত মির্জা মাযহারের সোহবতে থেকে ফয়েজ অর্জন করতে থাকেন। এরপর তাজাল্লিয়ে জাতির সুলুকে তাঁর স্থায়ী সায়ের হাসিল হয়। তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত নিয়ে সফলকাম হয়ে নিরাপদে স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। সেখানে পৌঁছার পর তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হলো। তালেবে মাওলাগণ তাঁর দিকে ধাবিত হতে শুরু করলো। জাহেরী এলেমের পাঠদান স্থগিত করে বাতেনী হাল অধ্যয়নের মধ্যে নিয়োজিত হলেন তিনি। একাকীতে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশের মোরাকাবা করতেন। বাতেনী নেসবতের হালের প্রাবল্যের কারণে যা কিছুর আবির্ভাব হতো, সে সবের প্রভাবে অন্য কোনো দিকে খেয়াল করার

ফুরসত ছিলো না তাঁর। এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে চলমান জীবনের মধ্যে ছন্দপতন হলো। তাঁর হায়াত তাঁর সাথে ওফা করলো না।

তাঁর কাদেরিয়া সিলসিলার এক বুজুর্গ অসুস্থ হলেন। তিনি তাঁর রোগ অপসারণ করার মানসে তাওয়াজ্জোহ্ প্রদান করলেন। তখন শায়েখের ব্যাধি তাঁর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো এবং তিনি এ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে মির্জা মাযহার মনে ব্যথা পেয়েছিলেন। তিনি সেই ব্যথা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে–

মৌলভী গোলাম ইয়াহ্ইয়ার বিদায়ে অন্তরে যে আঘাত লেগেছে, তার ঘা শুকাবার নয়। তার ওফাতের মর্মস্পর্শী ঘটনায় আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। ধৈর্য্যধারণ করা ছাড়া আর উপায় কী। কাল তো আমাকেও এখান থেকে চলে যেতে হবে।

মৌলভী গোলাম ইয়াহ্ইয়া ওয়াহ্দাতুল ওজুদ এবং ওয়াহদাতুশ্ শুহুদ বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন।[৩৪] তা শায়েখ মির্জা মাযহারের নজরেও পড়েছিলো। তিনি তা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওই পুস্তিকায় তিনি তাঁর নিজের মন্তব্য লিখেছিলেন এভাবে–

আল্লাহ্র প্রশংসা করছি এবং তাঁর রসুলের উপর দরূদ পাঠ করছি। জ্ঞানগত ও সংকলিত এলেমের সঞ্চয়কারী সাইয়্যেদ গোলাম ইয়াহ্ইয়া (আল্লাহ্তায়ালা তার আশা পূর্ণ করুন) তরিকতের ভ্রাতৃত্বের যে সম্পর্ক রাখে জানে জানানের সাথে, সে সম্পর্কের দাবি অনুসারেই আমার ইঙ্গিতে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ ও ওয়াহদাতুশ্ শুহুদের মাসআলার একটি সংক্ষিপ্ত রচনা আমাকে দেখিয়েছে। সত্য কথা এই যে, সংক্ষিপ্তির মাধ্যমে সে পুরো বিষয়টিকে বেষ্টন করেছে। আল্লাহ্তায়ালা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কিন্তু মাসআলাটি সামঞ্জস্য বিধানের দিকে নেয়ার প্রয়োজন ছিলো না। কেনোনা কাশফ্কৃত বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের সূত্র টানা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত নয়। তবে এর মধ্যে হয়তো কোনো কল্যাণ নিহিত আছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেনো এসলাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ্তায়ালা রহম করুন ওই বান্দার উপর যে ইনসাফ করে। বেইনসাফী না করে। যে হেদায়েতের উপর, তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এই কিতাবের লেখক শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী বলছেন, এ দু'টি মাসআলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব ব্যাপার। কেনোনা মাসআলা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রসম্পৃক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটি মাসআলার মাশরাব (পান করার স্থান/উৎস) নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। কেউ যদি এলেম ও অনুভূতির সাথে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সায়ের করে থাকেন, তবে তাঁর কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।[৩৫]

৩০. মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীন

তিনি সদ্‌বংশজাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বংশধারা হজরত বড় পীর সাহেব পর্যন্ত পৌঁছেছে। জ্ঞানগত ও সংকলিত এলেমের আলেম ছিলেন। কোরআন মজীদের হাফেজ ছিলেন। হাদিসের এলেমে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিলো তাঁর। দুনিয়া থেকে নির্লিপ্ত ইবাদতগোজার ব্যক্তি ছিলেন। গায়রুল্লাহ্ থেকে বিমুখ থেকে তাওয়াক্কুলের মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। আল্লাহ্‌র অন্বেষণের প্রাবল্যের কারণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তিনি তাঁর সমসাময়িক মাশায়েখগণের সোহবত লাভ করেছিলেন। বুজুর্গানেদ্বীনের অনুগ্রহে ধন্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের তরিকাসমূহের জিকির ও শোগল করতেন। কলবের আস্বাদের কাইফিয়ত হাসিল হয়েছিলো তাঁর। তবুও থাকতেন পূর্ণত্বের জন্য সতত অস্থির।

তিনি, মৌলভী গোলাম ইয়াহ্‌ইয়া এবং মৌলভী আব্দুল হক একই দিনে হজরত মাযহারের খেদমতে হাজির হন[৩৬] এবং তরিকার দীক্ষা গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেন। হজরত মাযহার দু'জনকে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁকে বললেন, তোমার মধ্যে কিছু ভয়াবহতা দেখা যাচ্ছে। কাজেই কিছুকাল তুমি ফকীর দরবেশগণের তালাশে থাকো। এই নির্দেশক্রমে তিনি দু'বছর পর্যন্ত দিল্লীর বিভিন্ন পীর মাশায়েখের দরবারে যেতে থাকেন। যেখানেই কোনো দরবেশের সন্ধান পেতেন, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতেন। কিন্তু কোথাও শান্তি পেতেন না। অবশেষে তাঁর খেদমতেই এসে হাজির হন। দু'বছর পর্যন্ত তাঁর সোহবত গ্রহণ করেন। সিফাত ও শুয়ুনাতের তাজাল্লী অতিক্রম করে স্থায়ী তাজাল্লীয়ে জাতি অর্জন করেন এবং তরিকা শিক্ষাদানের অনুমতি লাভ করেন।

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. যেদিন তাঁকে এজাযতের খেরকা প্রদান করেন সেদিন বলেন, তুমি গায়েব থেকে কোনো সুসংবাদ পাবে। তিনি তখন আমাকে (লেখক) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি এক মহান বুজুর্গ সুরা ওয়াদ্দোহা আমাকে পাঠ করে শোনাচ্ছেন। আমি (লেখক) স্বপ্নটির তাবীর করেছিলাম এভাবে– এতে রয়েছে হেদায়েতের পথে উন্নতি এবং রেজার মাকাম হাসিল হওয়ার শুভসমাচার।

মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীন বলেছেন, যখন আমি হজরত মির্জা মাযহারের খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম, তার জিকিরের হালকায় হজরত বড়পীর সাহেব র. মির্জা সাহেবের জায়গায় বসে আছেন। আরও দেখলাম, হজরত বড়পীর সাহেব তশরীফ এনেছেন এবং মির্জা সাহেব তাঁর হুজরা থেকে নিয়াজ নিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করছেন। এই দৃশ্য দেখে আমি বুঝলাম, এই খান্দানের মধ্যে

কাদেরিয়া সিলসিলার ফয়েজও রয়েছে। হজরত বড়পীর সাহেবের ফয়েজের দৃষ্টিপাত হজরত মাযহারের আকৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছে একারণেই।

আমি (লেখক) একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, মৌলভী গোলাম মহিউদ্দিনের ওস্তাদ মৌলভী বাবুল্লা[৩৭] হজরত বড় পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করার ইচ্ছা করেছিলেন। হজরত তখন স্বপ্নে তাঁকে বললেন, আমার ফরজন্দ গোলাম মহিউদ্দিন তোমার ওখানে লেখাপড়া করছে। তাকে দেখলেই আমাকে দেখা হবে। এ জন্য সফরের কষ্ট ভোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী লিখেছেন, একদা বরকত লাভের আশায় আমি তাঁর জামা মোবারক পরিধান করেছিলাম। তাতে আমার মধ্যে এতো ফয়েজ ও বরকত জারী হয়েছিলো, যা ইতোপূর্বে আমি আর কখনও পাইনি।

মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীন আওরঙ্গবাদে ছিলেন। তখন ফয়েজপ্রত্যাশী বহু তালেব তাঁর আশেপাশে জমা হয়েছিলো এবং তাঁর সোহবত থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছিলো। সেখানে তিনি দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে চলে যান এবং হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত করেন।

৩১. মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী

মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদ র. এর অন্যতম নির্ভরযোগ্য খলীফা ছিলেন মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী। তিনি জ্ঞানগত ও বর্ণনাজাত এলেমের সমন্বয়ক ছিলেন। এলেম অর্জন কালেই বাতেনী শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হতে চেয়েছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নযোগে সুসংবাদ পান যে, এই মহা দৌলত অর্জন করার জন্য কামেল শায়েখ প্রয়োজন। আর তোমার জন্য সে সময় এখনও আসেনি। ফলে জাহেরী এলেম সমাপ্ত করার পর তিনি খলীফা মোহাম্মদ জামীল, যাঁর বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে– তাঁর কাছে নকশ্বন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করেন। এরপর শায়েখ হজরত মির্জা মাযহারের খেদমতে হাজির হয়ে চার বছর পর্যন্ত তাঁর সোহবত গ্রহণ করেন। যার ফলে এই উচ্চ তরিকার মাকামসমূহ অর্থাৎ দায়েমী তাজাল্লিয়াতে জাতি লাভ করে খেলাফত ও এজাযতের খেরকা হাসিল করেন এবং স্বীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার পর তালেবগণের প্রত্যাবর্তনস্থল হন।

তাঁর সোহবতের তাছিরে অন্তরে খাতিরজমা ও হুজুরী অর্জিত হতো। এই সম্মানিত তরিকার উপর পূর্ণ দৃঢ়তা ছিলো তাঁর। নবীয়ে করীম স. এর সুন্নতের অনুসারী এবং আখলাকে হাসানায় সুসজ্জিত ছিলেন তিনি। সবর ও স্বল্পে তুষ্টির আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের সময়কে আল্লাহ্‌র স্মরণে পরিপূর্ণ রাখতেন। শায়েখ মির্জা মাযহারও তাঁর হালের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাঁর নিজের অবস্থা এভাবে ব্যাক্ত করেছেন, আমার শায়েখ আমার ব্যাপারে বলেছেন, চার বছরের

সোহবতে তোমার এক জগত আলোকিত হয়ে গিয়েছে। আর দু'জাহানের বিজয় আল্লাহ্তায়ালা দান করবেন তোমাকে।[৩৮] আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে তাঁর কামালাতের সাথে নিরাপদ রাখুন। আমি (লেখক) শুনেছি, মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচীর সাথীগণের মধ্যে কারামতুল্লাহ[৩৯] এবং আলী বেগ[৪০] ভালো অবস্থায় ছিলেন।

৩২. মৌলভী কলীমুল্লাহ বাঙ্গালী

তিনি মির্জা মাযহার জানে জানানের বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি তরিকার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি শায়েখের বাতেনী ফয়েজ লাভ করেছেন। কামালাতের নেসবত যখন হাসিল করে ফেলেন, তখন তিনি এজাযতপ্রাপ্ত হন এবং নিজের জন্মভূমিতে রওয়ানা হন।[৪১] তিনি বলেছেন, শায়েখের সোহবতে থেকে হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর মকতুবাত শরীফ অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়। তাতে আমার অন্তরে মহব্বত প্রগাঢ় হয় এবং আকীদা হয় সুদৃঢ়। হজরতের মকতুবাত এবং তার বর্ণনাদির নূর দ্বারা আমার অন্তরে দায়েমী হুজুরী এবং চৈতন্য সৃষ্টি হয়।

একবার মুর্শিদাবাদের কাযীর ওখানে খানার দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। কাযী সাহেবের খানা খাওয়া মাত্রই আমার বাতেনে যে হুজুরী এবং পরিচ্ছন্নতা ছিলো, তা দূর হয়ে গেলো এবং কলবের উপরে পড়ে গেলো অপরিচ্ছন্নতার আবরণ। কোনো আমল দ্বারাই তা দূর হচ্ছিলো না। তখন হৃদয়ে ফকীর-দরবেশগণের জিয়ারতের বাসনা প্রবল হলো এই আশায় যে, কোনো বুজুর্গের নেক দৃষ্টিতে পূর্বের পরিচ্ছন্নতা এবং হুজুরী যদি ফিরে পাই। আমি বুজুর্গগণের বিভিন্ন দরবারে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও প্রশান্তি ও একাগ্রতা ফিরে পেলাম না। অবশেষে আমি শায়েখ মির্জা মাযহারের খেদমতে হাজির হলাম। তাঁকে দেখার সাথে সাথে আমার হৃদয় প্রশান্ত হলো। আমি পুনরায় তাঁর কাছ থেকে নকশ্বন্দিয়া তরিকার তালীম গ্রহণ করলাম। তিনি আমার প্রতি তাওয়াজ্জোহ প্রদান করলেন। আমার বাতেনে পনেরো দিন পর্যন্ত তাঁর তাওয়াজ্জোহের প্রভাব বিদ্যমান থাকতো। তিনি আমাকে বলতেন, তোমার লতীফাসমূহ তীব্রভাবে জারী আছে। কিন্তু আমি ছিলাম শান্ত।

একদিন এক পথ অতিক্রমকালে হঠাৎ আমার কলব আন্দোলিত হলো এবং ইসমে জাতের আওয়াজ আমার কানে এলো। আমার শরীর প্রকম্পিত হলো। এই ফকীর (শাহ্ গোলাম আলী দেহলভী) স্বচক্ষে তাঁর কম্পন প্রত্যক্ষ করেছে। এ ধরনের প্রকম্পন প্রাথমিক পর্যায়ের সালেকদেরকে আনন্দ প্রদান করে বটে, কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি সার্বক্ষণিক মনোনিবেশ করা এবং গায়রুল্লাহ্ থেকে অনুভূতিকে খালি করা।

মৌলভী কলীমুল্লাহ বাঙ্গালী বলেছেন, আমার উপর এমন এক জটিলতা দেখা দিলো, যার কোনো সমাধান আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। আমি আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য হজরত মোজাদ্দেদ আলফেসানি র. এর খতম শরীফ শুরু করে দিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, বিশাল সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। আমি একটি কাগজের নৌকা পানির স্রোতের বিপরীত দিকে চালিয়ে ঝড় থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমার যথেষ্ট সন্দেহ হলো, আমি অবশেষে তীরে পৌঁছতে পারবো কি না।

এমন সময় অদৃশ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাকে বললো, ভয় কোরো না। হজরত মোজাদ্দেদের সাহায্যে তোমার নৌকা মনজিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেমে গেলো এবং নৌকা নিরাপদে তীরে এসে ঠেকলো। এই স্বপ্নের দু'তিন দিন পর আমার সেই জটিলতা দূর হয়ে গেলো। এর পর থেকে প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে আমি ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফেসানির শরণাপন্ন হতাম। তখন গায়েব থেকে সাহায্য পেয়ে সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো।[৪২]

৩৩. মীর রুহুল আমীন

তিনি ছুনিপুতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। এক বুজুর্গ থেকে কাদেরিয়া তরিকা গ্রহণ করে বাতেনী শোগলে নিয়োজিত ছিলেন। শাজারিয়া সিলসিলার কোনো কোনো জিকিরও এক বুজুর্গ থেকে শিখেছিলেন, যাতে তাঁর বিস্ময়কর আত্মিক প্রাপ্তি লাভ হয়েছিলো।

তিনি নিজে বলেছেন, ইসমে জাতের জিকির আমার মধ্যে এমন প্রবল হলো যে, সব জায়গায়ই আমি 'আল্লাহ্'র পবিত্র নাম দেখতে পেতাম। একবার দেখলাম, কেবলার দিকে একটি দেয়াল। দেয়ালটি ফেটে গেছে এবং পরিষ্কার কাবাঘর দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী আওলিয়া কেরামকে আমি প্রকাশ্যে দেখতাম। তাই আমার কলবে উত্তাপ ও আগ্রহ হাসিল হয়েছিলো। কিন্তু তারপরও আমার অন্তরে প্রশান্তি আসছিলো না। এমনকি এক পর্যায়ে আমি শায়েখ মির্জা মাযহারের সাথে সংশ্লিষ্ট হলাম। আমার অন্তরে খাতিরজমা এবং প্রশান্তি অর্জিত হলো এবং আমার আরজু যা ছিলো তা পূর্ণ হলো।

এভাবে মীর রুহুল আমীন র. কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে ফায়দা লাভ করেন এবং তরিকার এজাযতের মাকাম লাভ করেন। পরে তিনি আরও উন্নতি করেন। তাঁর নেসবত কামালাত পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। তাঁর নেসবতের মধ্যে অনেক দৃঢ়তা ছিলো। শায়েখ মির্জা মাযহার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সে মোহাম্মদিউল মাশরাব। তার নেসবত সুদৃঢ়। জীবনের শেষ দিকে এসে সে কোরআন মজীদ মুখস্থ করা শুরু করেছে। সমস্ত কোরআন মজীদ মুখস্থ করার আগেই তাঁর ইনতেকাল হয়ে

গেলো। 'শরহুস সুদূর' কিতাবে[৪৩] জালালুদ্দীন সুয়্যূতী র. একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এরকম– যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ কোরআন মুখস্থ করতে যেয়ে না পেরে মৃত্যুবরণ করে, ফেরেশতা তাকে এমন একটি ছেপফল দান করবে, যার সুঘ্রাণ নেয়া মাত্রই তার সমস্ত কোরআন স্মরণে এসে যাবে।

তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর সন্তান মীর গোলাম হোসাইন যিনি হজরত মাযহার থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি স্বপ্নে কোনো এক প্রিয় ব্যক্তিকে তাঁর পিতার হাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। লোকটি বলেছিলেন, তিনি আমার আশেপাশে থেকে কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকেন। আল্লামা সুয়্যূতী বর্ণিত পুস্তকে মৃতদের কবরে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সেখানে উল্লেখিত এক হাদিসে এসেছে– যে অবস্থায় তোমরা জীবন-যাপন করবে, সে অবস্থায়ই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আর যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে অবস্থায়ই পুনরুত্থিত করা হবে। এই হাদিসের বর্ণনা অনুসারে হতে পারে তিনিও কবরে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। মৃতদের এমতো তেলাওয়াত হয় তাঁদের দুনিয়ার জিন্দেগীর অভ্যাস এবং কবরের জীবনের অংশ। এ ব্যাপারে বান্দা মোকাল্লাফ হবে না। কেনোনা তকলীফের ভিত্তি হচ্ছে দুনিয়া। কোনো এক ওলী বলেছেন, বেহেশতে যদি নামাজ না থাকে, তাহলে সে বেহেশতের প্রয়োজন নেই। এখানে নামাজ ও মোনাজাতের লজ্জতকে আখেরাতের লজ্জতের চেয়ে অধিক মনে করে বেহেশতের মধ্যে ইবাদত কামনা করা হয়েছে। বেহেশতে যা কিছু কামনা করা হবে, তাই পাওয়া যাবে। আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির দৌলতও পাওয়া যাবে।

৩৪. শাহ মোহাম্মদ শফী

তিনি কোনো এক বুজুর্গ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৪৪] অতঃপর মির্জা মাযহারের সোহবত গ্রহণ করে উচ্চ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেন। তাজাল্লিয়ে জাতি পর্যন্ত অর্জন করে তাঁর সময় আল্লাহ্তায়ালার স্মরণে অতিবাহিত করেন।[৪৫]

৩৫. মোহাম্মদ ওয়াসেল

তিনি নকশ্বন্দিয়া তরিকার কোনো এক বুজুর্গের নিকটে জিকির ও মোরাকাবার তালীম গ্রহণ করেন এবং আঠারো বছর তাঁর খেদমতে থেকে খাতিরজমা অর্জন করেন। তাঁর মধ্যে মত্ততার হাল ছিলো। সারারাত আত্মহারা অবস্থায় মোরাকাবার মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর পীরের ইনতেকালের পর শায়েখ মির্জা মাযহার জানে জানানের খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে

তরিকার ফয়েজ লাভ করেন। এমনি অবস্থায় তাঁর ইনতেকাল হয়। তাঁকে খাজা মোহাম্মদ বাকী বিল্লাহ র. এর মাজার শরীফের পাশে দাফন করা হয়।

৩৬. মোহাম্মদ হোসাইন

মোহাম্মদ হোসাইন কয়েক বছর পর্যন্ত মির্জা মাযহারের সোহবতে থেকে খুব উন্নতি করেন এবং উত্তম হাল লাভ করেন। কলবের বেলায়েতের সায়ের কালে তিনি এই আশেকানা শেরটি পাঠ করতেন—

খঞ্জরে নাযতু তনহা না মোরা কেশতা ও বস
ইয়ালামুল্লাহকে দাহাঁ জুমলা কাতীল আস্ত কাতীল।

(তোমার সৌন্দর্যের খঞ্জর শুধু আমাকেই হত্যা করেনি, আল্লাহ্ জানেন সারা জাহানই হত্যাকৃত।)

এ জাতীয় শের পাঠকালে তাঁর অন্তর আনন্দে নেচে উঠতো এবং গভীর স্বাদ আস্বাদন করতেন। তাঁর সুলুকের ভ্রমণ কামালাতের নেসবত পর্যন্ত ছিলো। কলবের নেসবতে নিমজ্জিত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই মোজাদ্দেদী নেসবতের বর্ণবিহীনতা ও সূক্ষ্মতায় উৎফুল্ল হতেন না।

একদিন আমি (লেখক) তাঁর হালের প্রতি তাওয়াজ্জোহ দিলাম এবং তাঁকে প্রত্যেক মাকামের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, প্রত্যেক মাকামের হাল ও কাইফিয়ত পৃথক পৃথকভাবে আমি অবগত। কিন্তু কামালাতের নেসবত আমার অনুভূতির বাইরে। আমি তাঁকে বললাম, এই তরিকার ইমাম মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এই নেসবত হাসিল হওয়ার জন্য অজ্ঞতাকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন, যার অনুভূতি, প্রাপ্তি ও তাজাল্লিয়ে জাতির অনুভব থেকে অক্ষমতা অপরিহার্য।

মোহাম্মদ হোসাইন অল্প কিছু দিন ধৈর্য ধরে জোর করে নিজেকে শায়েখের সোহবতে নিয়োজিত রাখেন। তখন তাঁর লতীফায় বর্ণবিহীনতা শক্তিশালী হয় এবং এই মাকামে তাঁর পদক্ষেপ সুদৃঢ় হয়। তাঁর শেকায়েত (অনুযোগ) শুকরিয়ায় (কৃতজ্ঞতায়) পরিণত হয়। তারপর তরিকার তালীমের এজাযতপ্রাপ্ত হন তিনি এবং আপন জন্মভূমিতে ফিরে যান।

৩৭. শায়েখ গোলাম হোসাইন থানেশ্বরী

তিনি মির্জা মাযহার র. এর প্রিয় ও রেয়াজতকারী সাথীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পাঞ্জাবের বাটালা শহরে ফেকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শায়েখ গোলাম কাদের শাহ্ কাদেরী[৪৬] থেকে কাদেরিয়া তরিকা গ্রহণ করেন। অতঃপর হজরত

মোহাম্মদ মীরের[৪৭] সোহবতে থাকেন সাত বছর। হজরত শায়েখ মোহাম্মদ আবেদের খলীফা সুফী আব্দুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ গ্রহণ করেন। সাত বছর পর্যন্ত হাবছে দমের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচ হাজার বার নফী ইসবাতের জিকির করতেন তিনি। এরূপ অধিক জিকিরের মাধ্যমে খাতিরজমা অর্জন করে শায়েখ হজরত মাযহারের খেদমতে আসেন। এখানে কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর সোহবত গ্রহণ করেন এবং তরিকার স্তরসমূহের সুলুকে তাঁর উন্নততর তাওয়াজ্জোহের মাধ্যমে অগ্রগতি লাভ করেন। বাতেনে সায়ের ও সুলুক করে ইসমে জাহেরের তাজাল্লি অতিক্রম করে ইসমে বাতেনের তাজাল্লি পর্যন্ত পৌঁছান। ফলে হাবছে দম এবং বেলায়েতের কাইফিয়তের উত্তাপ থেকে তাঁর নফসের তাছীর খুব উত্তপ্ত, প্রেরণাদায়ক, উন্মুক্ত এবং খাঁটি হয়ে যায়। বাতেনী হালসমূহ জানার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাপ্তিসমূহ বিশুদ্ধ ছিলো। রামপুরে আফগানীরা তাঁর কাছ থেকে তরিকা গ্রহণ করেছিলো এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা উত্তাপ ও কলবের উষ্ণতা অর্জন করেছিলো।

আমি (লেখক) তাঁর সাথীগণকে তাঁর সোহবতের কাইফিয়ত ও বরকত লাভ করতে দেখেছি। ওই জামাতের মধ্যে আমি দু'জনকে বিশেষত্ব অর্জন করতে দেখেছি। আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাওয়ার নামই দরবেশী এবং এতেই সৌভাগ্য নিহিত, নিজের জীবনকে যেনো আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং এত্তেবায়ে রসুলের মধ্যে অতিবাহিত করা যায়। জীবনের মূল পাথেয় এটাই। তিনি হজ্বব্রত পালনে যান এবং আলহামদু লিল্লাহ! হারামাইন শরীফাইন জিয়ারত শেষে সহী সালামতের সাথে ফিরে আসেন।[৪৮]

৩৮. মৌলভী আব্দুল করীম

মির্জা মাযহার জানে জানান র. এর কামালাতের খ্যাতি শুনে জাহেরী এলেম শিক্ষা লাভের পর তিনি পূর্ব অঞ্চল[৪৮] থেকে এসে তাঁর খেদমতে হাজির হন এবং তাঁর কাছ থেকে নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা গ্রহণ করেন। কয়েক বছর পর্যন্ত সেখানে থেকে তিনি ফানা ও বাকা অর্জন করেন এবং তরিকার তালীম দেয়ার এজাযতপ্রাপ্ত হন। তালেবগণকে পথপ্রদর্শনের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় জন্মভূমিতে চলে যান। এমন সময় মৌলভী আব্দুল করীমের ইনতেকাল হয়ে যায়।

৩৯. মৌলভী আব্দুল হাকীম

মৌলভী আব্দুল হাকীম শায়েখ মির্জা মাযহারের নিকট তরিকা গ্রহণ করার পর নির্জনতা এবং গায়রুল্লাহ্‌কে পরিহার করার সাধনা শুরু করেন। শুধু আল্লাহ্‌র

স্মরণকেই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি দুপুর বেলায় সামান্য অরুচিকর খাবার গ্রহণ করতেন। তার পর আবার নির্জনে মোরাকাবায় ও জিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। সেজন্য তাঁর নেসবতে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো এবং প্রকাশিত হয়েছিলো অনেক কারামত। একবার এক আমীর হাদিয়াস্বরূপ পনেরো হাজার রুপিয়া তাঁর নিকটে এনে বললো, আমি আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে চাই। তিনি তাঁর নির্লিপ্ততার কারণে তা গ্রহণ করলেন না।

একবার এক চর্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাঁর ওজুর পানি দ্বারা ভেজা মাটি গায়ে মালিশ করে এবং তাঁর ওজুর পানিকে শেফা মনে করে পান করে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যায়। এ ধরনের কারামত প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ তাঁর কাছে আসতে থাকে। তাঁর সময়, আমল এবং হাল আমাদের পরবর্তীদের জন্য গর্বের বিষয়। তাঁর অন্তকরণ সর্বদাই গায়রুল্লাহ্ থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ্র স্মরণে ব্যাপৃত থাকতো। তিনি তাঁর দরজাকে সাধারণ লোকদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমতো সৌভাগ্যই আল্লাহ্র বন্ধুদের কাম্য।

৪০. নওয়াব এরশাদ খান

তিনি মির্জা মাযহারের খাস সাথীগণের একজন। উচ্চতর গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন তিনি। শায়েখের প্রতি মহব্বত ও নির্ভরতার দিক দিয়ে তাঁর শান ছিলো ঊর্ধ্বে, যা সকলের অর্জন করা সম্ভব হয় না। মহব্বত ও সোহবতের কারণে দুনিয়াবী কাজকর্মের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও এই খান্দানের নেসবত অর্জন করে তরিকার এজাযতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যথোপযুক্ত খেদমত আঞ্জাম দিতেন। যার ফলে খাস নৈকট্য এবং সঙ্গতা হাসিল হয়েছিলো তাঁর।[৫০] তাঁর সন্তান জফর আলী খানও[৫১] মির্জা মাযহারের কাছ থেকে তরিকার তালীম গ্রহণ করেন। বেশ কিছু দিন হলো পিতা এবং পুত্র উভয়েই এ নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছেন।[৫২]

৪১. গোলাম মোস্তফা খান

তিনি হজরত শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর সাথীগণের অন্যতম ছিলেন। পরে মির্জা মাযহারের নিকট রুজু হন এবং তাঁর উন্নততর তরবিয়তের বদৌলতে মোজাদ্দেদিয়া খান্দানের নেসবতের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হন। বাতেনের নেসবতের সুলুকে দায়েমী তাজাল্লিয়ে জাতি পর্যন্ত পৌঁছেন এবং তরিকার

তালীমের এজাযতপ্রাপ্ত হন। কয়েক ব্যক্তিকে তিনি ইয়াদে ইলাহীর কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

তিনি চারিত্রিক গুণাবলীতে পুত পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিকে তাজীম করার প্রাবল্য তাঁর মধ্যে ছিলো, যা কামালাতে ইলাহীর বিকাশস্থল। তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন কোনো অনুল্লেখ্য ব্যক্তিকেও তিনি তুই বা তুমি বলে সম্বোধন করতেন না। সকলের সাথে আদব সম্মান প্রদর্শন করতেন। নিজের চাকর কর্মচারীদেরকে বেতন দেয়ার কালে প্রাপ্য মজুরী থেকে বেশী প্রদান করতেন।

তিনি শায়েখ হজরত মির্জা মাযহারের প্রতি অত্যন্ত মহব্বত পোষণ করতেন। তাঁর প্রিয় কাজসমূহের খেদমত আঞ্জাম দিতেন। আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তাঁর কবুলিয়াত হাসিল হয়েছিলো। কেনোনা ফকীর দরবেশগণের খেদমতকারীরাই কেবল ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারে। নেককার লোকের জন্য হালাল মাল খুবই উত্তম– এই হাদিসের বাস্তবায়ন ছিলো তাঁর স্বভাব-চরিত্রে। গোলাম মোস্তফা খানের ইনতেকালের পর তাঁর শায়েখ মির্জা মাযহার তাঁর মাজারে তশরীফ নিয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ সেখানে মোরাকাবা করেন। বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি যদি জানতে পারতাম, আমার কবরও এরকম আনওয়ারে এলাহীতে পরিপূর্ণ থাকবে, তাহলে আজই তাঁর দরবারে খুশির বাদ্য বাজাতাম। তাঁর জন্য এমতো মাগফেরাত ও রহমত প্রকাশের কারণ তাঁর সুন্দর খুলুসিয়াত।

৪২. আখন্দ নূর মোহাম্মদ কান্দাহারী

তিনি এলমে দ্বীনে পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি আখন্দ তরিকা এ ফকীর (লেখক) থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ খান্দানের জিকিরের অনুশীলন করেছিলেন। এভাবে তিনি তরিকার তালীমের এজাযত লাভ করেছিলেন। তাঁর বুকের ভিতর ছিলো মহব্বতের দহন। অন্তর ছিলো অতি কোমল। শেষে তিনি শায়েখ মির্জা মাযহারের নিকটে আসেন এবং নকশ্বন্দিয়া তরিকায় দাখেল হন। কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর সোহবতে থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সুলুকের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যান এবং নূরানী নেসবত লাভ করেন। তারপর থেকে শুরু করেন নির্জন জীবন যাপন।

হজরত মাযহারের ওফাতের পর তিনি বলেন, মাযহারের প্রতিনিধিত্বের পদ এবং তরিকা প্রচারের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে।[৫৪] হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম এবং খাজা নকশ্বন্দ্ ওয়াইসিয়া পদ্ধতিতে আমাকে এই তরিকার তাজা নেসবত দান করেছেন। বাতেনী ফয়েজের দৌলত মোগল ঘরানা অর্থাৎ হজরত মির্জা মাযহার থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আফগান ঘরানায় (আখন্দ নূর মোহাম্মদ কান্দাহারী) চলে এসেছে এবং তালেবগণের হাল আলোকিত করছে। হজরত

মোহাম্মদ যুবায়ের এবং এই খান্দানের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সোহবত লাভ করেছিলেন এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, তাঁর নূর ও বরকত এতো বেশী ছিলো যেনো একটি শুকনো নহর যা নূরের আভায় উদ্ভাসিত।

একবার কতিপয় লোক তাঁর কাছে তরিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তাঁর সোহবতে অনেক ফয়েজ পাওয়া যায়। এজন্য তিনি বড় বড় অনেক কিছু দাবি করে থাকেন। তিনি বলেন, যে ফয়েজ ও মাকাম হজরত মাযহারের সোহবতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পরও জারী হয় না, তা আমার তাৎক্ষণিক তাওয়াজ্জোহের দ্বারা তালেবগণ সহজে অর্জন করে নিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তিনি মোজাদ্দেদিয়া তরিকা অনুসারে এলেম, আমল ও সময় সংরক্ষণ করতেন। কিন্তু হায়াত তাঁর সাথে আনুকূল্য প্রদর্শন করেনি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

৪৩. মোল্লা নাসিম

তিনি মির্জা মাযহারের একজন জলীলুল কদর খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর তাওয়াজ্জোহের বরকতে মোজাদ্দেদিয়া তরিকার বাতেনী সুলুকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাছাকাছি যান। মাকাম অর্জনের ক্ষেত্রে খেলাফত লাভের পূর্ণতা পর্যন্ত তিনি তাঁর তরবিয়ত করেন। তিনি কোনোরূপ বিরতি ছাড়াই এক বারে ওই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছে যান। বিশুদ্ধ হালের অধিকারী ছিলেন তিনি। প্রতি বছর নিজের জন্মভূমি থেকে শায়েখের খেদমতে আসতেন এবং তরিকার নূরসমূহ অর্জন করতেন। খুলুসিয়াত, মহব্বত এবং পীরের অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিলেন। তিনি তাঁর পীরের এজাযত ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। একবার তাঁর বমি হওয়ার উপক্রম হলো। তখন তিনি মুখ বন্ধ করে তাঁর খেদমতে এসে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে বমি করবো, না হয় করবো না। পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের কারণে আল্লাহ্র দরবারে মকবুল হয়েছিলেন তিনি। তালেবগণ তাঁর প্রতি ধাবিত হতে থাকে এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহের দ্বারা খাতিরজমা ও হুজুরী লাভ করে।

আমি (লেখক) এক নির্ভরযোগ্য লোক থেকে শুনেছি, তিনি একবার কোনো এক ব্যক্তিকে পূর্ণ জযবার সাথে তাওয়াজ্জোহ দিয়েছিলেন। লোকটি তার ভার সহ্য করতে না পেরে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করার পর মৃত্যুবরণ করে।

তাঁর বরকতময় সত্তা গনিমততুল্য ছিলো। এলেমের দরস ও তরিকার তালীমের মধ্যে তিনি তাঁর জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতেন।

৪৪. মোল্লা আব্দুর রাজ্জাক

তিনি এলমে ফেকাহ্ ও উসুলের উপর পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। শায়েখ মির্জা মাযহারের সোহবতে তিনি বিশুদ্ধ হালের অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের ধাপে উন্নতি করে কামালিয়ত লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি তরিকার তালীম দেয়ার এজাযত পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছিলেন জাহেরী ও বাতেনী এলেমের ফয়েজ বিতরণের কাজে।

৪৫. মোল্লা জলীল

মোল্লা জলীল মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত বাতেনী এলেমের নূর সংগ্রহ করেন। বাতেনী নেসবতে কামালাত পর্যন্ত পৌঁছে তরিকার তালীমের এজাযতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মাওলার স্মরণে আনন্দের সাথে তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। আল্লাহ্তায়ালা যাকে চান বাতেনী তরিকায় মশগুল করে দেন এবং জিকরে এলাহী দ্বারা তার দিল জিন্দা হয়ে যায়।

৪৬. মোল্লা আব্দুল্লাহ

তিনি আলেম, সাহিত্যিক ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। মির্জা মাযহার র. এর সোহবতের বরকতে ফানা-বাকা লাভ করেছিলেন। কিছুদিন পূর্বোল্লিখিত মোল্লা নূর মোহাম্মদের সোহবতও গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি জন্মস্থান রামপুরে চলে যান। অধিক জিকির ও মোরাকাবার ফলে তাঁর কলবের হালে দৃঢ়তা এসেছিলো। জন্মস্থানে চলে যাওয়ার পর সেখানে তাঁর আশপাশে তালেবদের ভিড় জমতে শুরু করে। তারা তাঁর তাওয়াজ্জোহে খাতিরজমা এবং হুজুরী অর্জন করতে থাকে।

তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর ভাই, যিনি তাঁর কাছ থেকে তরিকার তালীমের এজাযত লাভ করেছিলেন, তিনি জিকিরের হালকা সরগরম করেন। তারপর তাঁরও ইনতেকাল হয়ে যায়। তিনি একজনকে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। লোকজন তাঁর দিকে ধাবিত হতে থাকে।

৪৭. মোল্লা তাইমুর

মোল্লা তাইমুর মির্জা মাযহার জানে জানান শহীদের কাছে তরিকা গ্রহণ করে কলবের ফানার মাকাম পর্যন্ত পৌঁছেন। হুজুরী ও চৈতন্যের হালও অর্জিত হয়েছিলো তাঁর। তিনি মোল্লা নূর মোহাম্মদের সোহবতে ছিলেন। জন্মস্থান রামপুরে ফিরে গিয়ে কঠিন রেয়াজতের মধ্যে সময় কাটান। বাতেনের নেসবতের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, যার ফলে তাঁর নেসবতে সংযুক্ত হয় আস্বাদ, প্রেরণা এবং নিমজ্জন। তালেবগণের প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হন তিনি। অনেক

লোক তাঁর হাতে তওবা করেছিলো। কাফেরেরা তাঁর বাতেনী শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং তাঁর তাওয়াজ্জোহের ওসিলায় তাদের তরিকার শোগল হাসিল হয়েছিলো। রাফেজীরাও তাঁর সোহবতের জযবার তাছীরে আক্রান্ত হয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতে শামিল হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র জিকিরে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তালেবগণ মোল্লা নাসিমের সোহবতে খাতিরজমা এবং প্রশান্তি লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হতো এবং পৌঁছতে সক্ষম হতো নিরাপদ গন্তব্যে। আলহামদু লিল্লাহ!

উপরোল্লিখিত খলীফাবৃন্দ ছাড়াও হজরত মাযহারের আরও কিছু সাথী ছিলেন। যেমন মোল্লা আওলিয়া, মোল্লা ইব্রাহীম, শাহ্ লুৎফ, মোল্লা সাইফুদ্দীন, মোহাম্মদ খান, খাজা মোহাম্মদ ওমর, খাজা ইউনুস, শায়েখ কুতুবুদ্দীন, শায়েখ মোহাম্মদ আমীন, শায়েখ গোলাম হোসাইন এবং আরও অনেকে। তাঁরা আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যের মাকাম হাসিল করেছিলেন। তাঁরা সকলেই গায়রুল্লাহ্ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রহমাতুল্লাহি আলাইহিম জামীআ’।

তথ্যপঞ্জি

১ আল-কোরআন, তাহা ২০/১১০।

২ পুস্তিকার নাম ‘রেসালায়ে ফেকাহ দর জাওয়াহেরে আরবাআ’ মির্জা মাযহারের নির্দেশ মোতাবেক লেখা হয়েছিলো। তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপি মাওলানা যায়েদ আবুল হাসান ফারুকী, দিল্লী কুতুবখানায় রক্ষিত আছে।

৩ তার নাম তাফসীরে মাযহারী। ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। উর্দু তরজমা করেছে নদওয়াতুল মুসান্নেফীন, দিল্লী ১২ খণ্ডে।

৪ এ বিষয়ের উপর লিখিত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথির দু’টি পুস্তিকা আছে। (১) ‘রেসালায়ে আহকাম’ মোজাদ্দেদে আলফেসানি র. এর কথার উপর শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর আনিত অভিযোগ বিষয়ে লিখিত। তাঁর স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির একটি কপি আছে মাওলানা ফয়েজ সাহেবের নিকট (তাজাল্লিয়াতে রব্বানীঃ পৃষ্ঠা ১৯, হাশিয়া)। অপর একটি কপি আছে খানকায়ে আহমদিয়া সাঈদিয়াতে, ডেরাইসমাইল খান শহরে। (২) আরেকটি পুস্তিকা, দরজওয়াবে শুবহাতে বর কালামে ইমামে রব্বানী। এটিও মাওলানা যায়েদের কুতুবখানায় সুরক্ষিত।

৫ হজরত কাযী সাহেবের জাহেরী এলেমে পূর্ণতা ছিলো। তিনি সাত বছর বয়সে কোরআন মজীদ হেফজ করেছিলেন। পানিপথের আলেমগণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষ করে দিল্লীতে এসে শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর কাছে ফেকাহ্ ও হাদিসের পাঠ গ্রহণ করেন। কাযী সাহেবের ওফাত হয় ১লা রজব, ১২২৫ হিজরী মোতাবেক ২ আগষ্ট ১৮১০ খৃস্টাব্দ। তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে তাফসীরে মাযহারী, রেসালায়ে আহকাক, এরশাদুত্ত্বলেবীন, মালাবুদ্দা মিনহু এবং আসসায়ফূল মাসলুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬ হাদিসের মতন এরকম ‘আনতা মিন্নী বিমানযিলাতি হারুনা মিন মূসা ইল্লা আন্নাহু লা নাবিয়্যা বা’দী’ (তিরমিজী, মানীয়াবে-২০) ও মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ১/১৭৭।

৭ কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথির সময়ে পানিপথ নামক স্থানে মারাঠাদের প্রভাব ছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি যথাযথ ইনসাফের সাথে কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। হজরত কাযী সাহেব কখন কাযীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কোন কোন স্থানে তিনি দায়িত্ব পালন করেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। হজরত মাযহারের কোনো কোনো পত্র থেকে এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি পানিপথের কাযী ছিলেন। তাছাড়া আরও জানা যায় যে, নওয়াব নজীবুদৌল্লা এবং মোল্লা রহিম দাদ রুহিলার সৈন্যবাহিনীতেও কিছু সময় কর্মরত ছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক কুরাইশী, মাকাতিবে মির্জা মাযহার, পৃষ্ঠা ২২৫।

৮ আল-কোরআন, সুরা ইউনুস, ১০/৬২।

৯ কাযী সাহেবের দু'জন স্ত্রী ছিলেন, আজীবা খানম এবং রাবেয়া খানম। আজীবা খানম হজরত মাযহার থেকে ফয়েজ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন চার পুত্র আহমদুল্লাহ, সিবগাতুল্লাহ, দলীলুল্লাহ এবং হুজ্জাতুল্লাহ। কন্যা জন্মগ্রহণ করেন চার জন। মাকাতিব মির্জা মাযহার, পৃষ্ঠা ২৩১।

১০ আদীবা খানমের নামে হজরত মাযহারের চিঠি, মজমুআ কুরাইশি ১৩২/১৯২। হজরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি এবং হজরত মাযহারের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিলো। হজরত মাযহারের উন্মাদ স্ত্রীর দেখা শোনা করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিলো। তিনি অধিকাংশ সময় পানিপথেই থাকতেন। হজরত মাযহারের অনেক চিঠি তাঁর নামে লেখা। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি সে সব চিঠি একত্র করে খুব যত্ন করে রাখতেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহ ওই সকল চিঠি দর্শন ও পাঠ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন।

কাযী সাহেবের দুই ফরজন্দ মৌলভী আহমদুল্লাহ এবং মৌলভী দলীলুল্লাহকে কাযী সাহেবের মাজার শরীফের চার দেয়ালের বাইরে দাফন করা হয়েছে। মাওলানা আব্দুল হাই হাসানী ১৩১২ হিজরী পানিপথ সফরকালে ওই মাজারদ্বয় জিয়ারত করেছিলেন। দিল্লী ও ইতরাফে দিল্লী ১৯৫৮ খৃস্টাব্দ। পৃষ্ঠা ৮৪।

১১ মিয়া মোহাম্মদ মুরাদ জুতার ব্যবসা করতেন। বাশারাত পৃষ্ঠা ৭৬।

১২ মিয়া মোহাম্মদ মুরাদ হজরত মাযহারের খানকার খাস খাদেম ছিলেন। খানকার সুফীগণের খেদমতে তিনি কোনোরূপ ত্রুটি করতেন না। তাই হজরত মাযহার তাঁকে ইমামে সুফিয়া উপাধি দিয়েছিলেন। বাশারাত, পৃষ্ঠা ৭৫। এই কিতাবের ফার্সী সংকলনের হাশিয়ায় লেখা আছে, শাহ্ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভীর পুত্র শাহ্ রফিউদ্দীন শায়েখ মোহাম্মদ মুরাদ থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছেন। হাশিয়া-পৃষ্ঠা ৭৯।

১৩ ইবনে মাজা, পৃষ্ঠা ৩০৩।

১৪ একবার মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী হজরত মাযহারের পা টিপে দিচ্ছিলেন। তখন মীর আলীমুল্লাহ গঙ্গুহী সেখানে উপস্থিত হন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মীর সাহেবের বাড়ি ছিলো গঙ্গুহতে। মুফতি গোলাম সরওয়ার লাহোরী মৌলভী নাঈমুল্লাহর মুত্যুসন লিখেছেন ১২১১ হিজরী। খাজিনাতুল আসফিয়া ১/৬৮৯।

১৫ শায়েখ মুরাদুল্লাহ শুধু আমপারার তাফসীর লিখেছিলেন। মনে হয় তিনি হজরত মাযহারের কাছ থেকে পরে এর অনুমতি নিয়েছিলেন, যার এ অংশটুকু অনুমতির পূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছিলো। অবশিষ্টাংশ যথাযথভাবে পূর্ণ করা হয়নি। এই তাফসীরের নাম ছিলো 'খোদা কি নেয়ামত'। কিন্তু তাফসীরে মুরাদিয়া নামে তা প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তা পরিপূর্ণ হয়েছিলো ২৪মে মহররম ১১৮৫ হিজরী।

ওই তাফসীরের পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন—

হামদ ও শুকরিয়ার সেজদা পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী ওই পাক পরওয়ারদিগার, যিনি হিন্দী ভাষায় আমপারার তাফসীর সমাপ্ত করার তৌফিক এবং নাফরমান গোনাহ্‌গার মুরাদুল্লাহ আনসারী, সম্ভলী, কাদেরী, নকশ্‌বন্দী, হানাফীকে এই খেদমত করার তৌফিক দিয়ে তার অন্তরে তার কালাম বর্ণনা করার প্রেরণা যুগিয়েছেন। এই তাফসীরের নাম নির্ধারণ করা হয়েছে 'খোদা কি নেয়ামত'। এই তাফসীর সমাপ্ত হয়েছে ২৪শে মহররম তারিখ শুক্রবার ১১৮৪ হিজরীতে। শেষ হয়েছে ১১৮৫ হিজরীতে।

তাফসীরে মুরাদিয়া সর্বসময়ে সমাদৃত হয়েছিলো। বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে তাফসীর গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছিলো। দু'টি খণ্ডে ইসমাঈলী ছাপাখানা মুম্বাই ১২৭১ হিজরী এবং বরকতী ছাপাখানা কলিকাতা ১২৮০ হিজরীতে ছাপা হয়েছিলো। কলেবর ছিলো প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার।

ডঃ মোহাম্মদ আইয়ুব কাদেরী করাচী ইউনিভার্সিটিতে তাঁর পি,এইচ, ডি, এর বিষয় 'উর্দু নসর কে এরতেকা মে উলামা কা হিস্‌সা' প্রবন্ধে ১৯৭০ সালে পৃষ্ঠা ৭-১২ তে বিষয়টি আলোকপাত করেছেন।

১৬ শাহ্‌ মুরাদুল্লাহর সম্পর্ক ছিলো সম্ভলের সাথে। একবার কোনো এক উপলক্ষে তিনি বাংলায় গিয়েছিলেন। তখন সেখানকার হাজার হাজার লোক তাঁর কাছ থেকে তরিকার তালীম গ্রহণ করেছিলো এবং সেখানে তাঁর অনেক ফয়েজ জারী হয়েছিলো। সম্ভলেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। বাশারাত, পৃষ্ঠা ১৯৯।

১৭ হাফেজ মোহাম্মদ মহসিন শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভীর দৌহিত্র ছিলেন। মামুলাত, পৃষ্ঠা ১৮।

১৮ মৌলভী নাঈম লিখেছেন, শায়েখ গোলাম হাসান হজরত মাযহারের গৃহে লালিত পালিত ও তালিম তরবিয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হজরত মাযহারের সঙ্গে তাঁর অধিক সোহবত ছিলো বলে তিনি তাঁর মেজায সম্পর্কে এতোটুকু অবগত ছিলেন যে, তাঁর নাজুক মেজাজের খেলাফ কোনো রূপ আচরণ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেতো না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে শান্তিতে রাখুন এবং তাঁর তিরোধানের দাগ আমার অন্তরে স্পর্শ না করুক। এ রকম দোয়া শায়েখ গোলাম হাসানও করতেন যে, হজরত মাযহারের তিরোধানের দাগ আমার অন্তকরণ স্পর্শ না করুক। বাস্তবে সে রকমই হয়েছিলো। তাঁর এবং হজরত মাযহারের ওফাত এমনভাবে হয়েছিলো যে, কেউ কারও ইনতেকালের সংবাদ পাননি। বাশারাতঃ পৃষ্ঠা ২০২।

১৯ বিরুন তুর্কমান দরওয়াজা, দিল্লীর মসজিদের আঙ্গিনায় দাফন করা হয়েছে। নাওয়ায়েহ্‌ পৃষ্ঠা ১৯১।

২০ খালীক আনজাম মির্জা মাযহারের মকতুব সংকলন, মকতুব নং ৩০ পৃষ্ঠা ১৩২ এ মির্জা সাহেব বলেছেন, মোহাম্মদ মুনীরের পুত্র ছিলো। কিন্তু কোনো খলীফা ছিলো না। এ জন্য তাঁর মুরিদানের তরবিয়াত ও দেখাশোনা করার দায়িত্ব এই ফকীরের উপর পড়েছিলো।

২১ তাঁর বাসস্থান ছিলো থানেশ্বর। মৌলভী নাঈমুল্লাহ তাঁর নামের সাথে থানেশ্বরী লিখেছেন। বাশারাত পৃষ্ঠা ১৯২। শিখেরা যখন থানেশ্বরের কেল্লা দখল করে নেয়, তখন তিনি থানেশ্বর থেকে বেরিয়ে তার আশপাশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। হজরত মাযহার লিখেছেন, তখন অন্তরে এক শক্ত আঘাত লেগেছিলো। গত মাসে শিখ কাফেরেরা থানেশ্বর দুর্গ দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে ধ্বংস কাণ্ড ঘটিয়েছে। মৌলভী কলন্দর বক্স সেখান থেকে বিবি বাচ্চাসহ জান বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। সেখানে এক বিস্ময়কর ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন। তার কোনো পাথেয় সামগ্রী নেই। এমতাবস্থায় থানেশ্বরের আশপাশে অবস্থান করছে এবং আমার

নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। এমতো বিপদ ছাড়া আরও লজ্জার বিষয় হচ্ছে, আমি তাঁকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। কারণ অক্ষমতা। আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে সহায়তা করুন। খালীকে আনজাম মির্জা মাযহারের পত্রাবলী পৃষ্ঠা ১৩৪।

২২ তাঁর নামেরই আরেকজন মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি হজরত হাজী মোহাম্মদ আফজলের কুতুবখানার নাজেম ছিলেন। তিনি একাধারে ক্বারী, হাফেজ, আলেম, ফাজেল, আরেফ, কামালিয়ত অর্জনকারী এবং হাজী মোহাম্মদ আফজল শিয়ালকুটির কুতুবখানার মুতাওয়াল্লি ছিলেন। তিনি শায়েখুল হাদিস ছিলেন এবং মির্জা মাযহারের এজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। বাশারাত পৃষ্ঠা ১৯৬।

বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত 'বাশারাত' একটি খণ্ডে ভুলবশতঃ তাঁর নাম লেখা হয়েছে সাইয়্যেদ আলীমুল্লাহ। অপর খণ্ডে তার নাম পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে মীর সাইয়্যেদ নাঈমুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৩২, মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী তাঁর নামের সঙ্গে গেলাওয়াটি যুক্ত করেছেন।

২৩ আল কোরআন, সুরা আলহাদীদ ৫৭/৪।

২৪ অর্থাৎ উক্ত মালের উপর এতোটুকু ভরসা করা যাবে না যে, তাকে স্থায়ী নির্দিষ্ট রুজি মনে করা শুরু করে দেয়। বরং এটি একটি সাময়িক সাহায্য মনে করতে হবে। তাহলে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হবে না।

২৫ 'বাশারাতে মাযহারিয়া'তে মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীর ওফাত বর্ষ ১১৯৯ হিঃ লেখা আছে। স্বীয় বাসস্থান সম্ভলেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তিনি হজরত মাযহারের প্রশংসায় অনেক চতুর্পদী রচনা করেছেন। 'নুযহাতুল খাওয়াতের' এর লেখক তাঁর ওফাত বর্ষ হিজরী তেরোশ' শতাব্দী বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে তা সঠিক নয়।

২৬ মীর আব্দুল বাকী কয়েকটি পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'মাআলুল কামাল' নামক একটি পুস্তক খানকায়ে মোল্লা নাসিমের কুতুবখানায় আমার হস্তগত হয়। তার একটি অনুচ্ছেদে তিনি তাঁর নিজের জীবনী এভাবে ব্যক্ত করেছেন– আমি আমার যৌবনের প্রারম্ভে হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীর আওলাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির কাছ থেকে তরিকার আমল ওজিফা শিখি। তারপর একবার অকস্মাৎ কেল্লায়ে ফিরোজীতে হজরত মাযহারের সাথে আমার মোলাকাত ঘটে। কিছুদিন পর হজরতকে দিল্লীর শাহজাহানী জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে দেখি। হজরত তাঁর খানকার দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি তাঁর কাছে তরিকা গ্রহণের আবেদন করলাম। তিনি মোরাকাবা করার পর আমার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন আমার বয়স ছিলো ৩৪ বা ৩৫ বছর। তারপর আমি হজরতের খানকায় মুকীম হয়ে গেলাম। পরে তিনি আমাকে হেদায়েতের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। হজরত যখন পানিপথ অথবা সম্ভলে যেতেন, তখন খানকায় অবস্থানকারী মুরিদগণের খেদমতের দায়িত্ব আমার উপর সোপর্দ করতেন। অবশেষে আমি হজরতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আকবরাবাদের দিকে চলে গেলাম। হজরতের সঙ্গে এই ছিলো আমার শেষ মোলাকাত। কেনোনা এলাহাবাদে থাকা অবস্থায় আমি হজরতের শাহাদতের সংবাদ অবগত হই। আমি যখন দিল্লীতে পৌঁছি তখন দাফনের প্রক্রিয়া চলছিলো।

২৭ খলীফা মোহাম্মদ জামীল বশারাতে মাযহারিয়া ও মামুলাতে মাযহারিয়া গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচীর উপর এহসানকারী ছিলেন। তাঁর অনেক ইহসানের কথা তিনি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো শায়েখ মোহাম্মদ রফী। যিনি হজরত মাযহারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। খলীফা মোহাম্মদ জামীল হজরতের জীবদ্দশায় দিল্লিতে ইনতেকাল করেন। তখন মৌলভী নাইমুল্লাহ বাহরায়েচী সেখানে ছিলেন।

২৮ হজরত আবদুল আহাদ ওয়াহদাতের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানির সঙ্গে এভাবে মিলিত হয়েছে– শায়েখ মোহাম্মদী ওরফে শাহ ভেক ইবনে শায়েখ মোহাম্মদ যকী, ইবনে শায়েখ আবু হানীফ, ইবনে শায়েখ আব্দুল আহাদ ওয়াহদাত ইবনে হজরত খাজা মোহাম্মদ সাঈদ, ইবনে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.। শাহ্ ভেকের ছিলো এক পুত্র এবং ছয় কন্যা। পুত্রের নাম ছিলো শাহ্ পীর।

২৯ আল কোরআন সূরা আন নূর ২৪/৩৭।

৩০ তাঁর সোহবতের খাস তাছীর ছিলো। তাঁর মুরিদগণের মধ্যে হাফেজ মিয়া দৃঢ়তাধারী ছিলেন। মীর আলী আসগর শিয়া মতবাদ খণ্ডন করে একটি সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় মকতুব হজরত মাযহারের নিকট লিখেছিলেন। যখন এই মকতুব হজরতের নিকটে পৌঁছে, তখন মৌলভী নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হজরত মাযহার মকতুবটি পাঠ করে খুব প্রশংসা করেন। তাঁর দু' ভাই মাশুরী এবং মীরজকনও হজরত মাযহারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশের অধিকাংশ নারী পুরুষ তরিকাভুক্ত ছিলেন।

৩১ আল কোরআন, সুরা আনফাল ৮/৪৫।

৩২ মৌলভী কুতুবুদ্দীন ১২০৫ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৩৩ হজরত মাযহারের কাছে বায়াত ও তাঁর থেকে খেলাফত লাভের পর তাঁর অবস্থানস্থল ছিলো মসজিদে শায়েখ মাহমুদ কলন্দরের নিকটস্থ খানকায়ে পীর মোহাম্মদ লৌখনভীতে। নুযহাতুল খাওয়াতের ৬/২১৬।

৩৪ ওই পুস্তিকার নাম 'কালিমাতুলহক', যা হজরত মাযহারের নির্দেশে রচিত হয়। রচনার সন ছিলো ১১৮৪ হিজরী।

'কালিমাতুল হক' এর তিনটি খণ্ড সম্পর্কে সে সময় আমি অবগত হয়েছিলাম। তন্মধ্যে দু'টি ছিলো কুতুবখানা বানকীপুর, পাটনা। আর একটি ছিলো কুতুবখানা আহমদিয়া সাঈদিয়া, মুসাযাই শরীফ, ডেরা ইসমাইল খাঁ। 'কালিমাতুল হক' পুস্তিকার বিষয়বস্তু পাঠের পর বুঝা যায় যে, এটি লেখা হয়েছিলো শাহ ওলিউল্লাহ র. লিখিত ওয়াহদাতুল ওজুদ ওয়াশ্‌শুহুদ এর জবাবে। হজরত শাহ রফিউদ্দিন মোহাদ্দেছে দেহলভী 'কালিমাতুল হক' পুস্তিকাটি 'দেমগুল বাতেল' নামে লিখেছেন, যা নুসরতুল উলুম প্রকাশনী, গোজরান ওয়ালা থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করা হয়েছিলো। 'ওয়াহদাতুল ওজুদ ওয়াশ্‌শুহুদ' এর মাসআলাটি নিয়ে সে যুগের লেখকগণ বেশ জটিলতা সৃষ্টি করেছিলেন। সে কারণেই সে কালের দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী ও মির্জা মাযহার এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করেছিলেন। হজরত মাযহার র. তাঁর মকতুবসমূহের বিষয়ের উপর দলিল সহকারে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি শায়েখ কমরুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীর মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তিকা রচনা করিয়েছিলেন। পুস্তকটির নাম ছিলো মাযহারুন্‌নুর (আরবী)। পরে এই পুস্তিকার ব্যাখ্যা 'আলমাযাহের' নামে রচনা করেছিলেন শায়েখ কামারুদ্দীন আওরঙ্গাবাদীর পুত্র সাইয়্যেদ নূরুল হুদা, আব্দুল হাই হাসানী কৃত 'আছ্‌কাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ'। উর্দু তরজমা, আজমগড়, পৃষ্ঠা ২৭০।

৩৫ মৌলভী গোলাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে নজমুদ্দীন তাঁর সময়ের বড় আলেম ছিলেন। জাহেরী এলেমের তিনি একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সন্দিলায় গিয়ে মাদ্রাসায়ে মনসুরিয়ায় মাওলানা বাবুল্লাহ জৌনপুরীর কাছে প্রচলিত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তালেবে এলেমদেরকে এলমে দীনের আলো বিতরণ করেন। তিনি হাফেজে কোরআনও ছিলেন। 'নুযহাতুল খাওয়াতের' ২/২১৫। মৌলভী গোলাম ইয়াহইয়ার মৃত্যু সন নিয়ে লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নুযহাতুল

খাওয়াতের রচয়িতার মতে ১১৮০ হিজরী আর মৌলভী রহমান আলীর মতে ১১২৮ হিজরী, পৃষ্ঠা ৩৭১।

তবে সমকালীন লেখক নাঈমুল্লাহ বাহরায়েচী লিখেছেন, ১১৮৬ হিজরীতে তকিয়াশাহ পীর মোহাম্মদ লখনৌভীতে দাফন করা হয়েছে। 'বাশারাত' পৃষ্ঠা ১৯৪, 'নুযহাতুল খাওয়াতের' ৬/২১৬।

৩৬ মৌলভী গোলাম মহিউদ্দীনের সম্পর্ক ছিলো দকন এলাকার সাথে। বাশারাতে মাযহারিয়া গ্রন্থকার লিখেছেন, তিনি ফয়েজ লাভের জন্য দকন এলাকা থেকে বেরিয়েছিলেন। তারপর হজরত মাযহার থেকে ফয়েজ ও খেরকা লাভের পর আপন মায়ের জিয়ারতের জন্য আরকাট যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় থাকা অবস্থায়ই তাঁর মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন (পৃষ্ঠা ১৯৭)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর পিতা মাতা আরকাটেই বসবাস করতেন।

৩৭ মোল্লা বাবুল্লাহ তাঁর সময়ের স্বনামধন্য আলেম ছিলেন। তাঁর আসল বাসস্থান ছিলো আজমগড় জেলার অন্তর্গত মনোয়ারপুর শামসপুর এলাকায়। তাঁর উস্তাদ ছিলেন মাওলানা আহমদুল্লাহ সান্দেলভী, যিনি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। তিনি মহল্লা খাজেগী টোলা, জৌনপুরে মদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করে পাঠদানে রত হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে জানা যায় না। উপরোক্ত মহল্লায় হাকিম আব্দুল গফুর মসজিদ সংলগ্ন স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৌলভী গোলাম ইয়াহ্ইয়া বাহারী তাঁর শাগরিদ ছিলেন। ইকবাল আহমদ কৃত 'তারিখে সিরাজে হিন্দ' জৌনপুর, প্রকাশকাল ১৯৬৩। পৃষ্ঠা ৭৪৪।

৩৮ নাইমুল্লাহ বাহরায়েচী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, নাঈমুল্লাহ ইবনে গোলাম কুতুবুদ্দীন হজরত খাজা এমাদ খালিজের অন্যতম আওলাদ। তিনি জেহাদের উদ্দেশ্যে মাসউদ সালার গাজীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং এখানে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর আওলাদগণ ভারতের বিভিন্ন অংশে বসতিস্থাপন করেছেন। এই খান্দান মূলতঃ হজরত আলী রা. এর বংশধর এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুলতানদের তরফ থেকে মালিক খেতাব পেয়েছিলেন। তাই মালিক তাঁদের নামের অংশ হয়ে গিয়েছে। এই খান্দানের ব্যক্তিগণ বংশানুক্রমে আলেম ছিলেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহর জন্ম হয় ১১৫৩ হিজরীতে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিলো সাত বছর বয়সে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে মোহাম্মদ রৌশন বাহরায়েচীর হাওলা করা হয়েছিলো। এক বছরে তিনি কোরআন মজীদ খতম করেছিলেন। ফার্সীভাষা শেখার পর আরবী পড়ার আগ্রহ জাগে এবং ১১৫১ হিজরীতে হাজী ফতেহ আলীর সঙ্গে লখনৌতে চলে যান। এখানে এসে প্রখ্যাত আলেম মৌলভী খলিলের নিকট ছরফ ও নাহু শিক্ষা করেন। অতঃপর শাহজাহানপুর ও বেরেলী ইত্যাদি এলাকা সফর করেন। বেরেলীতে দু'বছর অবস্থান করেন এবং মৌলভী শিহাবুদ্দীনের কাছ থেকে বিভিন্ন এলেম শিখেন। তারপর বিভিন্ন উস্তাদ যেমন মৌলভী বরকত এলাহাবাদী এবং মৌলভী সালেম প্রমুখ আলেমগণের খেদমতে থাকার পর প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১১৭৭ হিজরীতে লখনৌতে এসে তকিয়া শাহ মোহাম্মদ আকেল নামক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে আসার পর মৌলভী মোহাম্মদ, মৌলভী মাহবুবী, মুফতী আব্দুর রব লখনৌভী, শায়েখুল হাদিস হাজী আহমদ, যিনি শাহ ওলিউল্লাহর শাগরেদ ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১১৮৬ হিজরীতে আল্লাহ প্রেমের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়েন। সে সময় মির্জা মাযহারের খলীফা শায়েখ মোহাম্মদ জামীল লখনৌ গিয়েছিলেন। মৌলভী নাঈমুল্লাহ তাঁর কাছ থেকে কলবী জিকির এবং মোজাদ্দেদিয়া তরিকার জযবা হাসিল করেন। অতঃপর দিল্লীতে এসে হজরত মাযহার র. এর খেদমতে অবস্থান করতে থাকেন। দু'মাস পর তিনি সেখান থেকে বিদায় নেন। তারপর ১১৮৯ হিজরীতে পুনরায়

খেদমতে হাজির হয়ে চার বছর পর্যন্ত হজরত মাযহারের খানকায় অবস্থান করেন। এ সময় সাধারণ এজাযতপ্রাপ্ত হয়ে বাহরায়েচ চলে যান এবং সেখানে গিয়ে বিবাহ করেন। ১২০৫ হিজরীতে হজরত মাযহারের মাজার নির্মাণ করার জন্য দিল্লী আসেন। তারপর আবার ১২০৮ হিজরীতে চতুর্থবার দিল্লী আসেন। একবার পূর্ণ এক বছর পানিপথে হজরত মাযহারের খেদমতে ছিলেন। তিনি চল্লিশ দিন মৌলভী ছানাউল্লাহ পানিপথির খেদমতেও ছিলেন।

৩৯ মৌলভী কেরামতুল্লাহ মৌলভী নাঈমুল্লাহর পুত্র ছিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে 'নেসবতে উখুওয়াত কবুল ফরজন্দী তরিকত' লেখা হয়েছে। মামুলাত পৃষ্ঠা ৫, আনফাসুল আকাবের পৃষ্ঠা ২। মৌলভী বাহরায়েচীর এক ফরজন্দ গোলাম আহমদ বাকীও ছিলেন (রুকআতে কেরামত সাআদত, পৃষ্ঠা ২) কেরামতুল্লাহর সাথে নূর মোহাম্মদকেও তিনি নিজের পুত্র বলেছেন, (মামুলাত, পৃষ্ঠা ৫)। মৌলভী নাঈমুল্লাহর এক জামাতাও ছিলেন। তাঁর নাম বাশারাতুল্লাহ। তাঁর এক পুত্র মৌলভী আবুল হাসান তাঁর মাজারের মোতাওয়াল্লি ছিলেন। (আয়েনায়ে উধ, পৃষ্ঠা ১৩৫)। মৌলভী নাঈমুল্লাহ তাঁর বন্ধুবর্গের মধ্যে মৌলভী বাহাউদ্দীনের নাম উল্লেখ করেছেন (বাশারাত, পৃষ্ঠা ১৮৭)।

৪০ মৌলভী নাঈমুল্লাহর খলীফাগণের মধ্যে একজন ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ আহসান। কলিকাতার সন্নিকটে আটক নামক স্থানে বসবাস করতেন তিনি। আরেকজন ছিলেন মৌলভী মুরাদুল্লাহ ফারুকী থানেশ্বরী। তাঁর পিতার নাম ছিলো মৌলভী কলন্দর বক্স। তিনি হজরত মাযহারের খলীফা ছিলেন। মৌলভী মুরাদুল্লাহ্ বাল্যকালে তাঁর পিতার সঙ্গে হজরত মাযহারের হালকায় গিয়েছিলেন। তাঁর অল্প বয়স থাকা অবস্থায় হজরত মাযহার শাহাদাতবরণ করেন এবং থানেশ্বর শিখদের দখলে চলে যায়। তখন মৌলভী মুরাদুল্লাহ মৌলভী নাঈমুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং তাঁর খলীফা ও প্রতিনিধি হন। তাছাড়াও খলীফা ছিলেন মৌলভী গোলাম রসুল কানপুরী এবং মৌলভী আবুল হাসান নাসিরাবাদী।

মৌলভী নাইমূল্লাহ বাহরায়েচী ১২১৮ হিজরীতে ইনতেকাল করেন। তাঁর মাজার শরীফ বাহরায়েচ লোকালয়ে। মৌলভী নাঈমুল্লাহ হজরত মাযহারের প্রথম সারির জীবনী লেখকগণের অন্যতম ছিলেন। হজরত মাযহার সম্পর্কে যতগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমার হস্তগত হয়েছে, তা তাঁরই রচনাবলীর মাধ্যমে। এ সম্পর্কিত তাঁর রচনাবলী হচ্ছে 'বাশারাতে মাযহারিয়া', মামুলাতে মাযহারিয়া', 'রেসালা দর আহওয়ালেখোদ', 'মজমুআ মকতুবাত হজরত মাযহার, 'আনফাসুল আকাবের', 'নূরুয যামায়ের' ও 'রেসালায়ে শামসিয়া মাযহারিয়া' ইত্যাদি। তাছাড়াও তাঁর রচিত কিতাবের মধ্যে হাশিয়া মীর যাহেদ এবং হাশিয়া মোল্লা জালাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪১ তাঁর আবাসস্থল ছিলো মুর্শিদাবাদ। তাঁর পিতামহগণ বাংলায় এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন। মৌলভী কলীমুল্লাহর বংশধর মৌলভী আব্দুর রহমান সিলেটী 'সাইফুলআবরার' কিতাবের পরিশিষ্টে তাঁর পিতামহগণের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখেছেন, মৌলভী কলীমুল্লাহ দিল্লীতে ১৮ বছর বসবাস করেছিলেন। পৃষ্ঠা ৭৬।

৪২ মৌলভী কলীমুল্লাহ বাঙ্গালীর নাম এই কিতাবে এবং 'বাশারাতে মাযহারিয়া'য় কলীমুল্লাহ লেখা হয়েছে। কিন্তু নামটিতে ছাপার ভুল আছে বলে মনে হয়। কেনোনা নির্ভরযোগ্য লেখাসমূহে তাঁর নাম পাওয়া গেছে মোহাম্মদ কলীম। তাঁর বংশধর মৌলভী আব্দুর রহমান সিলেটী 'সাইফুল আবরার' কিতাবে তাঁর নাম লিখেছেন মোহাম্মদ কলীম (পৃষ্ঠা ৬৬)। হজরত মাযহারের এক মকতুবেও (মকতুব নং ৫৩, মজমুআ খালীকে আনজাম পৃষ্ঠা ১৬৩) তাঁর নাম মোহাম্মদ কলীম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হজরত মাযহারের মকতুব (মজমুআ কুরাইশি) এর মধ্য থেকে কয়েকটি মকতুবেও মোহাম্মদ কলীম উল্লেখ

করা হয়েছে। ড. গোলাম মোস্তফা খান সাহেবের ধারণা যে, এসব মকতুব মৌলভী মোহাম্মদ কলীমের দিল্লীতে অবস্থানকালে লিখিত (লাওয়ায়েহ্ পৃষ্ঠা ১২০)। ৫৩ নং মকতুবে হজরত মাযহার র. তাঁকে লিখেছিলেন, এ সময় এই এলাকার লোকদের অবস্থা খুবই খারাপ। এই মকতুব দ্বারা এ বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, মৌলভী মোহাম্মদ কলীমের বাংলার নবাব কাসেম আলী খানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো।

তাঁর বংশধর মৌলভী আব্দুর রহমান একজন আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সুন্দর আকীদার অধিকারী ছিলেন। 'সাইফুল আবরার আল মাসলুল আলাল ফুজ্জার' কিতাবের লেখক ছিলেন। তিনি ওই কিতাবের পরিশিষ্টে তাঁর পিতামহগণের অবস্থা যা বর্ণনা করেছেন, তার সারসংক্ষেপ এ রকম– পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ হজরত ওমর ফারুক রা. এর সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁর পিতামহগণের মধ্যে আব্দুর রহীম প্রথম বুজুর্গ ব্যক্তি, যিনি মদীনা মোনাওয়ারা থেকে বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। তারপর বাগদাদ থেকে হিরাতে চলে যান। তাঁর পেশা ছিলো শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা দান। তাঁর পিতামহগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুল করীম। তাঁকে হিরাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। তিনি সেখান থেকে বাংলায় এসে বসবাস করেন। এখানেই তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং এক পুত্র সন্তান মোহাম্মদ সালেহের পিতা হয়েছিলেন। তারপর তিনি স্ত্রী-পুত্রসহ আবার হিরাতে চলে যান। কিছুদিন পর আবার বাংলায় ফিরে আসেন। মোহাম্মদ সালেহের পুত্র ছিলেন মোল্লা মোহাম্মদ রফী। আর তাঁরই সাহেবজাদা ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ কলীম। তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ মোহাম্মদ শাহের উস্তাদ ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র ছিলো। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ ইসরাইল মুর্শিদাবাদের প্রধান কাযী ছিলেন। তারপর কলিকাতায় প্রধান কাযী নিযুক্ত হয়েছিলেন। মধ্যম পুত্র আবু সাঈদ মোহাম্মদ মাহমুদ। নবাব মাহমুদ খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো তাঁর। কনিষ্ঠ পুত্র আহমদ ছিলেন ঢাকার মুফতী। 'সাইফুল আবরার', প্রকাশনা-ইস্তাম্বুল তুর্কী। প্রকাশ কাল ১৯৭৭ ইং। পৃষ্ঠা ৬৫।

৪৩ শরহুস্‌সুদূর, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর রচনা। কয়েকবার ছাপা হয়েছে।

৪৪ মৌলভী নাঈমুল্লাহ্ বাহরায়েচী লিখেছেন, হজরত মাযহারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে শাহ্ মোহম্মদ শফি শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছিলেন। বাশারাত পৃষ্ঠা ১-২০।

৪৫ হজরত মাযহারের জীবদ্দশায়ই তিনি ইনতেকাল করেছিলেন। দিল্লীতে শাহ্ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেছে দেহলভী র. এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর আলোচনা স্বয়ং মির্জা মাযহার করেছেন। মকতুব নং ৩৩ 'কালিমাতে তাইয়্যেবাত' 'বাশারাতে মাযহারিয়া' পৃষ্ঠা ১-২০১।

৪৬ হজরত গোলাম কাদের শাহ্ বাটালভী ইবনে হজরত শায়েখ মোহম্মদ ফাজেলুদ্দীন বাটালভী হিজরী বারো শতাব্দীতে পাঞ্জাবের নামকরা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ইনতেকাল হয়েছিলো ১১৭৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ। তিনি তাঁর পিতার প্রতিনিধি হয়েছিলেন। পাঞ্জাবের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁর কাছ থেকে জাহেরী ও বাতেনী ফয়েজ হাসিল করেছিলেন। বেশ কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন তিনি। তন্মধ্যে 'সফাউল মিরআত', 'নেহায়াতুল কামাল' এবং 'রমযুল এশক' অধিকতর বিখ্যাত। 'মসনবীয়ে রমযুল এশক' উর্দু ভাষায় লিখিত, যা উর্দু সাহিত্যের প্রাচীন নমুনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'পাঞ্জাব মে উর্দু- মাহমুদ শিরানী কৃত। পৃষ্ঠা ৩২৩-৩২৮।

৪৭ সুফী মোহাম্মদ মীরও শায়েখ মোহাম্মদ আবেদ সুনামীর খলীফা ছিলেন।

৪৮ মৌলভী গোলা হোসাইন সম্পর্কে হজরত মাযহার গোলাম আসকারী খানের নিকট লিখেছিলেন– মৌলভী গোলাম হোসাইন নামের সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তি যিনি জিকিরের হালকার ভাই এবং পুরানো বন্ধু, থানা প্রদেশে বাস করেন। ফারুকী বংশ, মযার্দাবান, ভদ্র, নজীবুদ্দৌলার স্থানে কর্মরত আছেন। ইতোপূর্বে তিনি তাঁর কাওমের মধ্যে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনো পুত্র জন্ম নেয়নি। তাছাড়া স্ত্রীর আচরণও পছন্দ হয়নি। বরং দেশে বাস করাতেও তিনি খুশি হতে পারেননি। এ ফকীরের সোহবত তাঁর পছন্দ হয়েছে। তাই তিনি দিল্লীতে অবস্থান করছেন। দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করছেন। 'মজমুআ খালীকে আঞ্জাম' ৮৯।

৪৯ মৌলভী নাঈমুল্লাহ বলেছিলেন, তাঁর বাসস্থান বর্ধমানে। 'বাশারাত' পৃষ্ঠা ১৮৫।

৫০ হজরত মাযহার এবং তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ সম্পর্ক ছিলো। সে কারণেই হজরত মাযহার কখনও কখনও সম্ভলে যেতেন এবং তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করতেন। 'বাশারাত', পৃষ্ঠা ২০২।

৫১ নওয়াব এরশাদ খানের ফরজন্দ জফর আলী খানও হজরত মাযহারের নিকট বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। বরং তিনি তাঁর এজাযতপ্রাপ্ত খলীফা ছিলেন এবং হজরত মাযহার র.এর প্রতিপালিত ছিলেন। 'বাশারাত', পৃষ্ঠা ২০৩)।

নওয়াব এরশাদ খানের মৃত্যুর পর বসুলির সরদারগণ জফর আলী খানের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক রেখেছিলো। 'মজমুআ খালীকে আঞ্জাম', পৃষ্ঠা ১২৫। হজরত মাযহার মৌলভী ছানাউল্লাহ সম্ভলীকে লিখেন– যা কিছু আপনি জফর আলী খান সম্পর্কে লিখেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। তাঁর এ সকল গুণাবলী আমাকে তাঁর ভালোবাসায় বন্দী করেছে। অন্যথায় আমি যে রকম স্বাধীন ব্যক্তি, যার নিজেরই কোনো চিন্তা নেই, তার আবার অন্যের প্রয়োজন কী? পৃথিবীতে আমার নিকট তাঁর চাইতে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। প্রকৃত কথা, তাঁর পিতা-মাতার স্ব-স্ব স্থানে তাদের দায়িত্ব পালন করা ব্যতীত তার জন্য আমিই সব কিছু। সে আমার প্রতি মুরিদ, সন্তান এবং গোলাম সুলভ আদব প্রদর্শন করে থাকে। আপনি তাকে বলবেন, প্রতিদিন সকালে সে যেনো আমার দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ হয়ে বসে। (পৃষ্ঠা ১৩২)। সে এমন এক অমূল্য রত্ন, যার কোনো তুলনা হয় না। এ ফকীর অকারণে তার আশেক হয়নি (পৃষ্ঠা ১৩৫)। হাফেজ রহমত খান তাঁকে তাঁর সাথে রাখার এবং রোজগার দেয়ার ওয়াদা করেছেন। সেজন্য জফর আলী পিলিভেত যাওয়ার ইচ্ছা করেছে। সে তার নিকটাত্মীয়দের সাথে ঝগড়া থাকার কারণে শুজাউদ্দৌলার সেনাবাহিনীতে চলে গেছে। 'মজমুআ কুরাইশী', পৃষ্ঠা ১০৫)।

৫২ মৌলভী নাঈমুল্লাহ লিখেছেন, নওয়াব এরশাদ খান শিয়া মাযহারের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে হজরত মাযহারের সোহবতে তাঁর পুরো খান্দানসহ আহলে সুন্নাতওয়াল জামাআতের অনুসারী হয়েছিলেন। 'বাশারাত' পৃষ্ঠা ২০২।

৫৩ 'মেশকাতুল মাসাবিহ' নাসীরউদ্দীন আলবানী কৃত, ছাপা-দামেস্ক। মুদ্রণকাল ১৯৬১।

৫৪ মৌলভী নাঈমুল্লাহ লিখেছেন, হজরতের শাহাদতের পর মোল্লা নূর মোহাম্মদ দাবি করেছিলেন, আমার কাছে খাজা মোহাম্মদ মাসুম এবং হজরত খাজা নকশ্বন্দের কাছ থেকে সরাসরি ফয়েজ পৌঁছে। মধ্যখানে কোনো ওয়াসেতার প্রয়োজন নেই। যখন কথাটির ব্যাপক প্রসার ঘটলো, তখন হজরত মাযহার র. তাঁকে স্বপ্নেযোগে হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি হজরত মাযহারের মাজারে হাজির হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু বাতেনী রোগমুক্তি আর তাঁর নসীবে ঘটেনি। এমতাবস্থায়ই তাঁর ইনতেকাল হয়ে যায়। 'বাশারাত' পৃষ্ঠা ২০৪।

ISBN
984-70240-0060-6